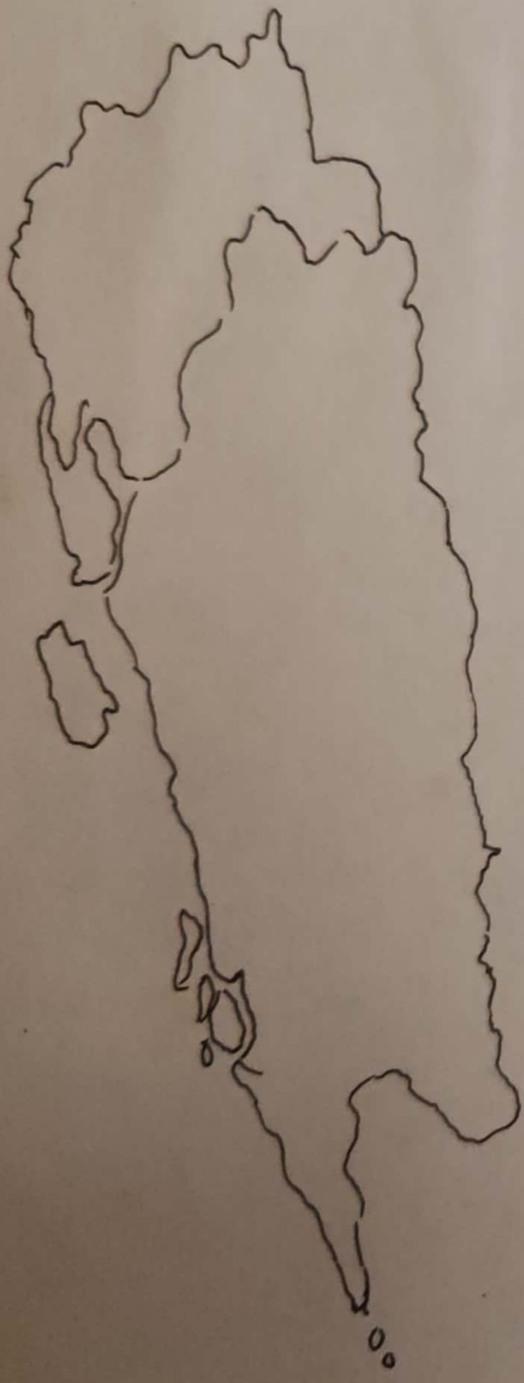
চট্টগ্রাম বিদ্রোহ

স্মারক-আলেখ্য





চট্টগ্রাম বিদ্রোহ

স্মারক-আলেখ্য


চট্টগ্রাম
বিদ্রোহ
স্মারক-আলেখ্য

মৈত্রী

চট্টগ্রাম বিদ্রোহ স্মারক-আলেখ্য

CHATTAGRAM BIDROHA MEMORIAL ALBUM

❒ প্রথম প্রকাশ ❒ বিজয় দিবস ১৯৯৪

❒ প্রকাশনা ও সম্পাদনা পর্ষদ ❒

অমলেন্দু বিশ্বাস
কাজী আরিফ
অরুণ দাশ
ডঃ মমতাজ উদ্দিন পাটোয়ারী
অধ্যাপক প্রণয় মজুমদার
স্বরূপ হাসান শাহীন
অধ্যাপক আলী ইদ্রিস

প্রচ্ছদ ❒ ছবি অঙ্কন ❒ অলঙ্করণ ❒

অমলেন্দু বিশ্বাস

❒ লিপিবিন্যাস ❒

প্রেমতোষ দেবনাথ কোয়ালিটি কম্পিউটার, আন্দরকিল্লা, ফোন ঃ ২০৭৪৮০

❒ প্রসেস ❒

জগন্নাথ সাহা টোনটেক সিরাজদৌলা সড়ক, চট্টগ্রাম।

❒ মুদ্রণ ❒

নেপাল সাহা প্রিন্টটেক মোমিন রোড, চট্টগ্রাম।

❒ ছবি সংগ্রহ ❒

অরুণ দাশ, মমতাজ উদ্দিন আহম্মদ, আশিষ সেন, মৃদুল দত্ত, মহিউদ্দিন মনু শাহ্ আলম, শাক্যমিত্র বড়ুয়া, প্রিয়তোষ বড়ুয়া, রাশেদ ও স্বপন।

❒ বিনিময় ❒

আশি টাকা

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

। কবি ও প্রাবন্ধিক ।

সূর্য সেন
রমেশ শীল
সুকান্ত ভট্টাচার্য
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
গণেশ ঘোষ
আহমদ শরীফ
অজয় রায়
অমলেন্দু দে
আশা দাশ
ফয়েজ আহমদ
কামাল লোহানী
আবদুল মাবুদ খান
মুনতাসীর মামুন
মফিদুল হক
স্বরূপ হাসান শাহীন

অরুণ মিত্র
তরুণ সান্যাল
মনীন্দ্র রায়
শামসুর রাহমান
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
মুর্তজা বশীর
দিলওয়ার
সাইয়িদ আতীকুল্লাহ্
নির্মলেন্দু গুণ
মহাদেব সাহা
ত্রিদিব দস্তিদার
নাসির আহমদ
আবীর হাসান

স্বপন দত্ত
খুরশীদ আনোয়ার
হেমেন্দু বিকাশ চৌধুরী
আহ্মদ খালেদ কায়সার
নিতাই সেন
মৃদুল গুহ
খালিদ আহসান
আনন্দ মোহন রক্ষিত
প্রণয় মজুমদার
ফাউজুল কবির

মারুফ রায়হান
ওমর কায়সার
শ্যামলী মজুমদার
ইউসুফ মোহাম্মদ
আবদেল মান্নান
কাসেম আনদান
সাথী দাশ

মুখবন্ধ

ভারত-পাক-বাংলাদেশ উপমহাদেশের ইতিহাসে চট্টগ্রাম হীরক খণ্ডের মতো দ্যুতিশ্রী বিপ্লব ক্ষেত্র। এ উপমহাদেশে চট্টগ্রাম সর্বক্ষেত্রে অগ্রণী নেতৃত্বের দায়ভার গ্রহণ করে আসছে সুপ্রাচীন কাল থেকে। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-সংগীতের ক্ষেত্রে তো বটেই। সংগ্রাম ও বিপ্লবের ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম সমগ্র উপমহাদেশকে পথ দেখিয়েছে আদর্শিক শৌর্যের সুচেতনায়। সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের অরণ্যে প্রবেশ না করেও নিকট অতীতের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে এমন সব দুঃসাহসিক ঘটনা ও ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যাবে যা বর্তমান প্রজন্মের কাছে অবিরল ইতিহাস বিকৃতি ও বিস্মৃতির চর্চায় অপসৃয়মান দূরবর্তী ভূখণ্ডের মতো অপরিজ্ঞাত, অপরিচিত। তাই ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে যিনি সর্বপ্রথম প্রায় যোগাযোগ ছাড়া নিজস্ব ইনট্যুশানের প্রবল তাড়নায় ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে চিরকালের মতো হারিয়ে গেলেন, সেই রজব আলীকে একবিংশ শতাব্দীর জন্মলগ্নে স্মরণ করতে হয়। বিস্মৃতির পলস্তারা সরিয়ে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় বর্তমানের মেধায় ও মননে। জাতির এই দৈন্য-দশায় শুভবুদ্ধির সোনারঙ ছড়াতে ছড়াতে যাঁরা জাতিকে ইতিহাসের সঠিক পথ-সন্ধান দিয়েছেন তাঁদেরকে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করা আমাদের কর্তব্য। কিন্তু সব কর্তব্য আমরা সব সময় সম্পন্ন করিনা। করিনা বলেই জাতির চৈতন্যে জন্ম নেয় বিকৃতির আগাছা, বিস্মৃতির লাবণ্যহীন রিরংসা, শ্রদ্ধাহীনতার তীক্ষ্ণমুখ রক্তবীজ। ফলে বিপ্লব তীর্থ চট্টগ্রাম পরিণত হয় বৈধব্যের শ্রীহীন প্রেতভূমিতে।' অনাগত বিপ্লবের মানসপুত্র, একদার ত্রিদিবসের স্বাধীন চট্টগ্রামের হেকটর তেজস্বী সিংহ পুরুষ সূর্যসেন ও তাঁর সহযোদ্ধারা মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও প্রগতিহীনতার ক্লেদাক্ত কিংখাবে স্মৃতিচিহ্নহীন প্রান্তরে বিলুপ্ত হয়ে যান। প্রতিকারহীন এই শনির সময়ে জাতীয় বীরদের প্রতি আমরা যথাযথ সম্মান দেখাতে পারছিনা। চারদিককার জানোয়ার-শোভন উল্লাসের তলায় আমরা হারাচ্ছি আমাদের পূর্ব-পুরুষদের অর্জিত গৌরব, পৌরুষ ও অপরাজেয় চৈতন্যসংপৃক্ত প্রগতির ধারাকে। এই অনভিপ্রেত ভূতুড়ে সংক্রমণকে ঠেকানো প্রয়োজন। এই দায়িত্ব কারো একার নয়। সমগ্র জাতির। জাতির চৈতন্যশক্তিকে প্রচণ্ড আঘাতে জাগাবার অভিপ্রায়ে ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা হিসেবে চট্টগ্রাম বিপ্লবের স্মারক-আলেখ্য প্রকাশ করা হচ্ছে। তাৎক্ষণিকতায় আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জনে সফল হবো এমন আশা দুরাশারই নামান্তর। তবে ইতিহাসের প্রান্ত রেখায় এই স্মারক-আলেখ্য মাইল ফলক হিসেবে দেশপ্রেমিক, মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের বিবেকে যে শুভ সত্যের জন্ম দেবে সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত।

চট্টগ্রাম এই উপমহাদেশকে অকাতরে দিয়েছে, দিচ্ছে এবং দেবে। চট্টগ্রাম নিজেই সম্পন্ন। সমগ্রদেশ ও জাতিকে নবতর উদ্যোগে চট্টগ্রামকে জানাবার প্রয়োজন। তিরিশের আমূল উত্থিত মহান বিদ্রোহের ইতিহাস, তার ধারাবাহিকতার আপাতঃ পরিণতি স্বাধীন বাংলাদেশ, স্বাধীন বাংলাদেশের পথ ধরে অসাম্প্রদায়িকতার সগর্ব বিকাশ, সর্বোপরি জাতীয় বীরের মর্যাদায় বিপ্লবীদের অভিষিক্ত করা চট্টগ্রামবাসীদের জরুরী কতর্ব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমগ্র বাংলাদেশ এ বিষয়ে কতটুকু সচেতন সেটা আজ বিবেচ্য বিষয় নয়। কারণ বাংলাদেশকে সর্বক্ষেত্রে পরিচালিত করে চট্টগ্রাম। সুতরাং চট্টগ্রামকেই অতীতের অনেক দুঃসাহসী দায়িত্ব গ্রহণের মতো জাতীয় বীরদের বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার দায়িত্বও গ্রহণ করতে হবে। সেই লক্ষ্যে গণমানসের নবতর জাগরণ, জাতির চিৎস্রোতলতায় ইতিহাসের রৌদ্রস্নাত একাধিক অধ্যায়ের সংস্থিতি অপরিহার্য।

বর্তমান স্মারক -আলেখ্য ১৮৫৭ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত সময়কালে সংঘটিত বিপ্লব বিদ্রোহসহ বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসকে তুলে ধরার সৎ চেষ্টায় ক্রিয়াশীল। ফলে তৎকালীন কংগ্রেস, স্বরাজ পার্টি বা কমিউনিস্ট নেতা, সংস্কৃতিসেবী, সাহিত্যিক, কবি, সমাজসেবী, শিক্ষাবিদ প্রত্যেককেই শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করা হয়েছে। তবে আমাদের মূল আকাঙ্খার সাথে তাঁদের সাহসী সংশ্লিষ্টতাকে বিবেচনায় আনা হয়েছে সব সময়। কবি নবীন সেন, যাত্রামোহন সেনগুপ্ত, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, নেলী সেনগুপ্তা, শের-ই-চাটগাম কাজেম আলী, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, মনিরুজ্জামান ইসলামবাদী স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিপ্লবী অবদান রেখেছেন-যা চট্টগ্রামকে বিপ্লব তীর্থে পরিণত করেছে। আমরা তাঁদেরকে আমাদের অহংকার বলে গ্রহণ করেছি। একটি জাতির অহংকার করার মতো কিছু থাকা খুবই প্রয়োজন। সেই অহংকারই একদিন অলংকারে পরিণত হয়ে সমগ্র বিশ্বকে আলো-সংগ্রামের পথ দেখাবে। বাংলাদেশের অহংকার চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামের অলংকার রজব আলী, সূর্যসেন, অনন্ত সিং, নির্মল সেন, প্রীতিলতা, কল্পনা দত্ত, কাজেম আলী, ইসলামাবাদীসহ অসংখ্য স্বাধীনতাকামী নরনারী। যাঁদের রুধিরধারা কর্ণফুলী, শংখ নদীর জলকে পুণ্যবারিতে পরিণত করেছে। চট্টগ্রামকে সাজিয়েছে বিপ্লবী অলংকারে।

চট্টগ্রামের প্রথম বিদ্রোহী সিপাহী

সিপাহী বিপ্লবের প্রথম ঝাণ্ডা ওঠে ১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ। সে ঝাণ্ডাবাহী বীর সিপাহীর নাম মঙ্গল পাণ্ডে। ব্যারাকপুরের প্যারেড ময়দানে বন্দুক কাঁধে টহল দিচ্ছিলেন পাণ্ডেজী। ৩৪ পদাতিক বাহিনীর অন্যান্য সিপাহীরাও কর্তব্য পালনে মনোযোগী। মঙ্গল পাণ্ডে হঠাৎ টহল বন্ধ করে বুক চিতিয়ে দাঁড়ান, তীক্ষ্ণ কণ্ঠের উচ্চারণে বলতে থাকেন- 'ভাইসব! যে ফিরিঙ্গিরা আমাদের ধর্ম নষ্ট করেছে, জাতি নষ্ট করেছে এসো তাদের খতম করি- আমাদের দেশকে স্বাধীন করি'।

পাণ্ডেজীর উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনে ইংরেজ এডজুটেন্ট লেফটানেন্ট বাগ দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে চলে আসে কাছে। মঙ্গল পাণ্ডে মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে অস্ত্র উঁচিয়ে ধরেন, গুলি করেন বাগ সাহেবের বুক লক্ষ্য করে। লেফটানেন্ট বাগ গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘোড়ার উপর থেকে ছিটকে পড়ে যায় মাটিতে। একজন ইংরেজ মেজর তা লক্ষ্য করে ছুটে আসে বাগ ও পাণ্ডেজীর দিকে। পাণ্ডেজীর বন্দুকের গুলি মেজরকেও ধরাশায়ী করে।

সশস্ত্র ইংরেজ বাহিনী এবার সক্রিয় হয়ে ওঠে। তারা ঘিরে ফেলে মঙ্গল পাণ্ডেকে। মঙ্গল পাণ্ডের পাশেই ছিলেন তাঁর সাথী ঈশ্বরী পাণ্ডে। একজন পদস্থ ইংরেজ সেনা ঈশ্বরী পাণ্ডেকে নির্দেশ দেয় মঙ্গল পাণ্ডেকে গ্রেপ্তার করতে। ঈশ্বরী কিন্তু নির্বিকার দাঁড়িয়ে থাকেন। ইংরেজ সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্যোগ নিচ্ছে, মঙ্গল পাণ্ডে নিজের অস্ত্রের মুখ ফেরান নিজের বুকের দিকে। তখনই সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়ে মঙ্গল ও ঈশ্বরীর ওপর। নিরস্ত্র করে দু'জনকে। ৮ এপ্রিল ফাঁসি হয় ওঁদের।

মঙ্গল পাণ্ডে ও ঈশ্বরী পাণ্ডের ফাঁসি হয়ে গেলে সারা উত্তর ভারত জুড়ে সিপাহী বিপ্লবের গোপন আয়োজন চলতে থাকে। দেশের পূর্ব প্রান্তের এই চট্টগ্রাম কিন্তু ব্যাপক আয়োজনের জন্য অপেক্ষা করে থাকল না, ১৮৫৭'র নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বসল। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সবার আগেই উড়িয়ে দিল বিদ্রোহের ঝাণ্ডা। ৩৪ রেজিমেন্টের হাবিলদার রজব আলী খাঁ সে ঝাণ্ডা প্রথমেই হাতে তুলে নিলেন।

ইংরেজ অফিসাররা সংবাদ পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে আদেশ জারী করল সিপাহীরা যেন প্যারেড ময়দানে সমবেত হয়। মুক্তিপাগল সিপাহীরা ইংরেজ অফিসারের আদেশ অমান্য করল। হাতে তুলে নিল অস্ত্র। তা দেখে ভয়ার্ত ইংরেজ অফিসাররা পালিয়ে আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়।

সেদিনই হাবিলদার রজব আলীর নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বিদ্রোহী সিপাহীরা সরকারী কোষাগার দখল করে তিন লক্ষাধিক টাকা সংগ্রহ করে নেয়। জেলখানার গেট ভেঙ্গে দিয়ে বন্দীমুক্তি ঘটায়। সৈন্য-ব্যারাক দখল করে অস্ত্র সংগ্রহ করে নিয়ে অস্ত্রাগারটি পুড়িয়ে দেয়।

সরকারী বাহিনী নিয়ন্ত্রিত তিনটি হাতী ও দুটি ঘোড়ার দখল নেয় সিপাহীরা। এই পাঁচটি হাতী ও ঘোড়ার পিঠে অস্ত্র আর অধিকৃত মালামাল ও অর্থাদি বোঝাই দিয়ে বিদ্রোহী সিপাহীরা সড়ক পথে যাত্রা শুরু করে। দিক ওদের উত্তরে, লক্ষ্য ত্রিপুরা রাজ্য। ত্রিপুরেশ্বরের আশ্রয়ে থেকে তারা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে লড়বে, মুক্ত করবে দেশমাতৃকাকে।

ত্রিপুরার রাজা এই সিপাহী বিদ্রোহের সংবাদ পেয়েছেন। বিপ্লবী সিপাহীদের সাহায্য করতে আগ্রহী নন তিনি। ইংরেজ সরকারকে শত্রু করতে তিনি নারাজ। রাজ্য সীমান্তে সৈন্য মোতায়েন করে বিপ্লবী সিপাহীদের গতিরোধ করে দিলেন। ত্রিপুরা সীমান্তে বাধাপ্রাপ্ত সিপাহীরা তাদের গতিপথ পরিবর্তন করে কুমিল্লার পাহাড়ী অঞ্চলের দিকে চলতে শুরু করে। সে পথেও বাধার সন্মুখীন হয় ওরা। পার্বত্য এলাকার জমিদাররা ইংরেজের পক্ষে ত্রিপুর-সৈন্য সহায়তায় বিপ্লবী সিপাহীদের প্রতিরোধ করে এবং হাতী-ঘোড়াসহ অর্থাদি ছিনিয়ে নেয়।

আবার গতিপথ পরিবর্তনে বাধ্য হয় বিপ্লবী সিপাহীরা, চলতে শুরু করে মনিপুর রাজ্য অভিমুখে। ইংরেজ মেজর মিঃ বাইজ বিদ্রোহীদের গতিবিধির খবর পেয়ে যায়। সে সিলেটের পদাতিক বাহিনী নিয়ে এগিয়ে যায় মনিপুরের দিকে। সীমান্ত ষ্টেশন লাতুতে উভয় পক্ষ মুখোমুখি হয়। যুদ্ধ হয় ভয়াবহ। সে যুদ্ধে নিহত হল মেজর মিঃ বাইজ।

বিপ্লবী সিপাহীরা বনাঞ্চলে আত্মগোপন করে।



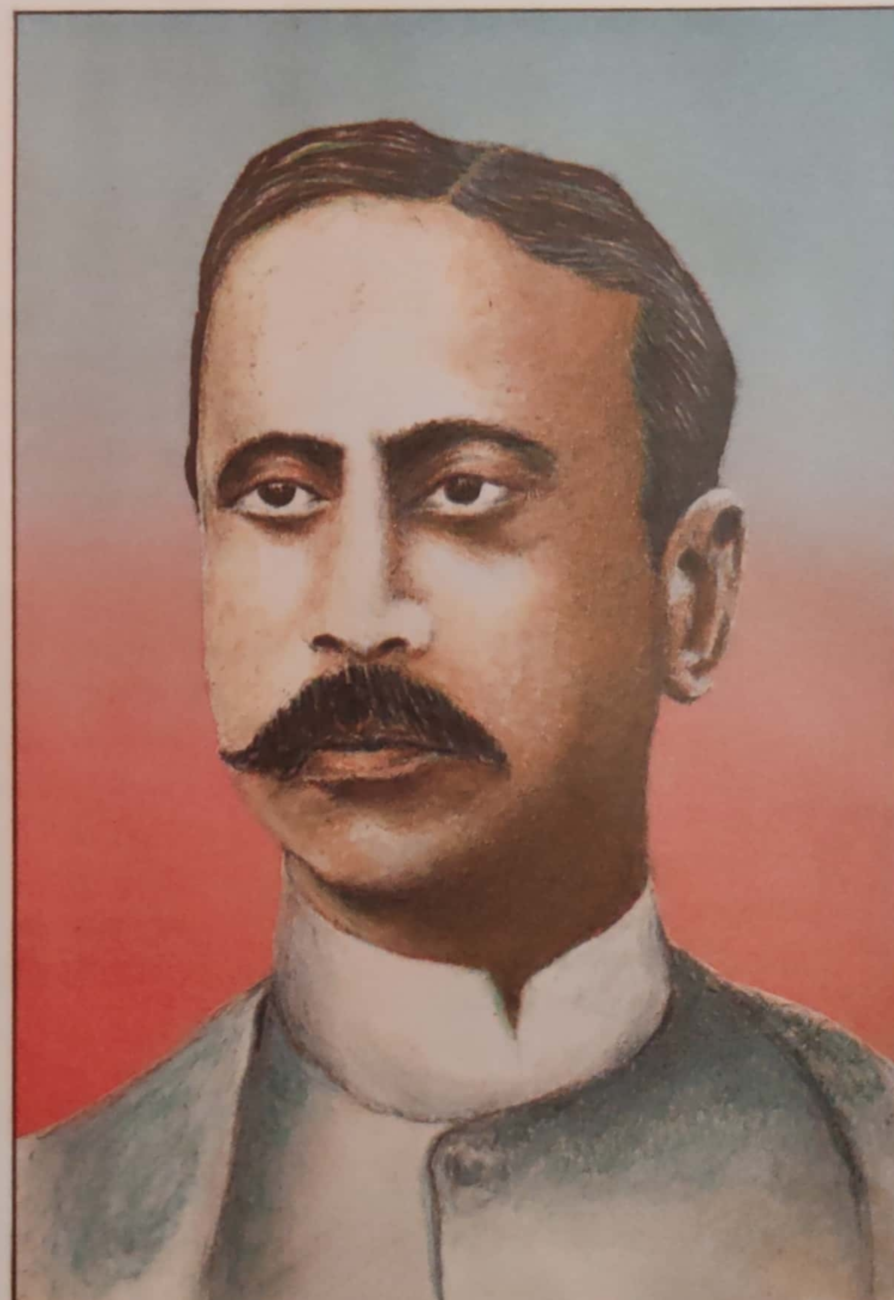
অঙ্কন / অমলেন্দু বিশ্বাস

হাবিলদার রজব আলী খাঁ

রজব আলী খাঁ চট্টগ্রাম মিলিটারী ব্যারাকের ৩৪ নম্বর রেজিমেন্টের হাবিলদার। চট্টগ্রামে প্রথম বিদ্রোহী সিপাহী। ১৮৫৭ সালের ২৩ নভেম্বর ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নিশান উড়ান। চট্টগ্রামে বসবাসকারী ইংরেজরা তাঁর ভয়ে শহর ছেড়ে পালিয়ে যায়।

নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯)

রাউজান থানার নয়াপাড়া গ্রামে জন্ম। পিতা গোপীমোহন সেন, মাতা রাজরাজেশ্বরী। বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থানে তিনি ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডিপুটি কালেক্টর পদে ছিলেন। তিনি অনেক কাব্য রচনা করেন। 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্য লিখে তিনি রাজরোষে পড়েন।



অঙ্কন / অমলেন্দু বিশ্বাস

স্বাদেশিকতার প্রথম ভেরীবাদক

নবীন চন্দ্র সেন স্বদেশপ্রেমী। তাঁর সাহিত্যে সে স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতাস্পৃহার প্রকাশ। আজও নবীনচন্দ্রের স্মরণীয় পরিচয় 'পলাশির যুদ্ধের' কবিরূপে। বাঙলাভাষায় প্রথম বাঙলার ইতিহাসের কাব্যরূপ 'পলাশির যুদ্ধ'। এ কাব্যে জীবনের স্পর্শ, জাতীয় জীবনের একটি মৌল প্রেরণার উৎস। এ কাব্য থেকে এক বন্ধন অসহিষ্ণু পৌরুষদীপ্ত হৃদয়ের গভীর আর্তনাদ ধ্বনিত। রাণীভবানীর তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে যে বরাভয় বাণী নির্ঘোষিত তা সেদিনের আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ বাঙালির ভাষা- 'ইচ্ছা করে এই দণ্ডে ভীমা অসি করে/ নাচিতে চামুণ্ডারূপে সমর ভিতর।' মোহনলালকে আশ্রয় করে কবি জাতিকে দেশপ্রেম ও বীরধর্মের দীক্ষা দিয়েছেন, পরাধীনতার বেদনাবিদ্ধ অন্তরে জ্বালিয়েছেন অনির্বাণ মুক্তি বহ্নি।

নবীন চন্দ্র সেন বাংলার স্বাদেশিকতার প্রথম সচেতন ভেরীবাদক। ১৮৮২ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ রচনার ৭ বছর পূর্বেই তাঁর গানের কথায় বলছেনঃ

ঈশ্বরের পুত্র তোরা কারে তব ডর,
সাজ সাজ ভ্রাতৃগণ কর কর রণ,
উঠুক সত্যের ধ্বজা গগন উপর।

'অমৃতাভ' কাব্যের স্তবকে ধর্মীয় ঐক্যের সুর;
উঠে হরিধ্বনি, উঠে হুলুধ্বনি,
লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে- মত্ত নারীনর,
গায় মুসলমান, ভক্তিতে বিহ্বল-
'লা-এলাহি আল্লা' আল্লাহ্ হো আকবর!'

'পলাশির যুদ্ধ'
বিষম বিকল্প স্থানে আছি দাঁড়াইয়া
আমরা, অদূরে রাজবিপ্লব দুর্বার
নাহি কার্য অদৃষ্টের সিন্ধু সাঁতারিয়া,
ভাসি স্রোতাধীন, দেখি বিধি বিধাতার।
কেন মিছে খাল কাটি আনিবে কুমীরে?
প্রদানিবে স্থির গৃহে স্বহস্তে অনল?
বরিয়া ক্লাইভে, খড়গ নবাবের শিরে
প্রহারি চক্রান্ত বলে, লভিবে কি ফল?
ঘুচিবে কি অত্যাচার, বল নৃপবর!
অধীনতা অত্যাচার নিত্য সহচর।
যেই শক্তি টলাইবে বঙ্গ-সিংহাসন,
থামিবে না এইখানে, হয়ে উগ্রতর
শোণিতের স্বাদে মত্ত-শার্দূল যেমন,
প্রবেশিবে মহারাষ্ট্র সৈন্যের ভিতর।

'রঙ্গমতী'
........জ্বালাইলা কুরুক্ষেত্রে সেই মহানল।
প্রতিদ্বন্দ্বী নৃপতির শোণিত প্রবাহে
নিবিল সে মহাবহ্নি, ভারতে প্রথম
কৌরবের একচ্ছত্র হইল স্থাপন।
এই মহা অভিনয় না হইতে শেষ,
সেই দেব-অভিনেতৃ সম্বরিল লীলা
সিন্ধু প্রান্তে, গুপ্ত অস্ত্রে আততায়ী-করে
.... ভারত সন্তান
এই দীর্ঘ শিক্ষা পরে শিখিল না আজি
জাতিত্বের মহামন্ত্র, সর্বশক্তি-মূল
একতা।

চট্টগ্রামের মুকুটহীন রাজা

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত'র পিতা যাত্রামোহন সেনগুপ্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী। তিনি ছিলেন স্বদেশমুক্তি আন্দোলনের নেতা। সর্বভারতীয় নেতা হিসেবেও তাঁর যথেষ্ট সুনাম। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত'র চরিত্র, মন-মানসিকতাও পিতার অনুগামী। লণ্ডন থেকে ব্যারিস্টারী পাশ করে এসে কলকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই স্বদেশ মুক্তি আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সংস্পর্শে এসে আন্দোলনের নেতৃত্ব পদে আসীন হন।

১৯২১ সালে বন্দর নগরী চট্টগ্রামেই প্রথম শ্রমিক ধর্মঘট। তাতে নেতৃত্ব দেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। তাঁর দক্ষ পরিচালনায় ধর্মঘটে শ্রমিকপক্ষ বিজয়ী। সরকার পক্ষ শ্রমিকের সাথে আপোসে বাধ্য হয়। সমাজের সাধারণ মানুষের জন্য যতীন্দ্রমোহনের নিরলস শ্রম, রাজরোষ উপেক্ষা আর সাহসী পদক্ষেপে চট্টগ্রামের প্রবীণ নেতৃবৃন্দ মুগ্ধ। প্রবীন জননেতারা যতীন্দ্রমোহনকে 'দেশপ্রিয়' উপাধিতে ভূষিত করেন। ব্রিটিশ সরকার উপাধি দেয় 'চট্টগ্রামের করাল শিশু'। ভারতের জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলো অভিনন্দন জ্ঞাপনে বলল, 'চট্টগ্রামের মুকুটহীন রাজা।' ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের পথিকৃতরূপে স্বীকৃতি পেলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।

১৯২১ সালের মে মাসেই দ্বিতীয়বার শ্রমিক আন্দোলনের শুরু, আসামের চা-বাগানের শ্রমিক এবং আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে শ্রমিক ধর্মঘট। এই আন্দোলনেও নেতৃত্ব দেন যতীন্দ্রমোহন। হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ-মুসলমান-খ্রীষ্টান মিলে প্রায় পঁচিশ হাজার শ্রমিকের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থায় নিজের বাড়ি বন্ধক রেখে ব্যাঙ্ক ঋণ নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই আন্দোলনের শেষ পরিণতিতে তাঁর কারাবাস।

গান্ধীর সাথে মতদ্বৈততায় ১৯২৩ সালের ১ জানুয়ারী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে 'সর্বভারতীয় স্বরাজ্য দল' গঠন করলেন। কলকাতায় 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক স্বরাজ্যদল' গঠন করে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে সাধারণ সম্পাদক করলেন।

কিছুদিন পর বঙ্গীয় আইনসভার নির্বাচন, নির্বাচনে যতীন্দ্রমোহন সদস্যপ্রার্থী চট্টগ্রাম জেলা থেকে। চট্টগ্রামের সকল স্তরের মানুষ যতীন্দ্রমোহনকে জয়তিলক পরালেন।

প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি, স্বরাজ্যদল নেতা এবং কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। ১৯২৫ সালের ২৬ জুন বাংলার ভাগ্যাকাশ হঠাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল। মহাপ্রয়াণ ঘটল দেশবন্ধুর। তাঁর 'ত্রিমুকুট' ধারণের ক্ষমতাসম্পন্ন কাকেও পাওয়া গেল না। গান্ধীজী স্বয়ং কলকাতায়, অনেক বোঝাপড়া, তর্ক বিতর্কের পর দেশবন্ধুর 'ত্রিমুকুট' দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের মাথায় পরালেন গান্ধীজী। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি, স্বরাজ্যদলের নেতা আর কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।

১৯২৬ সালে আইনসভার নির্বাচনেও চট্টগ্রাম থেকে বিজয়ী যতীন্দ্রমোহন। ১৯২৯ সালে তিনি ইংরেজী দৈনিক 'এডভান্স' এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। ১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারীর শেষ দিকে সিঙ্গাপুর গেলেন বার্মা হয়ে। কলকাতায় ফিরলেন ১১ মার্চ। বার্মা পুলিশ ও কলকাতা পুলিশ যৌথভাবে যতীন্দ্রমোহনকে গ্রেপ্তার করে রেঙ্গুন কারাগারে নিয়ে যায়। সে কারাগার থেকেই তিনি কলকাতার মেয়র নির্বাচিত হন। এর কিছুদিন পর কারামুক্ত হন তিনি।

১৯৩১ সালে করাচির 'মহাত্মা গান্ধী উদ্যানে' দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠায় পৌরহিত্য করলেন এবং চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেস কর্তৃক সংবর্ধিত হলেন। ১৯৩১ এর ৩০ আগষ্ট হরিপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক আহসানউল্লা হত্যা, সরকারের প্ররোচনায় এই হত্যাকেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, চট্টগ্রাম প্রেতপুরীতে রূপান্তরিত। যতীন্দ্রমোহন স্বয়ং তদন্তকাজে নামলেন। সংগ্রহ করলেন হৃদয়হীন বর্বর সরকারের দাঙ্গায় সহযোগিতার অনেক প্রামাণ্য দলিল। পুলিশ সুপার গুটার আর সামরিক অফিসার হান্টারের সরাসরি সম্পৃক্ততার প্রমাণও অনেক। এসব প্রমাণাদি নিয়ে যতীন্দ্রমোহন আদালতে যেতে তৈরী হলেন।

লণ্ডনে রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স আসন্ন। বাঙলার গভর্ণর স্টান্‌লি কর্তৃক আমন্ত্রিত যতীন্দ্রমোহন। স্টান্‌লি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ চান রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সের জন্য। একমাত্র প্রতিনিধি গান্ধী চলে গেছেন লণ্ডনে। যতীন্দ্রমোহনও সস্ত্রীক চলে গেলেন লণ্ডন। লণ্ডনে হাউস-অব-কমনস্ এর সদস্য সভায় চট্টগ্রামে ইংরেজ অত্যাচারের সচিত্র প্রতিবেদন তুলে ধরলেন। প্রতিবেদনের উপসংহারে বললেন, 'ছয় হাজার মাইল দূরে অবস্থিত ইণ্ডিয়া হাউস থেকে ভারতের উপর শাসন কর্তৃত্ব আর চালানো



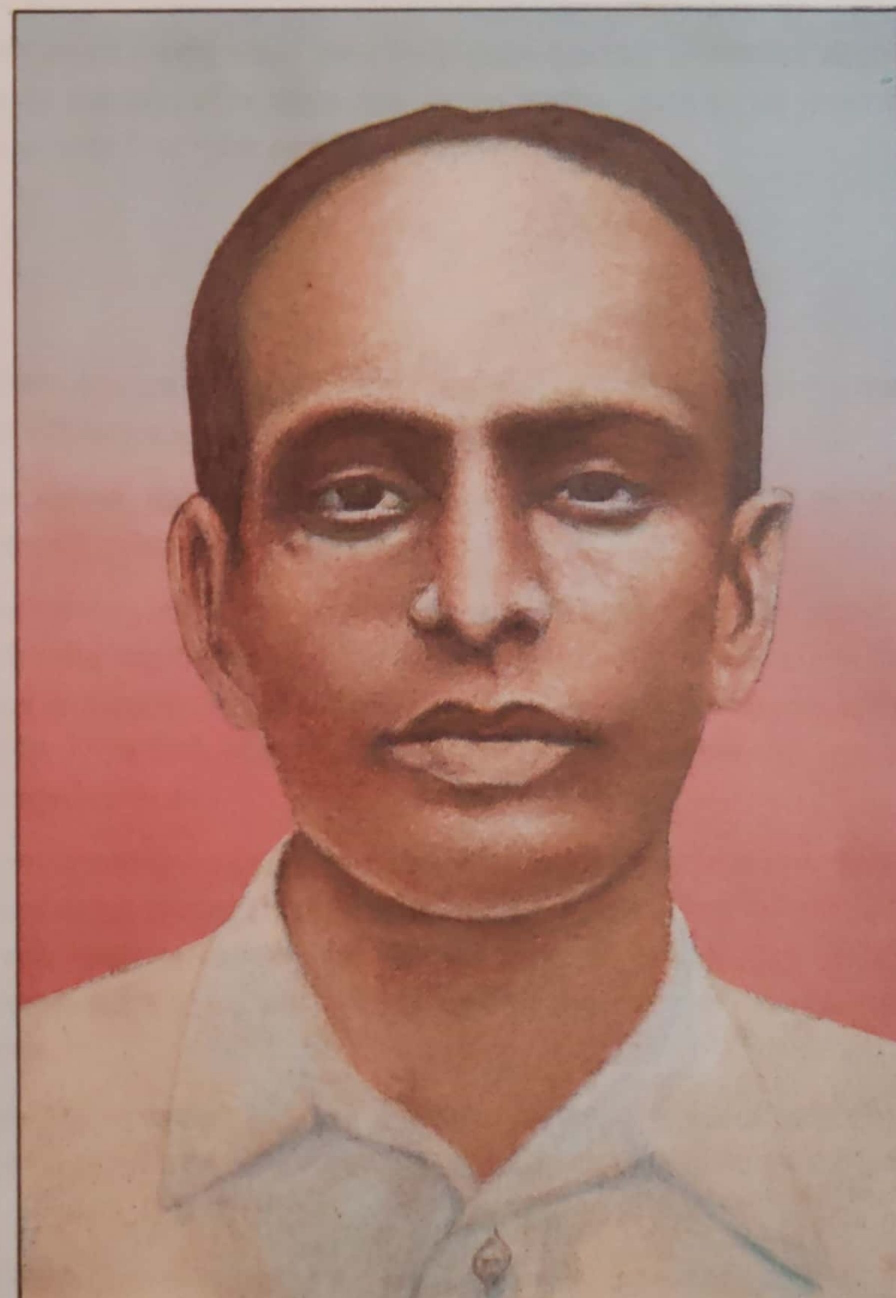
অঙ্কন / অমলেন্দু বিশ্বাস

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (১৮৮৫-১৯৩৩)

পটিয়া থানার বরমা গ্রামে জন্ম। পিতা যাত্রামোহন সেনগুপ্ত, মাতা বিনোদিনী সেনগুপ্তা। ১৯০৪ সালে উচ্চশিক্ষার্থে বিলাত যাত্রা। ব্যারিস্টারী পাশ করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সংস্পর্শে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত হন। সর্বভারতীয় কংগ্রেসের নেতা।

মাস্টারদা সূর্য সেন (১৮৯৪-১৯৩৪)

রাউজান থানার নয়াপাড়া গ্রামে জন্ম। পিতা রাজমণি সেন, মাতা মনোরমা দেবী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। ন্যাশনাল ইংলিশ স্কুল ও উমাতারা স্কুলের প্রধান শিক্ষক। সশস্ত্র বিপ্লবের চিন্তানায়ক। চট্টগ্রাম কংগ্রেসের সম্পাদক। চট্টগ্রাম বিদ্রোহের মহানায়ক।



অঙ্কন / অমলেন্দু বিশ্বাস

যাবে না। ভারতের ব্যুরোক্রেসী দায়িত্বজ্ঞানহীনের মত হিজলীতে রাজবন্দীদের হত্যা করেছে, চট্টগ্রামে চরম অত্যাচার চালিয়েছে, ব্রিটিশ শক্তির অত্যাচার এবং সন্ত্রাস সৃষ্টিতে সমগ্র ভারত বিক্ষুব্ধ। ভারত শীঘ্রই এই দায়িত্বহীন বিদেশী শাসকের শৃঙ্খল মোচন করবে। ভারতবাসীর পরিচালনার দায়িত্ব ভারতবাসীর উপর সমর্পণ করতে হবে।'

নির্যাতীত স্বদেশবাসীর রুদ্ধ মনের ভাষা তাঁর কণ্ঠে অগ্নিক্ষরা হয়ে ব্রিটিশ হাউস অব কমনস-এ ধ্বনি-প্রতিধ্বনি হয়ে ফেটে পড়ল। এ বক্তৃতায় চট্টগ্রাম তথা বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের সাথে তাঁর মানসিক সংযোগ প্রকাশিত হল। আলোকচিত্রের সাহায্যে সুসভ্য ইংরেজ জাতির কাছে তিনি তুলে ধরলেন তাদের স্বজাতির উলঙ্গ আচরণ-ষড়যন্ত্র-অত্যাচারের কলঙ্কিত অধ্যায়।

১৯৩২ সালের ২০ জানুয়ারী স্বদেশ প্রত্যাবর্তন পথে বোম্বাই বন্দরে গ্রেপ্তার হলেন যতীন্দ্রমোহন। অসুস্থ শরীর, জলপাইগুড়ি জেলে ডাক্তারের চিকিৎসাধীন রইলেন এক বৎসর। কলকাতা মেডিকেল হাসপাতালে কিছুদিন রাখার পর তাঁকে রাঁচিতে স্থানান্তর করা হল। রাঁচির নগেন্দ্র লজে রইলেন অন্তরীণ। এসব ইংরেজ সরকারের ষড়যন্ত্র। ১৯৩৩ সালের ২১ জুলাই নগেন্দ্র লজে অন্তরীণ অবস্থাতেই মহাপ্রয়াণ করলেন ভারতের সিংহ পুরুষ দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।

চট্টগ্রাম বিদ্রোহের মহানায়ক সূর্যসেন

চট্টগ্রাম বিদ্রোহ জাগ্রত গণচেতনার প্রতিফলন। গণবিদ্রোহের সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে অঙ্গীকার করে এর সূচনা। এই বিদ্রোহ এক প্রধানের নির্দেশে পরিচালিত। সকল বিপ্লবী এক নিশানের নীচে সমবেত। সকলের মূলমন্ত্রও এক। সূর্যসেনই এই বিদ্রোহের সর্বাধিনায়ক।

১৯১৮ সালেই বিপ্লবী দলের উদ্বোধন। সূর্যসেন, নগেন সেন, অনুরূপ সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, চারু বিকাশ দত্ত এই পঞ্চপাণ্ডবের প্রধান সূর্যসেন। ১৯২০ সালে সাম্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বৈপ্লবিক প্রস্তুতির শুরু। বিপ্লবের জন্য কর্মধারা এবং আত্মোৎসর্গে ব্রতীর সন্ধান, সংগ্রহ কর্মধারার মূল।

চট্টগ্রাম স্বদেশী যুবকদের চেষ্টায় ও উৎসাহে গড়ে উঠা ন্যাশনাল স্কুলের অঙ্কের শিক্ষক সূর্যসেন। এই নিরীহ শিক্ষকের প্রবল আকর্ষণী শক্তি সেদিন সমগ্র চট্টগ্রামের মৃত্যুপাগল যুবক ও ছাত্রদের জয় করেছিল। তিনি আদর্শ শিক্ষক বলেই সার্থক বিপ্লবী। তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, দূরদর্শিতা ও সংগঠন শক্তি, সংকল্পে অবিচল নিষ্ঠা এবং নিয়মানুবর্তিতার প্রতি কঠোর মনোভাব। আবার তাঁর মধ্যে ছিল গভীর মমত্ববোধ ও ভালবাসা, সর্বোপরি সীমাহীন অন্তহীন দেশপ্রীতি। এক বৃন্তে বহু প্রতিভা ধারণে একটি মহান উদ্দেশ্য ও আদর্শের জন্য উৎসর্গ করার মত আশ্চর্য সাংগঠনিক শক্তির তিনি অধিকারী ছিলেন। তাঁর সাংগঠনিক প্রতিভা এত সুদৃঢ় যে তরুণমতি কিশোর ছাত্র ও যুবকদের স্বল্প সময়ের মধ্যে একটা অগ্নিময় আদর্শে তিনি অনুপ্রাণিত করেন।

১৯২১ সালে এসব তরুণ যুবকদের নিয়ে তিনি কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করলেন। ১৯২৩ সালের প্রথম দিকে শুলকবহর এলাকার এক পুরোনো বাড়িতে গোপন আস্তানা স্থাপন করলেন। অস্ত্র কেনা ও ট্রেনিং ইত্যাদির জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে রেলওয়ের ডাক আক্রমণ করে ১৭,০০০.০০ টাকা ছিনিয়ে নিলেন তাঁর বিপ্লবী দলের ছেলেরা। সে আস্তানা বাড়িতে পুলিশি হামলা হলে দলবল নিয়ে আত্মগোপন করলেন নাগরখানা পাহাড়ের অভ্যন্তরে। পুলিশের সাথে মুখোমুখি যুদ্ধ হল সেখানে। যুদ্ধে আহত হলেন সূর্যসেন আর অম্বিকা চক্রবর্তী। আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার হলেন তাঁরা। বিচারে বেকসুর খালাস পেলেন। ১৯২৪ সালে আত্মগোপনে থেকে বাঙলা, আসাম ও যুক্তপ্রদেশে সাংগঠনিক কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

১৯২৫ সালের ১০ নভেম্বর কলকাতার শোভাবাজার আস্তানা পুলিশ কর্তৃক ঘেরাও হলে সূর্যসেন অন্তর্ধান হন। পরে ৮ অক্টোবর কলকাতার রাস্তায় গোয়েন্দা পুলিশ কর্তৃক ধৃত হন। মুক্তি পান কয়েক দিন পর। ১৯২৮ সালে কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৯২৯ সালে চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক নির্বাচিত হন। কংগ্রেস অফিসকেই তিনি বৈপ্লবিক ক্রিয়াকাণ্ডে ব্যবহার করার সুযোগ গ্রহণ করেন।

১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল রিপাবলিকান আর্মি গঠন করে দুটি সরকারী অস্ত্রাগার দখল করেন। ২২ এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড়-শীর্ষে ঘাঁটি প্রস্তুত করে ব্রিটিশ সৈন্যের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হন। অনেক শত্রুসৈন্য হতাহত করে নিজদলের ১২ জন শহীদকে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগে আত্মগোপন করেন।

আত্মগোপন করে বসে থাকেন নি, অস্ত্রাগার দখলে ক্ষিপ্ত ইংরেজ সরকার নাগরিকদের উপর অকথ্য অত্যাচার শুরু করলে তিনিও প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তাঁর বাহিনী কর্মীদের পাঠাতে শুরু করলেন। পাহাড়তলী শ্বেতাঙ্গপাড়া আক্রমণের জন্য পাঠানো হল রজত, দেবপ্রসাদ, স্বদেশ, মনোরঞ্জন, ফণীন্দ্র ও সুবোধকে। তাঁরা ব্যর্থ হয়ে ফেরার পথে কালারপুলে পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হলেন। শত্রু বেষ্টনী ভেঙ্গে দুজন বেরুলেন, চারজন মরণপণ যুদ্ধে শহীদ, শত্রুসৈন্য হতাহত অনেক।

৯ অক্টোবর আহসানউল্লা দারোগা কর্তৃক ধৃত অম্বিকা চক্রবর্তী নির্যাতীত হলেন। তরুণ বিপ্লবী হরিপদ'র বুলেটের আঘাতে ফুটবল খেলার হাজার হাজার দর্শকের সামনেই সে ইংরেজ ভৃত্য নিহত হল ১৯৩১ সালের ৩০ আগস্ট।

বাঙলার পুলিশ ইন্সপেক্টর ক্রেগ ভয়ঙ্কর অত্যাচারী। ১ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম থেকে ফিরছিল কলকাতা। মাস্টারদা'র নির্দেশে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালীপদ চক্রবর্তী চাঁদপুর স্টেশনে গেলেন ক্রেগকে মৃত্যু দিতে। সৌভাগ্য ক্রেগের, দুর্ভাগ্য রেলপুলিশ-ইন্সপেক্টর তারিণী মুখার্জির, বিপ্লবীর বুলেট তারিণীই উপহার পেল।

চট্টগ্রাম জেলে বন্দী বিপ্লবীদের উদ্ধার করার জন্য কারাগার ও আদালত ভবনে ডিনামাইট বসানো হল ১৯৩১ সালের ৬ মে। ২৮ অক্টোবর সরোজ গুহ ও রমেন ভৌমিক আক্রমণ করলেন ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট ডুর্নোকে।

১৯৩২ সালের ১৩ জুন ধলঘাট সাবিত্রী দেবীর বাড়িতে সূর্যসেন, নির্মল সেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার ও অপূর্ব সেন ক্যাপটেন ক্যামরুণের বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হলেন। নির্মল সেনের গুলিতে নিহত ক্যামরুণ। গুর্খা সৈন্যের গুলিতে শহীদ নির্মল সেন। সন্মুখ যুদ্ধে অপূর্ব সেনও শহীদ হলেন। সূর্যসেন, প্রীতিলতা গোলাগুলি বিধ্বস্ত আস্তানা থেকে বেরিয়ে এলেন।

২৯ জুলাই কুমিল্লার পুলিশ সুপার এলিসনকে হত্যা করলেন শৈলেশ রায়।

১৮ সেপ্টেম্বর সাগর পাড়ের গ্রাম কাট্টলীতে প্রীতিলতার মুখোমুখি তিনি। ২৩ সেপ্টেম্বরে পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে প্রীতিলতাকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে গিয়ে দৃপ্ত কণ্ঠে বললেন,-আমার দেশে বীর যুবকের অভাব নেই। বালেশ্বর থেকে জালালাবাদ, কালারপুল আর ধলঘাট, দেশপ্রেমিক তরুণপ্রাণ দেশের জন্য আত্মবলিদান করেছে, তাদের রক্তে দেশের মাটি সিক্ত। আজ বাঙলার ঘরে ঘরে মায়েরা, বোনেরা, কন্যারাও মেতেছে স্বদেশপ্রেমের মহা মরণ খেলায়। ইতিহাসে এসব হয়তো লেখা হবে না। আমি চাই, ঝাঁসীর রানী আর নাটোরের রানীর মতোই ইতিহাস। শঠ, প্রবঞ্চক, নিপীড়ক ব্রিটিশ জানুক, জানুক বিশ্বজগৎ, আমার বাঙলার মেয়েরাও মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র সৈনিক'।

১৯৩৩ ফেব্রুয়ারী ২, পটিয়া থানার গৈরলা গ্রামের আশ্রয় ঘাঁটিতে ব্রিটিশ বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে ধৃত হন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আতঙ্ক মাস্টারদা সূর্যসেন। ১৯৩৪ এর ১২ জানুয়ারী চট্টগ্রাম জেলেই ফাঁসিতে আত্মাহুতি দেন।

ফাঁসির পূর্বাহ্নে অনুগামীদের কাছে বিপ্লবী সূর্যসেন তাঁর শেষ আবেদন রেখে গেলেন-

Ideal and Unity is my farewell message. Rope is hanging over my head. Death is knocking at my door, My mind is soaring towards Eternity. This is the time for 'Sadhana'. This is the time for preparation to embrace death as a friend and this is the time to recall lights of other days as well.

Sweet remembrance of you all! My dear brothers and sisters, break the monotony of my life and cheer me up. At such a pleasant, at such a grave, at such a solemn moment, what shall I leave behind for you? Only one thing, that is my dream, a golden dream- a dream of Free India. How auspicious a moment it was, when I first saw it ! Throughout my life most passionately and untiringly, I have pursued it like a lunatic, I know not where I am compelled to stop my pursuit today. If icy hands of death give you a touch before the goal is reached, then give the charge of your further pursuit to your followers as I do to-day. Onward, my Comrades, onward- never fall back. The day of bondage is disappearing and the dawn of freedom is ushered in. Be up and doing. Never be disappointed. Success sure. God bless you!

Never forget the 18th April, 1930, the day of Easter Rebellion in Chittagong. Keep ever fresh in your memory the fights of Jalalabad, Julda, Chandannagar and Dhalghat. Write in red letters in the core of your hearts the names of all patriots who, have sacrificed their lives at the altar of India's Freedom.

My earnest appeal to you- there should be no divission in your organistion, My blessings to you all, inside and outside the jail. Fare you well.

Long live revolution.

Bande Mataram.

বাঙলাভাষা আন্দোলনের আদি পথিকৃৎ

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ কর্মজীবনে বহু গুণীজনের সংস্পর্শে এসেছেন। তাঁদের সাহায্যও পেয়েছেন। পেশাগত জীবনে তিনি শিক্ষক এবং অফিস কর্মী হিসেবে অবসর গ্রহণ করলেও তাঁর খ্যাতি পরিচিতি এক অসাধারণ ক্ষেত্রে। সে ক্ষেত্রে মহিমা, মহত্ব, গবেষণামূলক সাহিত্যচর্চার স্পৃহা ও মননশীলতা আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদকে করেছে বিশিষ্ট ও স্মরণীয়। জীবন পথে নানা অভাব অনটন, আর্থিক অসচ্ছলতা, তবুও প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহের মতো সুকঠিন কাজকেই জীবনের ব্রত করেছিলেন তিনি।

এদেশীয় যুগচিন্তা যখন আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমুখী এবং মৌলিক সাহিত্য চর্চার দিকে ঝুঁকে পড়েছে তখন তিনি হাতের লেখা পুঁথি খুঁজে বেড়াচ্ছেন দুয়ারে দুয়ারে। তাঁর একান্ত বিশ্বাস, প্রাচীন পুঁথিগুলোর মধ্যেই রয়েছে জাতির সত্যিকার ঐতিহ্যের মূল্যবান উপকরণ।

পুঁথি সংগ্রহ করে বসে থাকেননি তিনি, সম্পাদনা করেছেন অতি যত্নে। আবদুল করিম আবিষ্কৃত মধ্যযুগের মুসলিম কবি ও কাব্য পরিচিতি উর্দুভাষী নেতাদের খপ্পরে পড়া মাতৃভাষা স্বীকারে দ্বিধাগ্রস্ত বাঙালি মুসলিমদের চমকে দিয়েছিল, বাঙলা ভাষাকে মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করার প্রেরণা দিয়েছিল, বাঙালি মুসলিমদের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ব্যবহারিক জীবনে এনে দিয়েছিল নতুন এক চেতনা। এ চেতনাকে ভিত্তি করেই বাঙালি সত্তার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে। ওই মাতৃভাষা চেতনাই বাঙালি মুসলিমদের মোহমুক্তি ঘটায়। এতে মুসলিম মাত্রেরই অভিন্ন স্বার্থ-চেতনার বিলুপ্তি ঘটে। দাবি উত্থাপিত হয় বাঙলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত করার। বিশ্বমুলিমের অভিন্ন জাতীয়তা ও স্বার্থচিন্তা ঘুচিয়ে দেশের মাটিকে, দেশের মানুষকে, স্বদেশের ভাষাকে নিজেদের মূল সত্তা বলে ভাবতে শেখায়, বুঝতে শেখায়, মানতে শেখায়।

১৯০৩ সাল থেকেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য তিনি। ১৯১৪ সালে রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী সভাপতি হলে আবদুল করিমকে সহসভাপতি করেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পন্ডিত সমাজ। ১৯০৯ সালে 'চট্টল ধর্মমন্ডলী,' ১৯২০ সালে নদীয়ার 'সাহিত্য-সভা' তাঁকে 'সাহিত্য বিশারদ' ও 'সাহিত্য সাগর' উপাধিতে ভূষিত করেন।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আবদুল করিমের গুণমুগ্ধ ছিলেন। তিনি সাহিত্যবিশারদকে বি, এ, এর বাঙলার পরীক্ষক নিয়োগ করেছিলেন। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলাভাষা-সাহিত্যের পরীক্ষক ছিলেন।

আবদুল করিম ছিলেন মনে প্রাণে বাঙালি। সাম্প্রদায়িক ভেদ-চিন্তা তাঁর মধ্যে ছিল না। তাঁর সাহিত্য চর্চার শুরু হিন্দু-রচিত পদাবলীর পরিচিতির মাধ্যমে।

ভারতমুক্তি সংগ্রামে আবদুল করিমের সমর্থন এবং বিপ্লবী মহানায়ক সূর্যসেনের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা স্পষ্ট হয়ে ওঠে কিশোর বিপ্লবী হরিপদ ভট্টাচার্যকে ফাঁসিকাষ্ঠ থেকে রক্ষার প্রচেষ্টায়। হরিপদ চট্টগ্রামের পুলিশ সুপার আহসানউল্লাকে হত্যা করে বিপ্লবীদের নির্যাতনের প্রতিশোধ নিতে। আবদুল করিম আদালতে একজন সম্মানিত জুরার। তাঁর মতে হরিপদ নির্দোষ। আরো একজন জুরারকে তিনি সপক্ষে এনে একই কথা উচ্চারণ করিয়েছেন। তাতে বিপ্লবী হরিপদের ফাঁসির পরিবর্তে জেল হয়।

বাংলাভাষা প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর সংগ্রাম-বিদ্রোহ অবিস্মরণীয়। তাঁর মন জুড়ে বাঙলা-বাঙালির মধ্যযুগের জীবনচিত্র। চোখের সামনে ভয়াবহ বর্তমান। কল্পনায় সুন্দর ভবিষ্যৎ-বাঙলাদেশ, বাঙলাভাষা আর বাঙালি জাতি।

১৯৫১ সালে চট্টগ্রাম সংস্কৃতি সম্মেলনের সভাপতি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের ভাষণ ঃ

ঐতিহ্যের সাথে দেশের ইতিহাস, ধর্ম, ভাষা, লৌকিক আচার, বায়ু, গাছপালা, এমনকি তরুলতাও জড়িত। বুকে দেশপ্রেম না থাকলে তা কাকেও বুঝিয়ে দেয়া মুশকিল। অনেকে আবার সবকিছুকে মানতেই চাননা। জোর দেন দেশের বিশেষ কোন একটি অঙ্গের উপর। যে বিষয়ে জোর দেয়া হয় সেটাই ফেঁপে-ফুলে ওঠে। জোর যেখানে দেয়া হল তা মোটা দেখায় বটে, কিন্তু অন্যান্য অংশ শুকিয়ে মরে যায়। একটা লোকের শুধু কোমর স্ফীত হলে স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়, স্বাস্থ্যাভাবই বোঝায়।

নতুন পাকিস্তানে কৃত্রিম ইসলামী ভাবধারার প্রচারকারীরা অনেকেই এরূপ কাজে অগ্রসর হয়ে দেশের মাটিকে পর্যন্ত অস্বীকার করেন। আসলে তা বাতুলতা। অমন বাতুলরাই জাতীয় জীবন বিকাশের পথে নানা সংকট সৃষ্টি করে। এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সমাজ অবিভক্ত ভারতে দেড়শ' বছর আমাদের সাথে বসবাস করে এসেছে, তারা কোন কৃষ্টি সৃষ্টি করতে পারেনি। দেড়শ বছর একটি সমাজের পক্ষে কম সময় নয়। তারা মনে করতো তাদের জন্মভূমি ভারত নয়, ইংল্যান্ড। মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাদের পিতামহী অথবা মাতামহী। দেশের জল-হাওয়া ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে গেলে সংস্কৃতির অমন দুর্দশাই ঘটে। সুধীজনের কাছে এতটুকু ইঙ্গিতই যথেষ্ট বলে আমার বিশ্বাস।

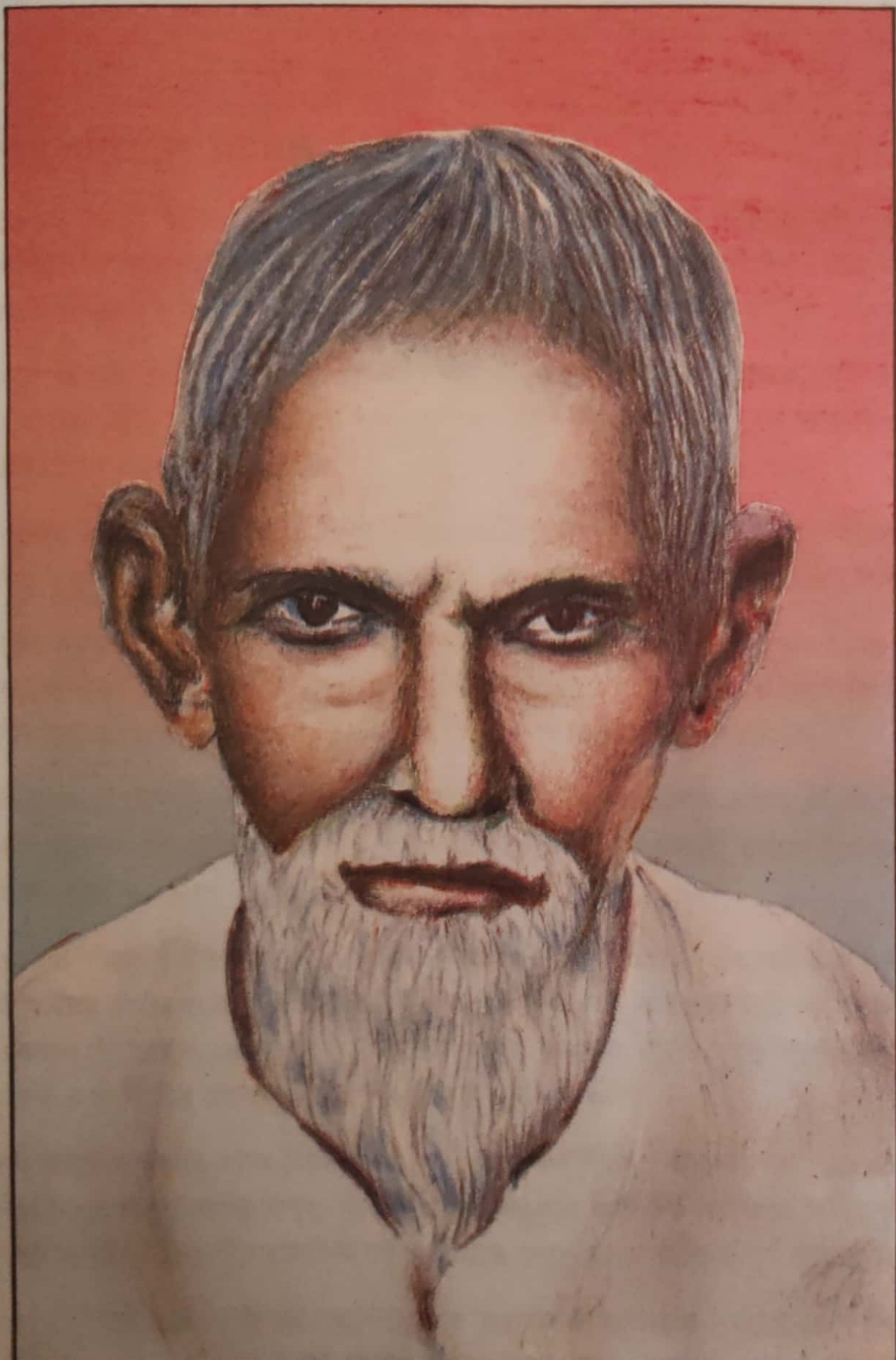
ঐতিহ্যে আলাদা এক শক্তি, এ শক্তিকে স্বীকার করতেই হয়। শুধু স্বীকার করে বসে থাকলে চলে না, তা হবে গতানুগতিকতা। গতানুগতিকতার অর্থ শিল্প-সংস্কৃতির মৃত্যু। ঐতিহ্য স্বীকার করে তার প্রবাহ এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তাতেই সংস্কৃতি বিকাশের সার্থকতা। ভাল কাজে প্রতিবাদী থাকে, বিরূপ সমালোচনাও। প্রতিবাদীর সমালোচনা না থাকলে ভাল কাজ নিখুঁত হয় না। অনুরূপ ঐতিহ্যের স্বীকৃতি অস্বীকৃতির টানাপোড়েনই সংস্কৃতির অগ্রগতি সম্ভব।

পুরানো পুঁথি কংকালের মত, আমি তার ব্যবসায়ী। আমি সে পুঁথির ভেতর যুগযুগান্তের রক্তধমন ও নিঃশ্বাসের প্রবাহধ্বনি শুনেছি। আমার বিশ্বাস সে যুগের শিল্প স্রষ্টাদের পক্ষে যা সত্য ছিল, তার বিশেষ ব্যতিক্রম আজো ঘটেনি।

মধ্যযুগীয় কাব্য ও কাব্যরীতির সাধকদের মূল প্রেরণা সমাজ। দৈনন্দিন জীবনই রসের উৎসক্ষেত্র। তাই কোথাও দেখা যায় কবি দেবতার ছবি আঁকছেন কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারে তা তদানীন্তন বাঙলার সমাজচিত্র হয়ে গেছে। আপনারা বলবেন এটা শিল্পীর কৌশল কিন্তু একথা সত্য, সমাজের দিকে তাঁরা চোখ খোলা রেখেছিলেন বলেই এমন অঙ্কন-দক্ষতা লাভ করেছেন। তার আস্বাদ যুগযুগান্তর অতিক্রম করে আজও অবিকৃত অম্লান রয়েছে। আপনারা পূর্বসূরীদের সে কৌশল বা দক্ষতাকে অবহেলা করতে পারেন না। সমাজেই তো জীবন। জীবনের শিল্পী কি কখনো সমাজকে অস্বীকার করতে পারে?

যুগে যুগে সমাজে নানা পরিবর্তন ঘটেছে। একযুগের শিল্পরীতি দিয়ে অন্য যুগের সমাজকে আঁকা চলে না। রীতিও তেমন পরিবর্তিত হয়েছে। নক্ষত্রের গতিশীলতা থেকে জ্যোতির্বিদগণ পৃথিবীর গতিশীলতা স্থির করেছেন। আমরা শিল্পরীতি দেখে সমাজের গতিশীলতা বুঝতে পারি। আবার সমাজের চেহারা দেখেও বুঝি। এভাবে স্থানকাল ভেদে সাহিত্যের আদর্শ পরিবর্তনশীল। এটা লক্ষ্য করার জন্য সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত ছাড়া অন্যকোন উপায় নেই। সেজন্যে দৃষ্টিশক্তির সাধনার প্রয়োজন। প্রাচীন কবিরা তারও পথ নির্দেশ দিয়েছেন। তা এক কথায় বলা যায়-উদারতা। যে যত উদার, তার দৃষ্টি তত স্বচ্ছ।

নানা জাত-বর্ণ, ধর্ম-গোত্র ও ভাষার মানুষের দেশে বা রাষ্ট্রে সহিষ্ণুতায় সহাবস্থান করার গুরুত্ব উপলব্ধির নিরিখেই বাউল কবির বাণীর ঝংকার-'আমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজেদে/ওরে ও পরম গুরু সাঁই/ তোর পথ দেখতে না পাই/ আমায় রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মুরসেদে।' অশিক্ষিত, অজ্ঞাত বাউল কবির হৃদয়ের সে আর্তনাদ আজও কানে আসে। মানুষে মানুষে ঐক্যের প্রচেষ্টাই ছিল তাঁদের সাধনা। উদারতার এই এক অদ্বিতীয় সংজ্ঞা। কিন্তু প্রাচীন কবির বাণী আজও সার্থক হয়নি। ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব, হানাহানি, লোভ জিঘাংসার জঘন্য চিত্র আজও আমাদের দৈনন্দিন ঘটনার পটভূমি। সাম্প্রদায়িকতা হাজারো মানুষের ঘর ভেঙ্গেছে। তাই এই জাতীয় দুর্দিনে সে প্রাচীন সাধক কবিদের পথের হদিস ভালরূপে জানা দরকার। মানুষে মানুষে বিভেদ আছে সত্য। এই বিভেদকে জয় করাই সংস্কৃতি। সংস্কৃতি ঐক্যের বাহন।



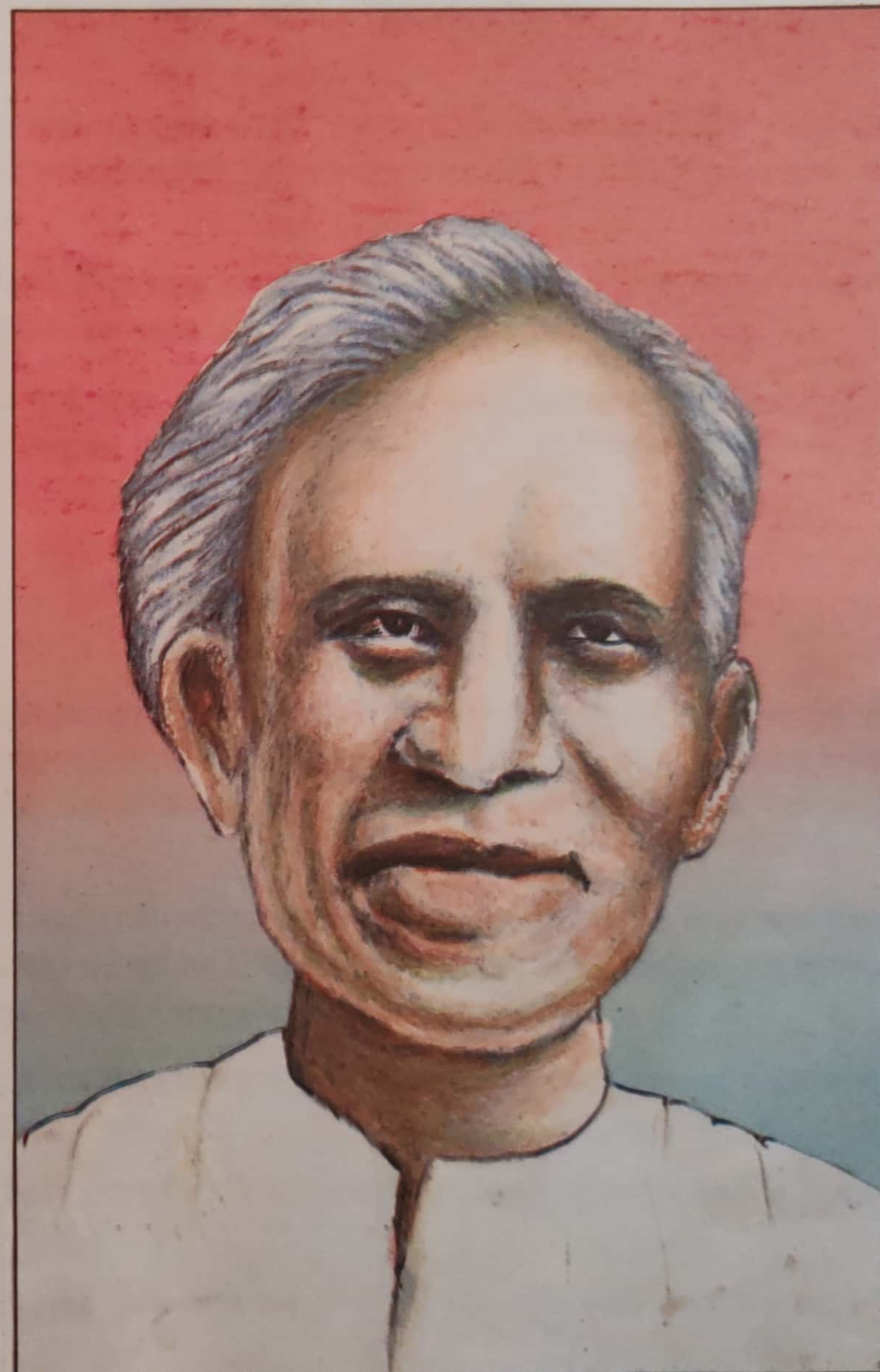
অঙ্কন / অমলেন্দু বিশ্বাস

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৭১-১৯৫৩)

পটিয়া থানার সূচক্রদণ্ডী গ্রামে জন্ম। পিতা মুন্সি নূরউদ্দিন, মাতা মিসরীজান। বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতা। পরে সাব জজ আদালতের কেরানি। চাকরি জীবনের পাশাপাশি সাহিত্যসাধনা। মধ্যযুগের কবিদের পুঁথির সংগ্রাহক। বাঙলাভাষা আন্দোলনের আদি পথিকৃৎ।

গণকবিয়াল রমেশ শীল (১৮৭৭-১৯৬৭)

বোয়ালখালী থানার গোমদণ্ডী গ্রামে জন্ম। পিতা চণ্ডীচরণ শীল, মাতা রাজকুমারী। ১১ বছর বয়সে বার্মা গমন, প্রত্যাবর্তন ১৮ বছর বয়সে। ২১ বছর বয়সে হঠাৎ কবিগায়ক হওয়া। গ্রাম-গঞ্জের দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের মধ্যে মিশে তাদের কষ্ট উপলব্ধি। তা থেকেই বিদ্রোহ।



অঙ্কন / অমলেন্দু বিশ্বাস

গণকবিয়াল রমেশ শীল

১৮৯৮ সালে চট্টগ্রামের মাঝির ঘাটে কবিগান শুনতে গিয়ে গাইতে হল। প্রতিপক্ষ প্রবীণ কবিয়াল মোহনবাঁশী। মোহনবাঁশী দক্ষ কৌশলী কবিয়াল। অমন কবিয়ালের সাথে আঠার ঘন্টা গানের লড়াই করে কবিয়াল হয়ে গেলেন। চার বছরেই নামী দামী কবিয়াল। কবিয়াল শিরোমণি নবীন ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। এর পর থেকে শুরু হয় গুরু-শিষ্যের গানের লড়াই।

দীর্ঘ আঠার বছর গানের লড়াই আর জীবন-সংগ্রাম, জীবন সংগ্রামে গ্রাম-বাঙলার সাধারণ-মানুষের নৈকট্য, সে নিকট থেকে দেখা মানুষগুলো কংকালসার। সাম্রাজ্যবাদী আর সামন্ততান্ত্রিক শাসনশোষণে গ্রাম-বাঙলা শ্মশান। সে শ্মশানে লোকঐতিহ্য লোকসংস্কৃতি পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে। লোকসংস্কৃতির বাহক কবিয়াল আর বাঈজীতে তফাৎ কিছুই নেই।

শ্মশান-চিতার বীভৎসতা ছাপিয়ে বেজে ওঠে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা, স্বদেশ অস্থির। জীবনযাত্রার ভয়াবহ চিত্র কবিয়ালের চোখে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অগ্নিমূল্য। কবিয়াল কণ্ঠে কষ্টের ক্ষোভ-'পাঁচগজ ধুতি সাত টাকা/দেহ ঢাকা হয়েছে কঠিন। রমেশ কয় আঁধারে মরি/পাইনা কেরোসিন।'

রেল ধর্মঘট আর খিলাফৎ আন্দোলন জনজীবনে আনে সংকট। খিলাফৎ সমগ্র ভারত জুড়ে হলেও রেল ধর্মঘট চট্টগ্রামের বুকে। সংগ্রামী জনতার কাতারে দাঁড়িয়ে রমেশ শীল রুদ্র বীণায় ঝংকার তোলেন- 'আর যায় না চুপ করে থাকা/যতীন বাবুর নেতৃত্বের বন্ধ হবে রেলের চাকা/ .... কৃষক মজুর এক যোগেতে, হাত মিলালে হাতে হাতে/ শ্বেতাঙ্গ দুষমণের হাতে তবে যাবে জীবন রাখা।'

খিলাফৎ রাজনৈতিক আন্দোলন, ভারতবাসীর ন্যায্য অধিকার আদায়ের আন্দোলন। 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আমাদের দেশ দখলে রেখে, অধিকার বঞ্চিত করে, আমাদের সম্পদ লুট করে নিয়ে যাচ্ছে সুদূর লন্ডনে। কবিয়ালের কলমে বিদ্রোহ- 'ব্রিটিশ নিল দেশ লুটিয়া/উঠছে মোদের চোখ ফুটিয়া/...... শোষণ করিস পোষণ ভুলি, তোকে তোষণ করা যায় না।'

১৯২৩ সালে ছুফীবাদের সাধন কেন্দ্র 'মাইজ ভান্ডার শরীফ' গেলেন রমেশ শীল। সেখানকার মানবতাবাদী জীবনদর্শন তাঁকে আকর্ষণ করে। সে আদর্শে তাঁর মনোবীণা বেজে ওঠে। এক নাগারে সাত বছর ছুফীবাদী মাইজভান্ডারী সঙ্গীত রচনা করলেন। 'মিমের পর্দা উঠাইলে দেখবি ওরে মন/রাম রহিম কৃষ্ণ করিম মূলেতে একজন।' 'জেলে ধোপা মুচি তাঁতী, এ সকল ব্যবসার খ্যাতি/মূলে সকল মানুষ জাতি, আর জাতি নাই এই সংসারে।' 'হিন্দু-মুসলিম-খ্রীষ্টান-বৌদ্ধ সকল ধর্মের একই কথা/নীতির রদবদল মাত্র, গন্তব্যস্থান দুটি কোথা!'

গণ আন্দোলন আর সাম্য মৈত্রীর গান গাওয়া রমেশ শীলের জীবনসাধনা। ১৯৩০ সালে মহাবিদ্রোহী সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল ও জালালাবাদ পাহাড়ে বিপ্লবীদের সাথে সশস্ত্র সম্মুখ যুদ্ধে ইংরেজ সরকার বাহিনীর পরাজয়ে কবিয়ালের হৃদয়ে ওঠে তুর্যনাদ। 'বাজিয়া উঠিল বিজয়ের ভেরী, দিগদিগন্ত উজালা/অজুত কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিল বীর প্রসবিনী চট্টলা/বীরের দেশে জনম লভেছি পূর্ণ হয়েছে মনোসাধ/শহীদ খুনে রাঙ্গা তুমি জালালাবাদ! জালালাবাদ!'

১৯৩৪ সালে চট্টগ্রাম সশস্ত্র মহাবিদ্রোহের মহানায়ক মাষ্টারদা সূর্যসেনের ফাঁসি হল, কবিয়ালের লেখনীমুখে বেরুল আগ্নেয়গিরির লাভা। -'প্রাণের মশাল জ্বালাও ঝটিতে বিদ্রোহে তোলো ফণা। ভেঙ্গে চুরমার করো সব কারাগার, শত্রুর হোক জানা।'

১৯৩৯ থেকে ১৯৪৪ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চট্টগ্রামকে করল বিধ্বস্ত। চট্টগ্রাম প্রেতপুরী, সে প্রেতপুরীর ছবি কবিয়ালের কলমে-কণ্ঠে,-'পুত্রকন্যা বেচে পিতা, ছেলের আহার খাচ্ছে মাতা/দয়া নাইকো কাহারো পরানে।'

১৯৪৩ সালে কৃষক-শ্রমিকের সমাবেশে কবিয়ালকণ্ঠ সোচ্চার,-'আয়রে ত্বরা করে আয়রে কৃষক মজুর দল।' '.......... সারাদিন খেটে খেটে তবু অন্ন নাহি জোটে/জমিদারে নিচ্ছে লুটে, হচ্ছে মোদের ভিটা তল।'

বাগোয়ান কৃষক সম্মেলনে কবিয়ালকণ্ঠের গানের সুরে জমিদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঘোষণা। .... 'বাংলার কৃষক ভাইগণ, হওরে চেতন/জমিদারের হাতের মুঠোয় আমাদের জীবন। ......'শোষণকারী জমিদার, জমিদার নয় 'যম দুয়ার'।

১৯৪৭ সালে দেশ-বিভাগ, হিন্দু সম্প্রদায়ে পলায়নের হিড়িক। কবিয়াল স্বদেশ মাতার কোল ছাড়তে নারাজ।-'বাঙলা মায়ের কোলে থাকি, খেতে শুইতে তোমায় নমি/যাব না আর কারো কোলে থাকব তোমার চরণ চুমি।'

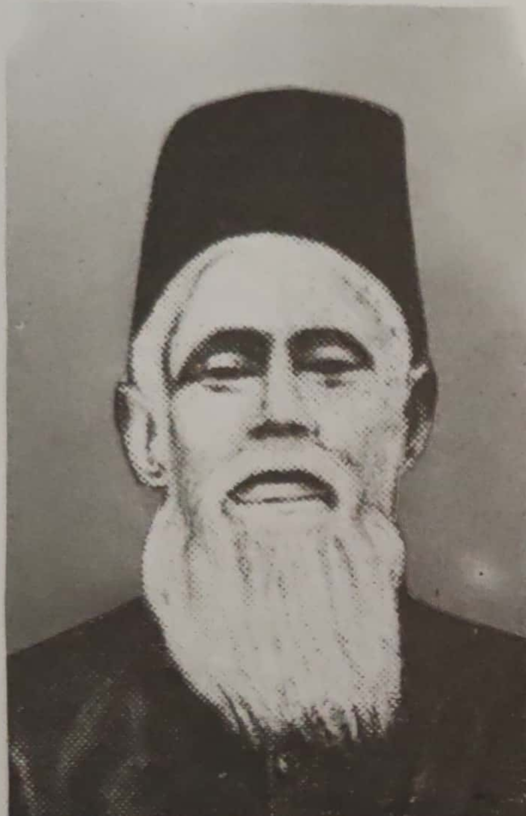
স্বদেশ মাটির প্রতি কবিয়ালের ভালবাসা অফুরন্ত-'মোরা মাটির মানুষ মাটি নিয়া সারাদিন কাটাই। .... মাটি মোদের খাঁটি সোনা, সোনার তরে এবার শেষ লড়াই।'

১৯৫০ সালে রাজবন্দী হত্যা হল রাজশাহী কারাগারে। কবিয়ালের কলমে কঠিন প্রতিজ্ঞা-'কারাগারে হত্যাযজ্ঞ আমরা কভু ভুলব না।' 'মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনা মোরা, মুছাব মায়ের নয়ন জল/এগিয়ে চল্ অগ্নি সেনানী, এগিয়ে চল্।'

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ভাষার জন্য বাঙলার তরুণরা বুকের তাজা রক্তে রাঙিয়ে দিল স্বদেশভূমির সবুজ মাটি। ভাষাযুদ্ধের শহীদদের আত্মার কাছে কবিয়ালের শপথ,-'বাঙলার জন্য জীবন গেলে হব স্বর্গবাসী/আমার ঠিক থাকিবে বাঙলার দাবি যদিও হয় জেল ফাঁসি।'

১৯৫৩ সালে সারা দেশে নির্বাচন। নির্বাচন প্রচারণায় মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন চট্টগ্রাম এলেন। নাজেহাল হলেন চট্টগ্রামের জনতার কাছে। ....'হঠাৎ দেখি পচা আন্ডা, মন্ত্রীরে করিতে ঠাণ্ডা/উড়তে লাগল কালো ঝাণ্ডা, মন্ত্রীর চোখের উপর'। ....'বিপ্লবী চট্টগ্রাম জিলা, সূর্যসেনের প্রধান কিল্লা/মন্ত্রী করে তোবা-তিল্লা, আসবে না আর জনম ভর'। এগান লোকের মুখে মুখে, আতঙ্কিত সরকার, বৃদ্ধ কবিয়ালকে বন্দী করল কারাগারে। কারাভ্যন্তরে বাড়বাগ্নির জ্বালায় জ্বলেছেন কবিয়াল। ......'বীরপদ ভরে কাঁপিয়ে মেদিনী/দিগন্ত ব্যাপিয়া উঠবে জয়ধ্বনি/আয় ছুটে আয় তরুণ তরুণী/ভীরুতা ক্লান্তি চরণে দল।'

দারিদ্র্যের শোষিত সন্তান কবিয়াল। হৃদয়ের অমিত বিত্তে দারিদ্র্যের সাথে তাঁর সারা জীবন যুদ্ধ। তাঁর গানের কথা-সুর উৎসারিত হয়েছে সে অফুরন্ত বিত্তশক্তি থেকে। তাঁর দেশাত্ম-সঙ্গীত অবজ্ঞেয় অবহেলিত দেশের কোটি কোটি নরনারীর নিপীড়িত প্রাণের গোপন বাণী। সে পীড়নের ধ্বংসস্তূপের সীমানায় বসে রুদ্রবীণায় ঝংকার দিয়ে ভেবেছেন সমাজের হাজারো দুর্নীতির কথা, মানুষে মানুষে বৈষম্যের কথা, নীচ খল মানুষের নিষ্ঠুরতার কথা। তাতে তাঁর মন হয়েছে ক্ষুব্ধ, আগ্নেয়গিরির ভীষণতার মত প্রকাশিত হয়েছে তাঁর বিদ্রোহ।



কাজেম আলী মিঞা

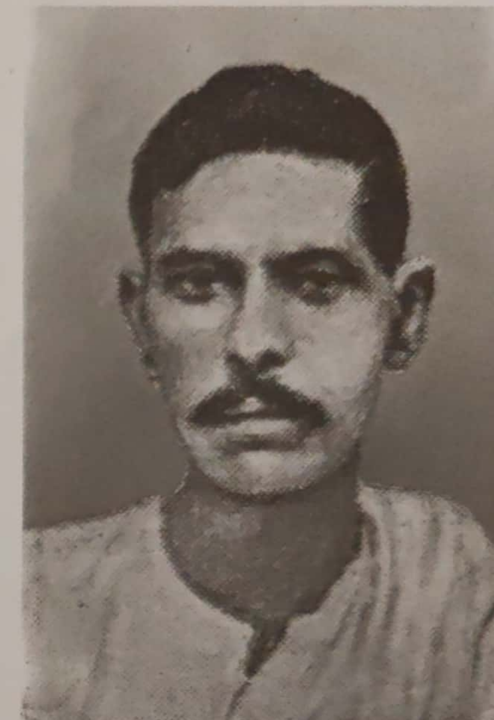
(১৮৫২-১৯২৬)

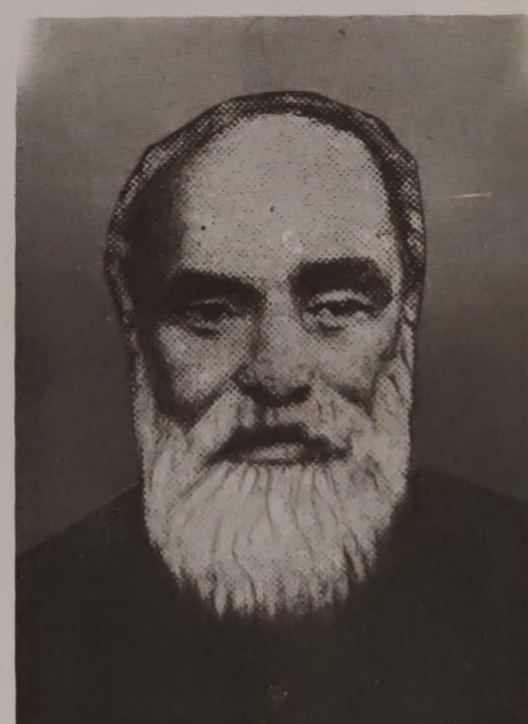
চট্টগ্রামের বাকলিয়ায় জন্ম। লেখাপড়া কলকাতায়। সেখান থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন। কাজেম আলী স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ। সরকার প্রদত্ত 'খান বাহাদুর' উপাধি প্রত্যাখ্যান। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সংগঠক। ১৯১৩ সাল থেকে চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটির আজীবন কমিশনার। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে নানা আন্দোলনে অংশগ্রহণ ও কারাবরণ। অসাধারণ বাগ্মী।

নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৮৫৬-১৯১২)

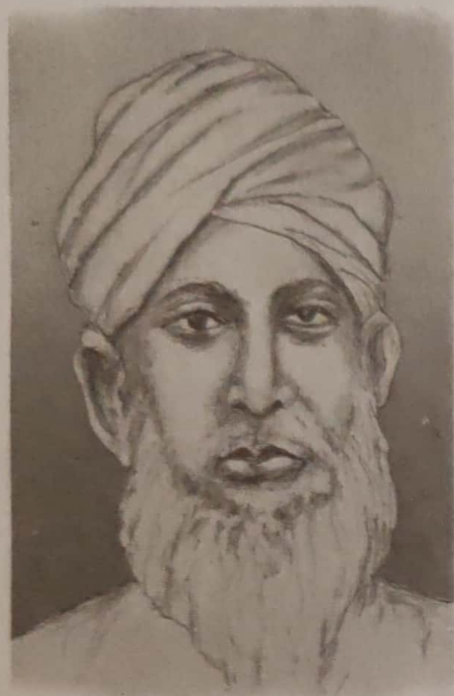
জন্ম কলিকাতা। চট্টগ্রাম কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক। কলেজের উপাধ্যক্ষ। ১৯২১ সালে হঠাৎ অধ্যাপনা ছেড়ে যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান। চট্টগ্রামেই ক্ষেত্র, চট্টগ্রামের ছেলে-মেয়েদের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে তাঁর প্রচণ্ড আস্থা। তাঁর অধিনায়কত্বে 'সারস্বত বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা।





মহিমচন্দ্র দাশ (১৮৭১-১৯৪০)

পটিয়া থানার ভাটিখাইন গ্রামে জন্ম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। ১৮৯৭ সালের আইন পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান লাভ। ১৯১০ সাল থেকে চট্টগ্রাম কংগ্রেসের সভাপতি। সূর্যসেনকে তিনি চট্টগ্রাম কংগ্রেসের সম্পাদক মনোনীত করেন। 'চট্টলগৌরব' উপাধিতে ভূষিত। দৈনিক 'পাঞ্চজন্য'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। 'জাতির নামে বজ্জাতি' গ্রন্থের রচয়িতা। জেল বরণ ৮ বার।



মৌলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০)

পটিয়া থানার বরলিয়ায় জন্ম। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ। কংগ্রেস, খিলাফত, কৃষক প্রজা পার্টি ও আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃত্বদান। মাস্টারদা ও সুভাষ বসুর ঘনিষ্ঠ। দেশ বিভাগে বিরোধী। পুলিশের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বহুবার। 'ভারতে মুসলমান সভ্যতা' গ্রন্থের রচয়িতা। 'দৈনিক সোলতান' এর সম্পাদক।

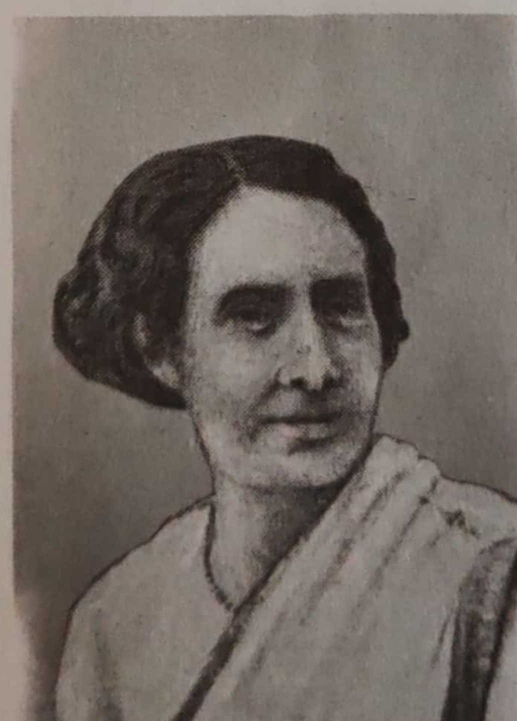


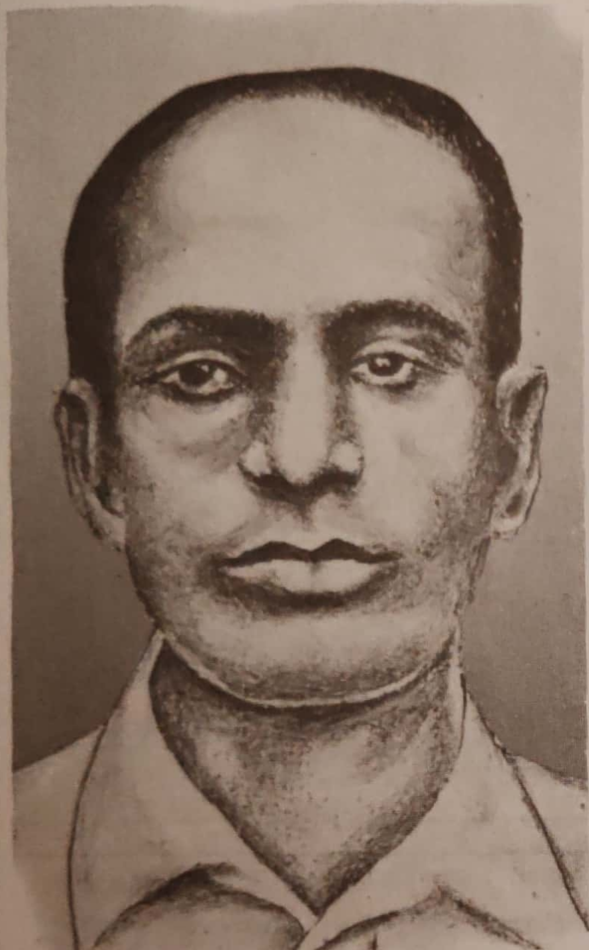
দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন (১৮৮৫-১৯৩৩)

জন্ম পটিয়া থানার বরমা গ্রামে। হেয়ার স্কুল থেকে এন্ট্রান্স। লন্ডন থেকে ব্যারিস্টারী পাশ করেন। কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। প্রভাবিত হন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের রাজনীতিতে। কম সময়েই সর্বভারতীয় রাজনীতির নেতৃস্থানীয়। সর্বপ্রথম এবং সফল শ্রমিক আন্দোলনের সূচনাকারী। মাস্টারদার সশস্ত্র বিপ্লব পরিকল্পনার সমর্থক। চট্টগ্রামের মুকুটহীন সম্রাট। কোলকাতায় ত্রিমুকুট-এর অধিকারী। কোলকাতা কর্পোরেশনে পাঁচবার মেয়র পদ লাভ।

নেলী সেনগুপ্তা (১৮৮৬-১৯৭৩)

জন্ম কেম্ব্রিজ শহরে সম্ভ্রান্ত পরিবারে। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সহধর্মিনী। ইউরোপীয় আচার-আচরণ পরিত্যাগ করে তিনি মনে প্রাণে ভারতীয় নারীতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। যতীন্দ্রমোহনের যোগ্য সহধর্মিনী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন নিজকে। ১৯৩৩ সালে জাতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রী ও কলিকাতা কর্পোরেশনের অলডারম্যান নির্বাচিত হন। স্বামীর সকল আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন।



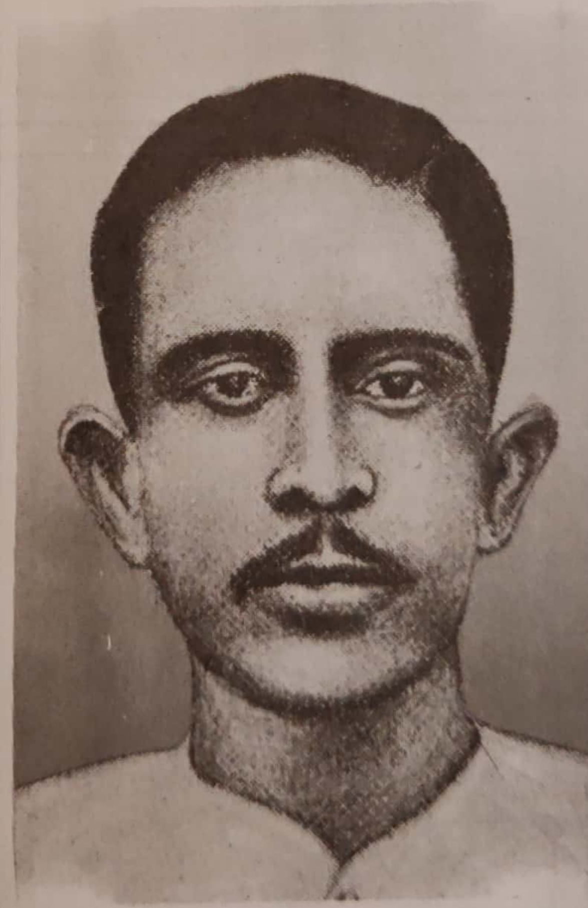


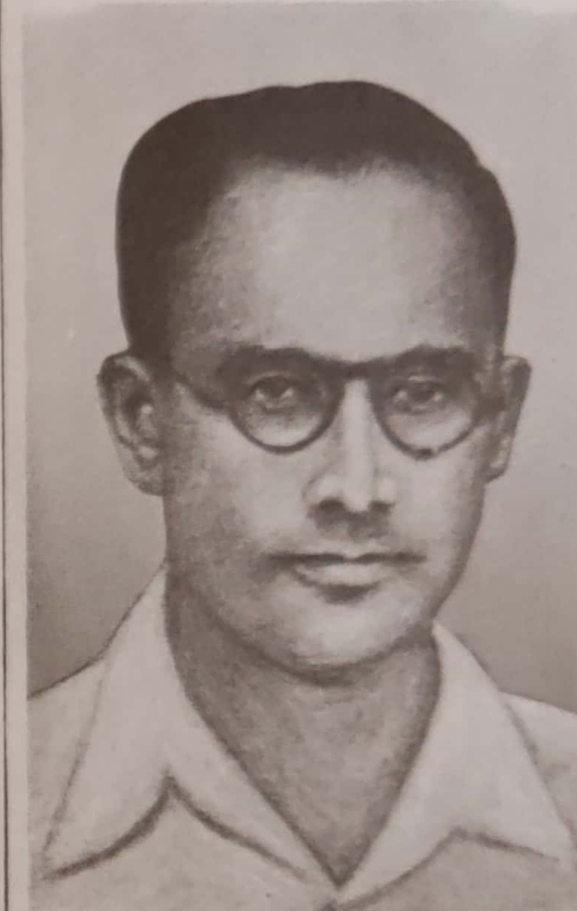
সূর্য সেন (১৮৯৪-১৯৩৪)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করার পর 'চট্টগ্রাম ন্যাশনাল হাই স্কুলে' প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ। পরে 'উমাতারা' স্কুলে প্রধান শিক্ষক। দুই স্কুলে শিক্ষকতাকালীন ছাত্র ও যুবকদের অত্যন্ত আপনজন-'মাস্টারদা'। সশস্ত্র বিপ্লবের লক্ষ্যে দল গঠন হলে দলনেতা নির্বাচিত। ১৯৩০ সালে সশস্ত্র অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব। রিপাবলিকান আর্মির প্রেসিডেন্ট। জালালাবাদ যুদ্ধের পর গ্রামের নিপীড়িত মানুষের মধ্যে থেকে বিপ্লব পরিচালনা করেন।

অনুরূপ সেন (১৮৯৪-১৯২৮)

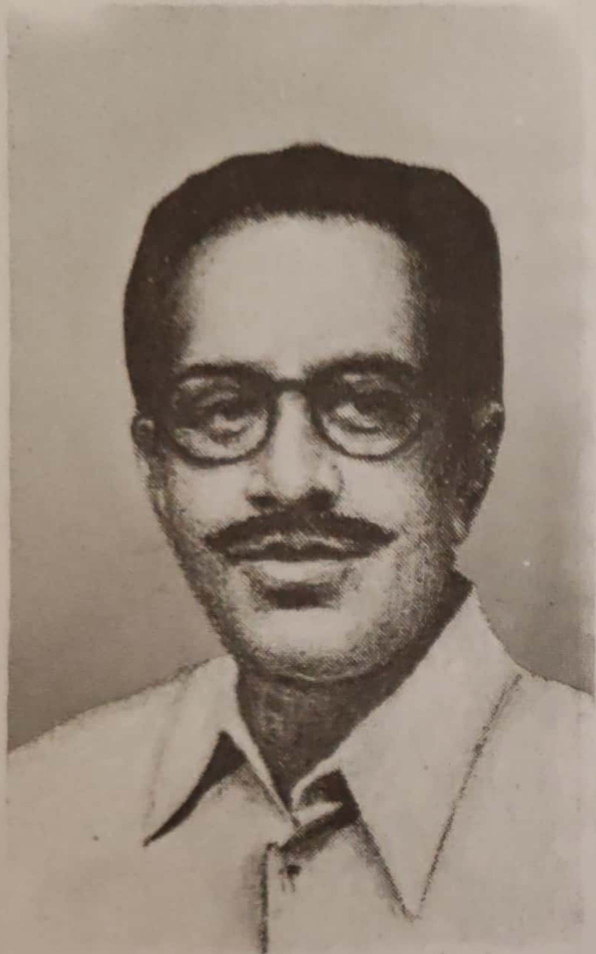
বহরমপুরে জন্ম। বহরমপুর কলেজের ছাত্র। মাস্টারদার সহপাঠী। ১৯১৯ সালের ১৬ জুলাই চট্টগ্রাম আগমন। বিপ্লবীদল গঠনে সক্রিয় ভূমিকা। পাঁচ নেতার অন্যতম। তিনি সংযতবাক পুরুষ। মাস্টারদার পরিকল্পনাগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ করতেন তিনি। দলের নীতি নির্ধারণ ও সাংগঠনিক দক্ষতার অধিকারী। ১৯২৬ সালেই হঠাৎ কারারুদ্ধ হন। ১৯২৮ সালে কারাভ্যন্তরে মৃত্যুবরণ করেন।





অম্বিকা চক্রবর্তী (১৮৯২-১৯৬০)

রাউজান থানার দেওয়ানপুরে জন্ম। পোর্ট অফিসে কেরানির চাকরি। মাস্টারদার সংস্পর্শে চাকরিতে ইস্তফা। বিপ্লবী দলের প্রতিষ্ঠাতা। রেলওয়ের টাকা ডাকাতির পর পুলিশের সাথে যুদ্ধে ধৃত। বিচারে মুক্তি। ১৯৩০ সালে টেলিফোন অফিস আক্রমণে নেতৃত্ব ও জালালাবাদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ। পটিয়া থানার চক্রশালায় আত্মগোপন, পুলিশের অতর্কিত হামলায় ধৃত। বিচারে দীপান্তর, ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত কারাভোগ।



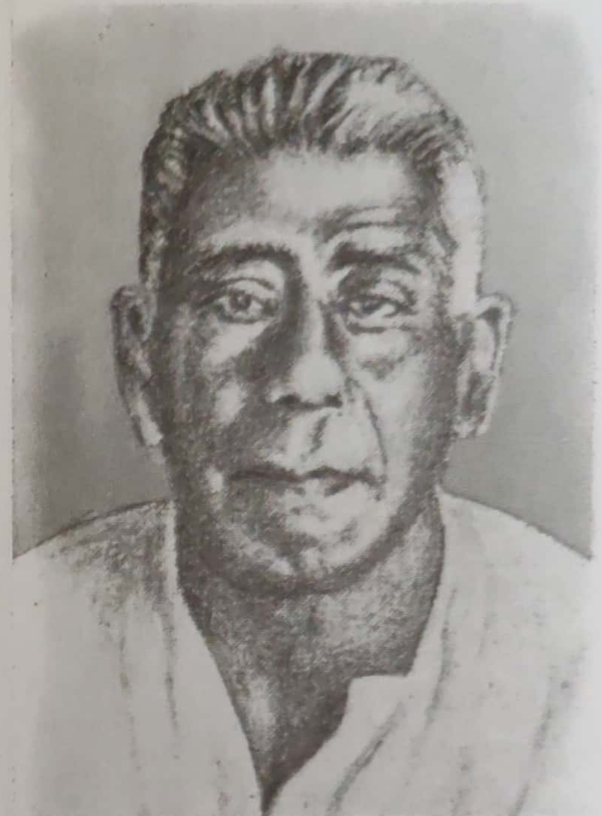
নগেন সেন (জুলুদা)

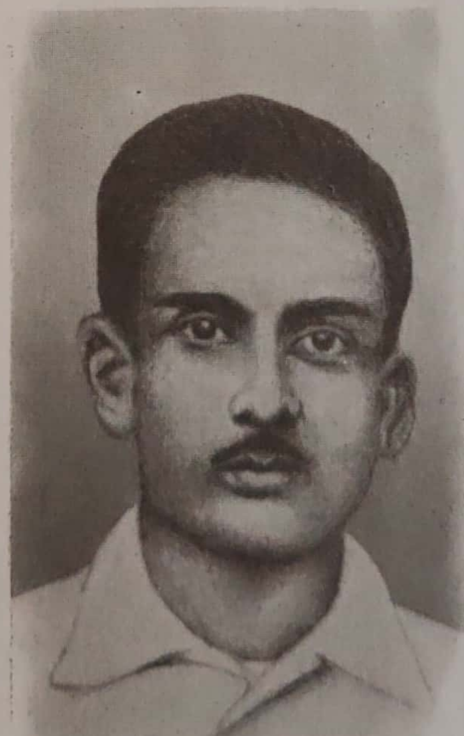
(১৮৮৩-১৯২৮)

পিতা হরকিশোর সেন, মাতা গিরীন্দ্রমোহিনী দেবী। রাউজান থানার কোয়েপাড়া গ্রামে জন্ম। এন্ট্রান্স পাশ করেই সৈন্য বিভাগে যোগদান। ৪৯ বেঙ্গল রেজিমেন্টের নায়েক পদে উন্নীত হন। মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধ শিবির থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ গ্রহণ। ১৯১৯ সালে বিপ্লবীদল গঠনে চট্টগ্রাম আগমন ও দল গঠন। বিপ্লবীদলের মুখ্য অস্ত্র-প্রশিক্ষক ও অস্ত্র সংগ্রাহক। ১৯২৮ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর টাইফয়েড আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ।

চারু বিকাশ দত্ত (১৮৭৮-১৯৩৬)

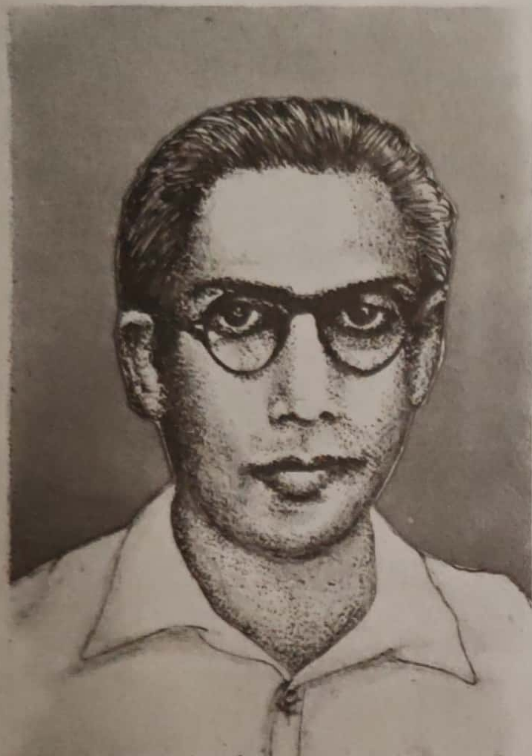
পিতা সুখেন্দু বিকাশ দত্ত, মাতা শৈলজাবালা দত্ত। বোয়ালখালী থানার কানুনগো পাড়ায় জন্ম। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এফ এ পাশ করেন। কলেজে পড়ার সময় থেকেই রাজনীতিতে যুক্ত। ১৯১৯ সালে চট্টগ্রামে বিপ্লবীদল গঠনে পঞ্চপাণ্ডবের একজন। মাস্টারদা সূর্যসেনের সশস্ত্র বিদ্রোহের বিরোধিতা করে অনুশীলনদলে প্রত্যাবর্তন। চট্টগ্রাম অনুশীলন দলের অন্যতম নেতা। ১২ বৎসর কারাবাস।





নির্মল সেন (১৯০০-১৯৩২)

রাউজান থানার কোয়েপাড়ায় জন্ম। পিতা রসিক চন্দ্র সেন। মাস্টারদার দলভুক্ত হন ১৯২০ সাল থেকে। অসীম সাহসী তিনি। অস্ত্রশিক্ষা নিয়েছেন নগেন সেনের কাছে। বিপ্লবী দলের অন্যতম সংগঠক। মাস্টারদার একান্ত সচিব। অস্ত্রাগার দখল ও জালালাবাদ যুদ্ধের সৈনিক। ধলঘাট ঘাঁটি আক্রান্ত হলে মাস্টারদা ও প্রীতিলতাকে সরিয়ে দিয়ে একা অস্ত্র চালনা এবং ক্যাপটেন ক্যামরুণকে হত্যা। পরে গুর্খা সৈন্যের গুলিতে শহীদ।

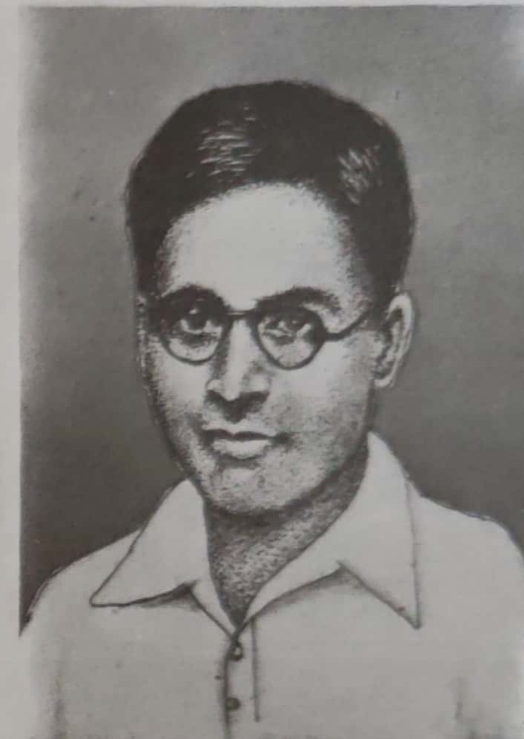


অনন্ত সিংহ (১৯০২-১৯৮০)

জন্ম গোলাপ সিংহ লেন, চট্টগ্রাম। পিতা গোলাপ চন্দ্র সিংহ। ছোট বেলা থেকেই সাহসী এবং দুরন্ত প্রকৃতির। রেলওয়ের টাকা ডাকাতিতে নেতৃত্ব। অস্ত্রাগার দখলে নেতৃত্ব। ফেনী সংঘর্ষে ৪ জন পুলিশ হত্যা। ১৯৩১ এর ৬ মে জেল ষড়যন্ত্রে এবং ২ জুন ডিনামাইট ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনাকারী। অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় আন্দামান জেল। ১৯৪৬-এ মুক্তির পর কোলকাতায় বসবাস, কিংবদন্তীর পুরুষ। নকসাল আন্দোলনের নেপথ্যে নেতা। ইন্দিরা-শাসন আমলে আত্মসমর্পণ ও মুক্তি। দরিদ্র ও নিপীড়িত জনতার জন্য তাঁর লড়াই আমৃত্যু। ধনীর অর্থ ছিনিয়ে দরিদ্রের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছেন। তাঁকে কেউ বলেছে বিপ্লবী, কেউ 'ডাকাত।'

গণেশ ঘোষ (১৯০৫-১৯৯৩)

জন্মস্থান যশোরের মাগুরায়। পিতা বিপিন বিহারী ঘোষ, চট্টগ্রামের ব্যবসায়ী। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সময়ে বিপ্লবী দলে যোগদান। ১৯২৮ সালে কংগ্রেস অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সংগঠক। জালালাবাদ যুদ্ধের সেনাপতি। ১৯৩০ সালের ২ সেপ্টেম্বর চন্দননগর আশ্রয় ঘাঁটি থেকে গ্রেপ্তার। বিচারে দ্বীপান্তর। ১৯৪৬ সালে মুক্তির পর কমিউনিষ্ট দলে যোগদান।





লোকনাথ বল (১৯০৭-১৯৬৪)

বোয়ালখালী থানার ধোরলা গ্রামে জন্ম। পিতা প্রাণকৃষ্ণ বল। ছোটবেলা থেকেই ব্যায়ামবীর, অস্ত্র চালনায় দক্ষ। দামপাড়া পুলিশ ব্যারাক দখল ও পাহাড়তলী অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র দখলে নেতৃত্ব দান। জালালাবাদ যুদ্ধের সেনাধ্যক্ষ। অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় দ্বীপান্তর। ১৯৪৬-এ মুক্তি পেয়ে মানবতাবাদী দলে যোগদান।



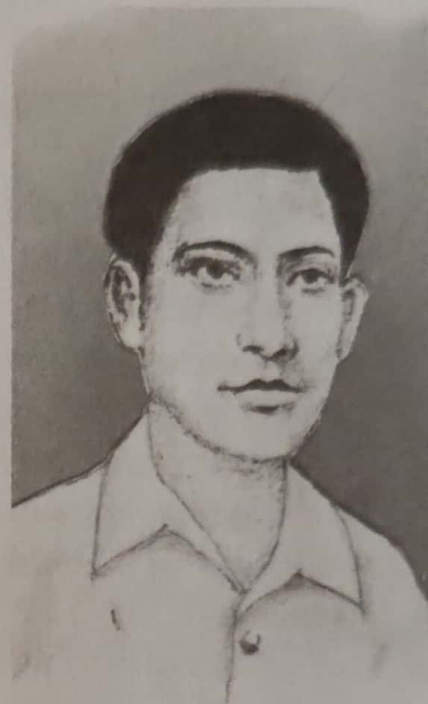
জালালাবাদ যুদ্ধের শহীদ ঃ ১। জিতেন দাশ গুপ্ত (১৯১১–১৯৩০) পটিয়া থানার ধলঘাট গ্রামে জন্ম। পিতা বিনোদ দাশ গুপ্ত। ২। মধুসূদন দত্ত (১৯০৪–১৯৩০) বোয়ালখালী থানার বিদগ্রামে জন্ম। পিতা মনীন্দ্র কুমার দত্ত। ৩। পুলিন চন্দ্র ঘোষ (১৯১২–১৯৩০) চট্টগ্রামের গোসাইল ডাঙ্গায় জন্ম পিতা জগৎ চন্দ্র ঘোষ।৪। হরি গোপাল বল (টেগরা) (১৯১৪–১৯৩০) বোয়ালখালী থানার ধোরলা গ্রামে জন্ম। পিতা প্রাণকৃষ্ণ বল। লোকনাথ বলের ছোট ভাই। ৫। মতি কানুনগো (১৯১২–১৯৩০) জন্ম বোয়ালখালী থানার শ্রীপুর গ্রামে। পিতা দুর্গামোহন কানুনগো। ৬। প্রভাস বল (১৯১২–১৯৩০) বোয়ালখালী থানার ধোরলা গ্রামে জন্ম। পিতা জীবন কৃষ্ণ বল।৭। শশাঙ্ক দত্ত (১৯১২–১৯৩০) পটিয়া থানার ডেঙ্গাপাড়ায় জন্ম। পিতা দুর্গাদাস দত্ত (দারোগা)। ৮। নির্মল লালা (১১৬–১৯৩০) বোয়ালখালী থানার হাওলা গ্রামে জন্ম। পিতা যাত্রামোহন লালা। ৯। নরেশ রায় (১৯০৯–১৯৩০) জন্ম ময়মনসিংহ। চট্টগ্রাম মেডিকেল স্কুলের ছাত্র। ১০। ত্রিপুরা সেন (১৯১৩–১৯৩০) জন্ম স্থান ঢাকা, চট্টগ্রামের সদরঘাটে বাসা। পিতা জিতেন্দ্র মোহন সেন। ১১। বিধু ভট্টাচার্য (১৯০৫–১৯৩০) জন্ম ত্রিপুরা। চট্টগ্রাম মেডিকেল স্কুলের ছাত্র।



রজত সেন

(১৯১৩-১৯৩০)

রাউজান থানার কোয়েপাড়ায় জন্ম। পিতা রঞ্জন সেন, মাতা বিনোদিনী দেবী। চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র থাকাকালীন বিপ্লবীদলে যোগদান। অস্ত্রাগার দখল ও জালালাবাদ যুদ্ধের সৈনিক। ১৯৩০ এর ৬ মে কালারপুল যুদ্ধে শহীদ।



দেবপ্রসাদ গুপ্ত

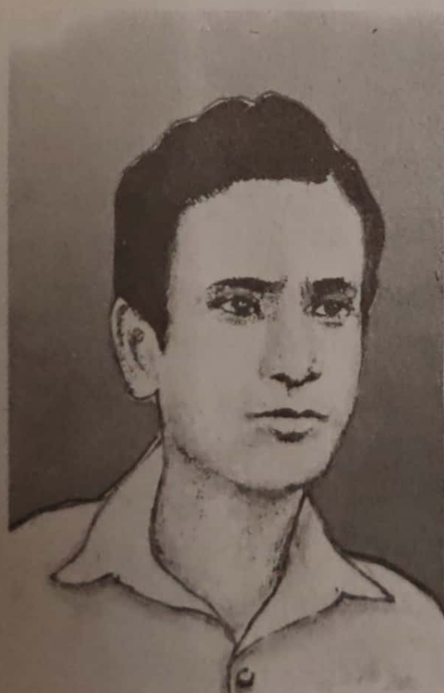
(১৯১১-১৯৩০)

চট্টগ্রাম শহরের প্যারেড ময়দানের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে টিলায় বাড়ি। পিতামহ রাজেশ্বর চট্টগ্রামে এসে বসবাস করেন। পিতা যোগেন্দ্র প্রসাদ গুপ্ত। অস্ত্রাগার দখল ও জালালাবাদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ। কালার পুল যুদ্ধে শহীদ।

স্বদেশ রায়

(১৯১০-১৯৩০)

জন্ম ঢাকায়। চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা উত্তীর্ণ। ১৯২৯ সালে বিপ্লবীদলের সদস্যপদ লাভ। অস্ত্রাগার দখল ও জালালাবাদ যুদ্ধের সৈনিক। কালারপুলে পুলিশের সাথে সন্মুখ যুদ্ধে শহীদ।



মনোরঞ্জন সেন

(১৯১২-১৯৩০)

পটিয়া থানার বরমা গ্রামে জন্ম। পিতা রজনীকান্ত সেন। ১৯৩০ সালেই বিপ্লবীদলে যোগদান। অস্ত্রাগার দখল ও জালালাবাদ যুদ্ধের সৈনিক। কালার পুল আশ্রয়স্থলে ১৯৩০ এর ৬ মে পুলিশের অতর্কিত আক্রমণ, সন্মুখযুদ্ধে শহীদ।





হরিগোপাল বল (টেগরা)

(১৯১৪-১৯৩০))

বোয়ালখালী থানার ধোরলা গ্রামে জন্ম। পিতা প্রাণকৃষ্ণ বল। লোকনাথ বলের ছোট ভাই। অস্ত্রাগার দখল ও জালালাবাদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ। এ যুদ্ধে প্রথম শহীদ হওয়ার গৌরব অর্জন। 'পিছন তাকিয়ো না, যুদ্ধ কর'- সোনা ভাই! যুদ্ধ কর।' এই তাঁর শেষ উচ্চারণ।



শৈলেশ্বর চক্রবর্তী

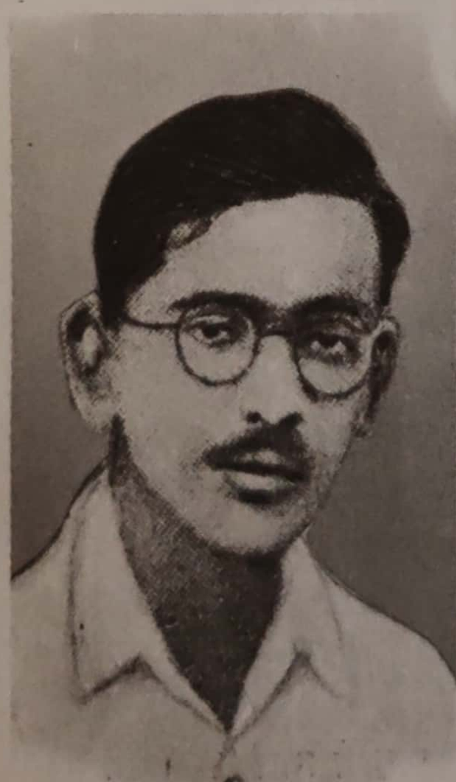
(১৯১০-১৯৩২)

জন্ম রাউজান থানার দেওয়ানপুর। পিতা রত্নেশ্বর চক্রবর্তী। অস্ত্রাগার দখল ও জালালাবাদ যুদ্ধের সৈনিক। ১৯৩২ সালের ১০ ও ১৪ আগস্ট পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে পর পর দুবার ব্যর্থ হয়ে আত্মবিসর্জন।

জীবন ঘোষাল

(১৯১২-১৯৩০)

জন্ম চট্টগ্রামের সদরঘাট। পিতা যশোদা ঘোষাল। অস্ত্রাগার দখলে অংশ গ্রহণ। ১৯৩০ সালের ২৪ এপ্রিল ফেনীতে পুলিশের সাথে সংঘর্ষ ও পুলিশ হত্যা। ৬ মে কোলকাতার আশ্রয় ঘাঁটি, ১৮ মে চন্দননগর, চন্দননগরে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে শহীদ।



অমরেন্দ্র নন্দী

(১৯১২-১৯৩০)

জন্ম পটিয়া থানার দক্ষিণ ভূর্ষি। পিতা রসিক নন্দী। চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র। অস্ত্রাগার দখল ও জালালাবাদ যুদ্ধের সৈনিক। ১৯৩০ এর ২০ এপ্রিল ফিরিঙ্গি বাজার রোডে পুলিশের সাথে সংঘর্ষ ও আত্মাহুতি।

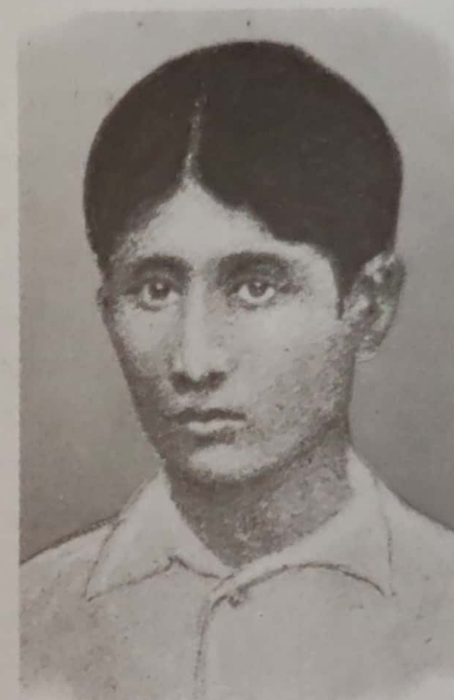




হরিপদ ভট্টাচার্য

(১৯১৪-১৯৯৩)

জন্ম বোয়ালখালী থানার পোপাদিয়া গ্রামে। অষ্টমশ্রেণীর ছাত্র থাকাকালীন বিপ্লবী দলে যুক্ত। অম্বিকা চক্রবর্তী গ্রেপ্তার হয়ে আহসানউল্লা কর্তৃক অত্যাচরিত হলে তিনি শপথ গ্রহণ করেন আহসানউল্লা হত্যার। ফুটবল খেলার মাঠে ১৯৩১ সালের ৩০ আগস্ট আহসানউল্লাকে হত্যা করেন। বিচারে দ্বীপান্তর।



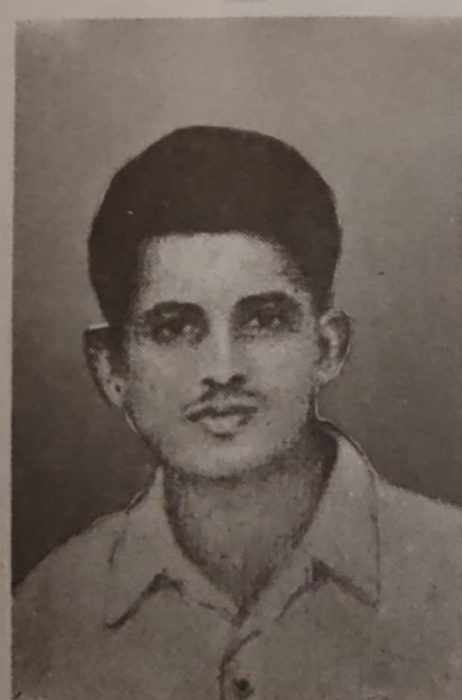
অর্ধেন্দু দস্তিদার

(১৯১০-১৯৩০)

পটিয়া থানার ধলঘাট গ্রামে জন্ম। পিতা চন্দ্রকুমার দস্তিদার। ১৪ বৎসর বয়সে বিপ্লবীদলে যুক্ত। কিশোরকাল থেকেই দুঃসাহসী। ১৯৩০ এর অভ্যুত্থানের পূর্বে বোমা তৈরী করতে গিয়ে বিস্ফোরণে আহত। অস্ত্রাগার দখল ও জালালাবাদ যুদ্ধের সৈনিক। যুদ্ধে আহত, পুলিশ কর্তৃক ২৩ এপ্রিল হাসপাতালে ভর্তি ২৪ এপ্রিল মৃত্যুবরণ।

ভবতোষ ভট্টাচার্য

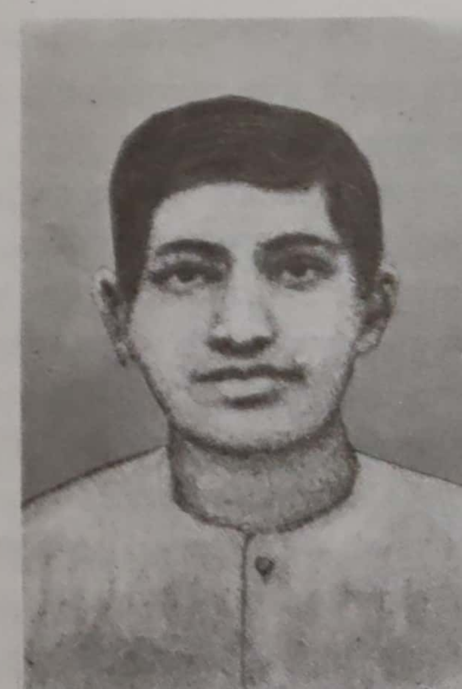
জন্ম আনোয়ারা থানার আনোয়ারা গ্রামে। সদরঘাট কালীবাড়ির সেবায়েতের পুত্র। মাস্টারদার ছাত্র। মাস্টারদার দল গঠনের সময় থেকেই সাহসী কর্মী। পুলিশ ব্যারাক দখল ও জালালাবাদ যুদ্ধের সাহসী সৈনিক। বয়স মাত্র ১৮ বৎসর।



প্রমোদ চৌধুরী

(১৯০১-১৯২৬)

পটিয়া থানার কেলিশহর গ্রামে জন্ম। পিতা ঈশান চন্দ্র চৌধুরী। অনুশীলন দল থেকে মাস্টারদার দলে আসেন। দক্ষিণেশ্বর বোমা মামলায় দণ্ডিত। আলীপুর জেলের সুপার ভূপেন চাটার্জিকে হত্যা। ১৯২৫ সালের বিচারে ১৯২৬ সালের ৯ আগষ্ট ফাঁসি।





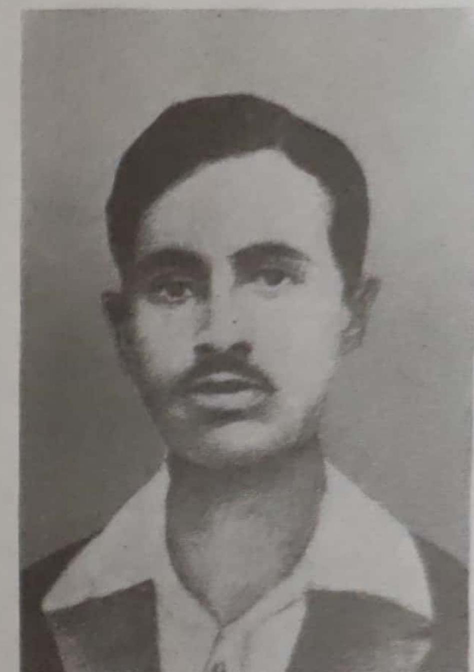
অপূর্ব সেন (ভোলা) (১৯১২-১৯৩২)

বোয়ালখালী থানার সারোয়াতলী গ্রামে জন্ম। রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের প্রভাবে বিপ্লবী দলে যোগদান। মাস্টারদার সাক্ষাৎ প্রার্থী প্রীতিলতা শহর থেকে কানুনগোপাড়া ঘাঁটিতে এলে মাস্টারদার নির্দেশে প্রীতিলতার সাথে সাক্ষাৎ। ধলঘাট আশ্রয় ঘাঁটিতে মাস্টারদার কাছে প্রীতিলতাকে পৌছিয়ে দিতে যাওয়া। মাস্টারদার পরবর্তী নির্দেশের জন্য প্রতীক্ষা। সন্ধ্যার পর হঠাৎ সে আশ্রয় ঘাঁটি ক্যাপটেন ক্যামরুণ কর্তৃক ঘেরাও। মাস্টারদা ও প্রীতিলতাকে নিয়ে সৈন্যবেষ্টনী ভেঙ্গে পালানোর সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ।

তারকেশ্বর দস্তিদার

(১৯০৮-১৯৩৪)

বোয়ালখালী থানার সারোয়াতলী গ্রামে জন্ম। পিতা চন্দ্রমোহন দস্তিদার। ১৯৩০ সালে বিপ্লবী দলে যোগদান। ১৯৩১ এর ৩১ মার্চ বরমা সংঘর্ষে নেতৃত্ব। মাস্টারদা গৈরলা ঘাঁটি থেকে গ্রেপ্তার হয়ে গেলে বিপ্লবীদলের নেতা নির্বাচিত। ১৯৩৩ সালে আনোয়ারা থানার গহিরা সংঘর্ষে সৈন্যবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণে বাধ্য। ১৯৩৪ সালে মাস্টারদার সাথেই ফাঁসিতে আত্মাহুতি।





কৃষ্ণ চৌধুরী (১৯১৩-১৯৩৪)

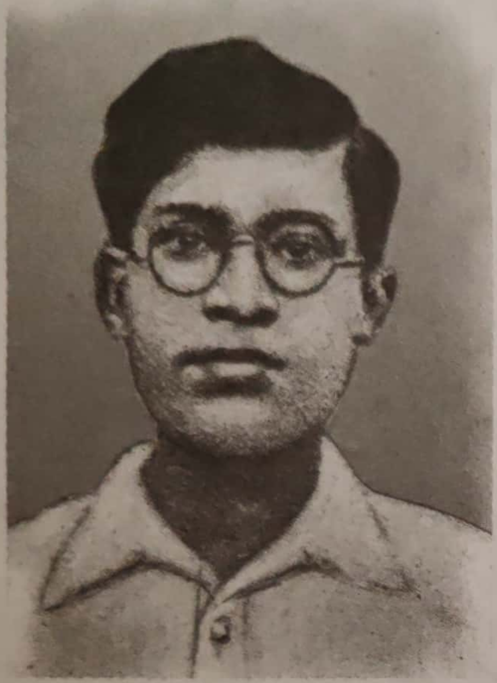
পটিয়া থানার কেলিশহর গ্রামে জন্ম। অস্ত্রাগার দখল ও জালালাবাদ যুদ্ধের সৈনিক। ১৯৩৪ সালের ৭ জানুয়ারী ইউরোপীয়ান ক্রিকেট মাঠে বোমা হামলা। পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার, বিচারে ফাঁসি, ১৯৩৪ সালের ৫ জুন।



প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার

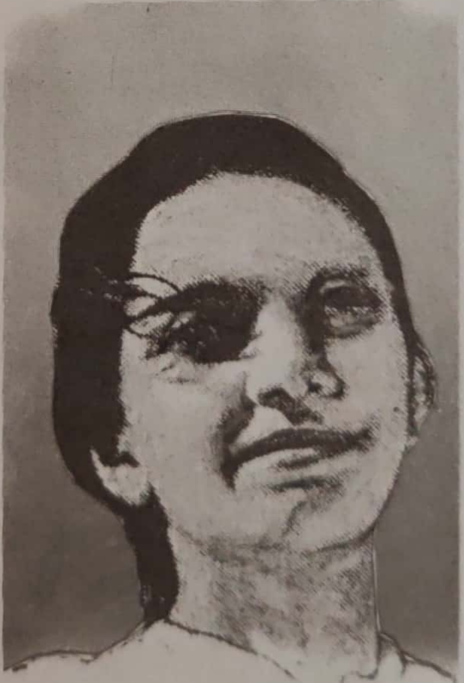
(১৯০৯-১৯৩২)

জন্ম চট্টগ্রামে। পিতা জগৎবন্ধু, মাতা প্রতিভাময়ী। প্রবেশিকা খাস্তগীর স্কুল, আইএ ঢাকার ইডেন, স্নাতক কলিকাতার বেথুন। ইডেনে পড়ার সময় বিপ্লবী দলে যুক্ত। ১৯৩২ সালে ধলঘাট ঘাঁটিতে মাস্টারদার সাথে সাক্ষাৎ। সেখানে সেনাবাহিনীর অতর্কিত আক্রমণ, সেনাব্যূহ ভেঙ্গে মাস্টারদাসহ বেরিয়ে আসতে সমর্থ। ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে নেতৃত্ব, আততায়ীর গুলিতে আহত, ধরা পড়ার আশংকায় আত্মাহুতি।



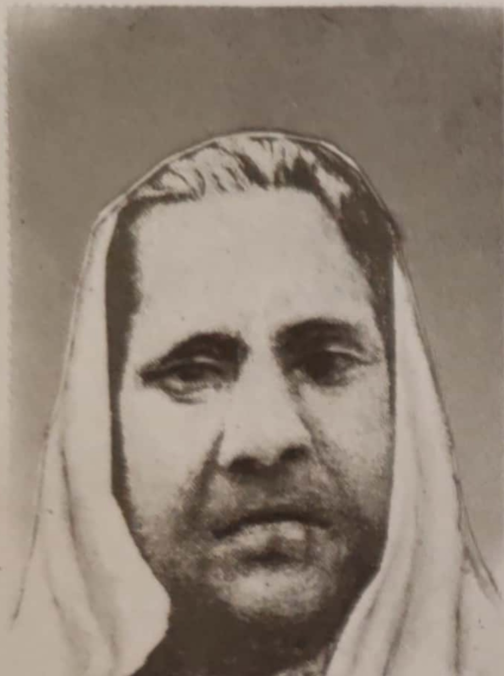
রামকৃষ্ণ বিশ্বাস (১৯১০-১৯৩১)

জন্ম বোয়ালখালী থানার সারোয়াতলী গ্রামে। চট্টগ্রাম কলেজে পড়ার সময় বিপ্লবী দলে যোগদান। বোমা তৈরীতে সুদক্ষ। ১৯৩০ সালে ১ ডিসেম্বর মাস্টারদার নির্দেশে ডিআইজি ক্রেগ হত্যার দায়িত্ব নিয়ে চাঁদপুর গমন, সাথী কালীপদ চক্রবর্তী। ওরা গাড়ীতে ওঠার একটু আগেই ক্রেগ বাথরুমে ঢোকে। রেল পুলিশের ইন্সপেক্টর তারিণী মুখার্জি ক্রেগের পাশের সিটে বসা। সাহেবদের মত গায়ের রঙ তারিণী মুখার্জির। ক্রেগ ভ্রমে ইন্সপেক্টর তারিণী মুখার্জিকে হত্যা। সেদিনই গ্রেপ্তার, বিচারে প্রাণদন্ড। ১৯৩১ সালের ৬ আগস্ট আলিপুর জেলে ফাঁসিতে আত্মবিসর্জন।



কল্পনা দত্ত

বোয়ালখালী থানার শ্রীপুর গ্রামে ১৯১০ সালে জন্ম। কলকাতার বেথুন কলেজে পড়ার সময় বিপ্লবী কর্মকান্ডে যুক্ত। ১৯৩০ সালের ২২ আগস্ট শ্রীপুর গ্রামের গুপ্ত ঘাঁটিতে মাস্টারদার সাথে সাক্ষাৎ। ১৯৩১ সালের ২ জুন ডিনামাইট ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ। ১৯৩৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারী গৈরলা ঘাঁটিতে পুলিশের সাথে সংঘর্ষ ও পলায়ন। আনোয়ারা থানার গহিরা গ্রামে আশ্রয়। ১৯মে সৈন্যবাহিনী কর্তৃক গহিরা আশ্রয় ঘাঁটি ঘেরাও, তারকেশ্বর দস্তিদারসহ গ্রেপ্তার। বিচারে দীপান্তর। মুক্তির পর কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগদান।

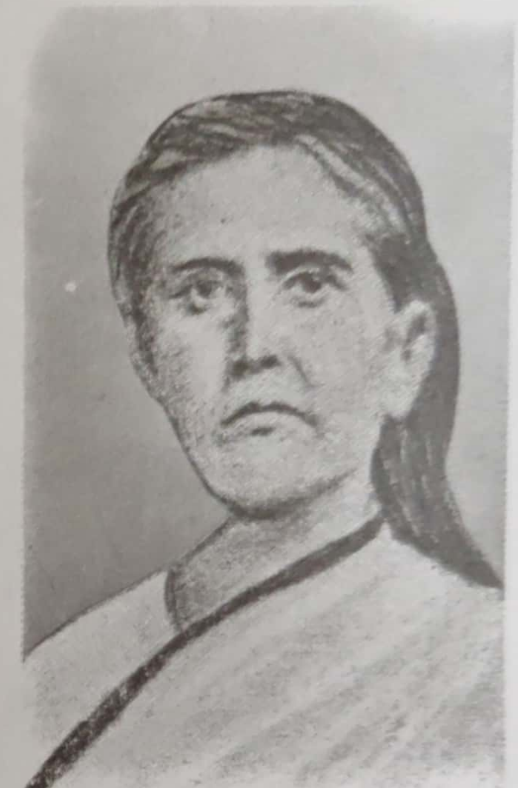


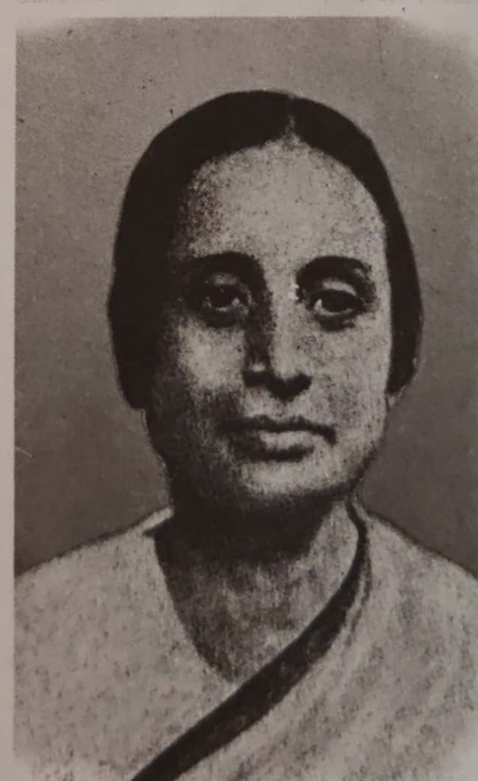
সাবিত্রী দেবী (১৮৭১-১৯৪০)

জন্ম পটিয়া থানার মটপাড়ায়। বিবাহ ধলঘাট গ্রামে। স্বামী বীরেশ্বর চক্রবর্তী। মেয়ে স্নেহলতা ও পুত্র রামকৃষ্ণকে নিয়ে বিধবা। বিপ্লবীদের আশ্রয়দাত্রী। তাঁর বাড়িটি ছিল বিপ্লবীদের গোপন ঘাঁটি। তাঁর বাড়িতেই ১৯৩২ সালের ঐতিহাসিক ধলঘাট যুদ্ধ হয়। সূর্য সেন ও নির্মল সেন প্রীতিলতার সাথে কথা বলছিলেন, তখনই ক্যাপটেন ক্যামরুণ বাড়িটি ঘিরে ফেলে। ভয়াবহ যুদ্ধে ক্যামরুণ নিহত, নির্মল সেন শহীদ। বিপ্লবীদের আশ্রয় দেয়ার অভিযোগে কিশোর পুত্র রামকৃষ্ণসহ তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিশোর রামকৃষ্ণ চক্রবর্তীর জীবনাবসান ব্রিটিশের কারাগারে। তিনি নিজেও কারা নির্যাতন ভোগ করেন চার বৎসর।

ইন্দুমতি সিংহ

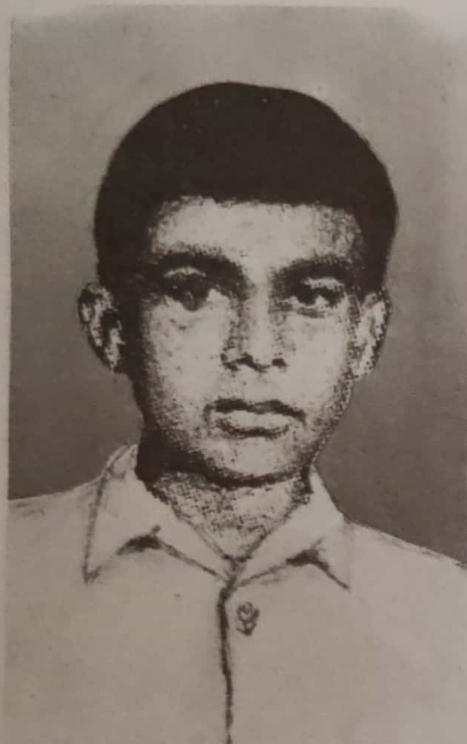
জন্ম চট্টগ্রাম। লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী গোলাপ সিংহের কন্যা। বিপ্লবী অনন্ত সিংহের বড় বোন। বিপ্লবী দলে যুক্ত। মাইন পোঁতার কাজে সুদক্ষা। ১৯৩০ সালের ২ জুন ডিনামাইট ষড়যন্ত্রে অন্যতম মহিলা বিপ্লবী। পুলিশি নির্যাতন সহ্য করেছেন বহুবার।





সুহাসিনী গাঙ্গুলি (পুটুদি)

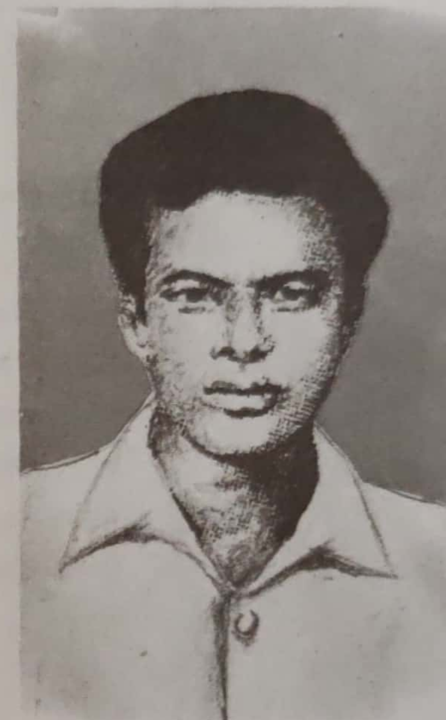
জন্ম কোলকাতায়। কোলকাতার কোন এক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। বিপ্লবীদলে যুক্ত। চট্টগ্রাম বিদ্রোহের পর গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, জীবন ঘোষাল, আনন্দ গুপ্ত ও লোকনাথ বল চন্দন নগরে আত্মগোপনে এলে সুহাসিনী গাঙ্গুলি চন্দননগর এসে কাশীশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়ে চাকরি নিয়ে গোন্দল পাড়ায় দোতলা বাড়ি ভাড়া করে বিপ্লবীদের আশ্রয় দেন।



রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী

(১৯১৭-১৯৩৩)

জন্মস্থান ধলঘাট। পিতা-বীরেশ্বর চক্রবর্তী, মাতা সাবিত্রী দেবী। তাঁদের বাড়িতে বিপ্লবীদের সাথে সৈন্যবাহিনীর ঐতিহাসিক ধলঘাট যুদ্ধ হয়। নিহত হয় ক্যাপ্টেন ক্যামরুণ। বিপ্লবীদের আশ্রয় দেয়ার অভিযোগে তাঁর মা সাবিত্রী দেবী ও তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। হিজলী বন্দী নিবাসে কর্তৃপক্ষের অবহেলা ও আমাশয় রোগাক্রান্ত হয়ে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করেন।



আনন্দ প্রসাদ গুপ্ত

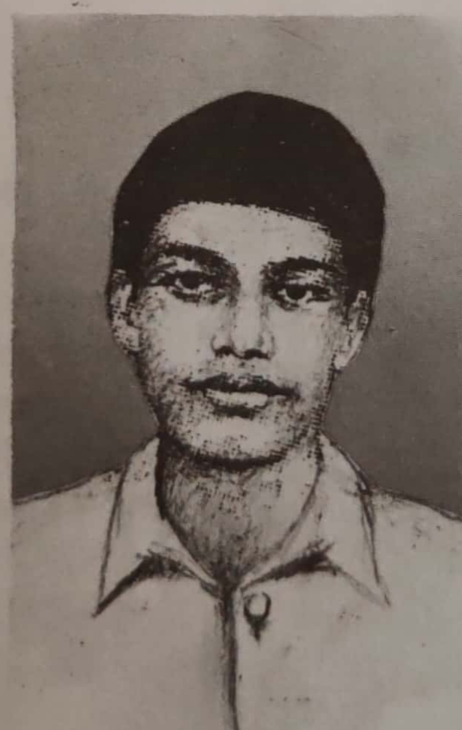
(১৯১৩-১৯৬৭)

জন্ম ও বাসস্থান চট্টগ্রাম প্যারেড ময়দান মোড়স্থ গুপ্তভবন। পিতা যোগেন্দ্র প্রসাদ গুপ্ত। দেবপ্রসাদ গুপ্তের ছোট ভাই। পুলিশ ব্যারাক দখলে অংশগ্রহণ। ফেনী সংঘর্ষে অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ ও মাখন ঘোষালের সাথে যুক্ত, গুলি করে পুলিশ হত্যা। কলকাতা হয়ে চন্দননগর আশ্রয় ঘাঁটিতে আত্মগোপন। সেখানে গ্রেপ্তার। অস্ত্রাগার লুন্ঠন মামলায় দ্বীপান্তর। ১৭ বৎসর কারাভোগ।

হিমাংশু সেন

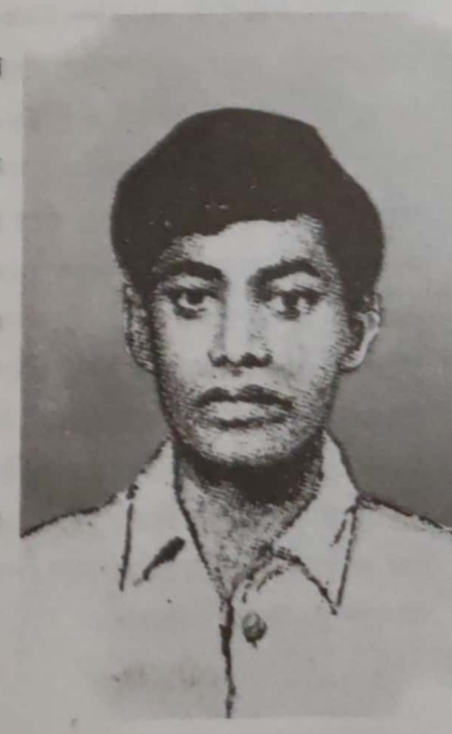
(১৯১১-১৯৩০)

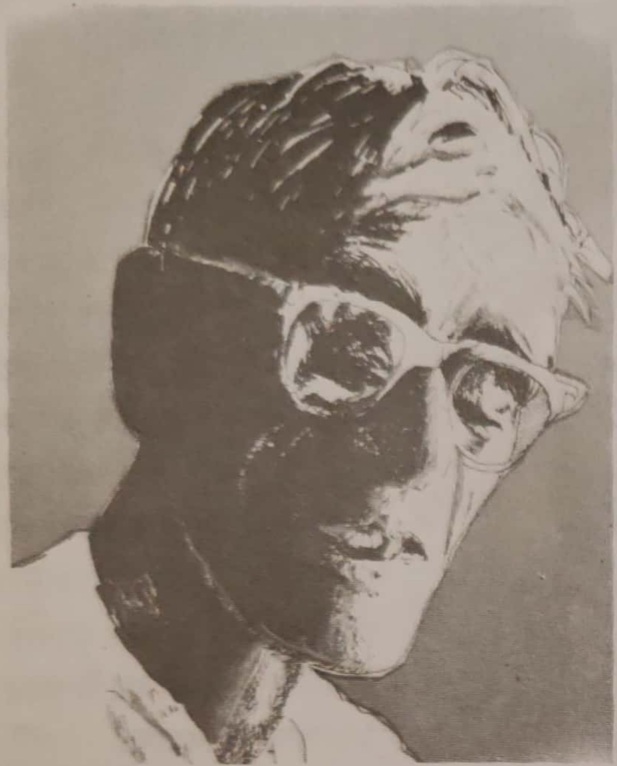
জন্ম চট্টগ্রামের সদরঘাট। পিতা জলধর সেন, মাতা বিনোদিনী দেবী। মাস্টারদার ছাত্র। অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালীন মাস্টারদার অনুরক্ত। পুলিশ ব্যারাক দখলের পর অস্ত্রাগারে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরাতে গিয়ে পুড়ে যান। মাস্টারদার নির্দেশে অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, মাখন ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্ত তাঁকে বাসায় রেখে যান। পোড়া ঘা বিষাক্ত হয়ে ৪ দিন পর মৃত্যুবরণ করেন।



প্রেমানন্দ দত্ত

জন্ম চট্টগ্রামের হরিশ চন্দ্র দত্ত লেনে। পিতা-হরিশ চন্দ্র দত্ত। ১৯২৭ সালে সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বিপ্লবী দলে যোগদান। বিপ্লবী অনন্ত সিংহের অন্তরঙ্গ বন্ধু। সাহসী যুবক। বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত গোয়েন্দা প্রফুল্ল রায় কলকাতা থেকে চট্টগ্রাম এসে বিপ্লবীদের ধরার জন্য তৎপর হয়ে উঠলে দলের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশে প্রেমানন্দ তাকে হত্যা করেন। দীর্ঘকাল কারাবাসে থেকে পাগল হয়ে কারাভ্যন্তরে মৃত্যুবরণ করেন।

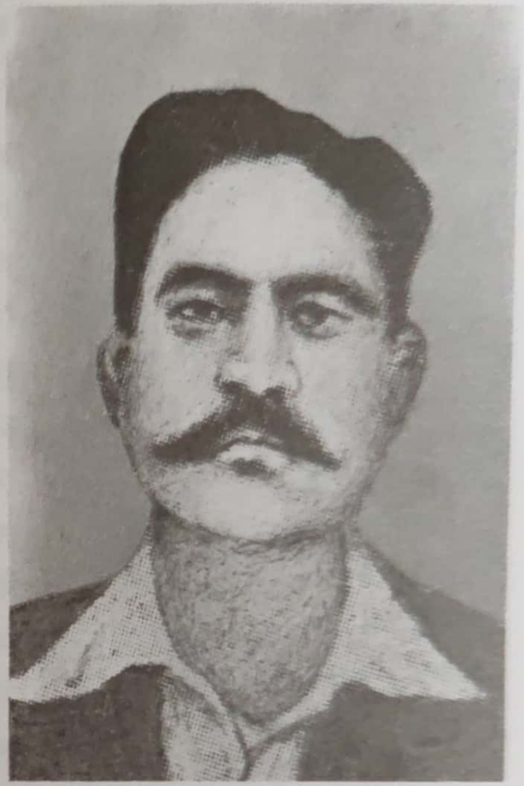




গিরিজাশঙ্কর চৌধুরী

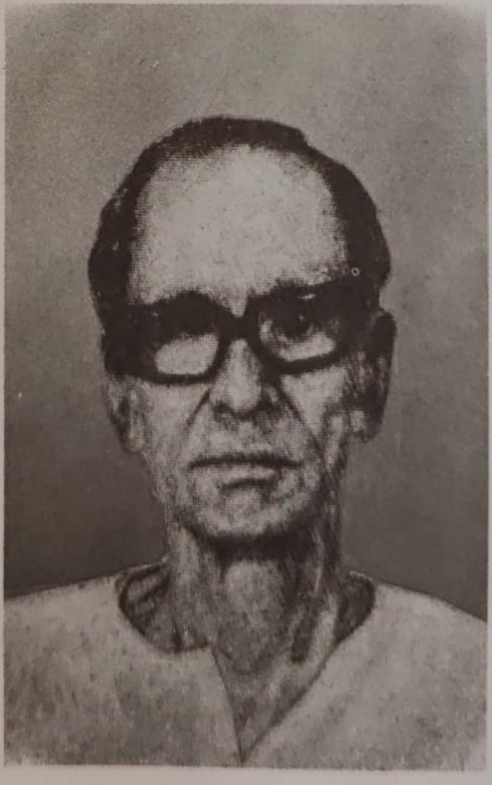
(১৮৯১-১৯৩৯)

পিতা নীলরতন চৌধুরী, মাতা সিদ্ধেশ্বরী চৌধুরী। সাতকানিয়া থানার আমিলাইস গ্রামে জন্ম। ছোটবেলা থেকেই দুঃসাহসী, ছুরি. লাঠি ও বক্সিং খেলায় পারদর্শী। চারু বিকাশ দত্তের সহকর্মী। অনুশীলনদলের নেতা। ১০ বৎসর কারাদন্ড ভোগ।



কালীপদ চক্রবর্তী (১৯১০-১৯৯০)

বোয়ালখালী থানার পোপাদিয়া গ্রামে জন্ম। পিতা শ্যামাচরণ স্মৃতিতীর্থ। ১৮ বৎসর বয়সে মাস্টারদার সাথে সাক্ষাৎ। মাস্টারদার আকর্ষণী শক্তি তাঁকে বিপ্লবী করে তোলে। দলের সংগৃহীত অস্ত্রশস্ত্র গোপন স্থানে রাখার দায়িত্বে নিয়োজিত। টেলিফোন ভবন আক্রমণ ও জালালাবাদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ। ১৯৩০ সালের ১ ডিসেম্বর চাঁদপুরে রেলগাড়ীতে পুলিশ অফিসার তারিণী মুখার্জি হত্যার অপরাধে দীপান্তর। ১৯৪৬-এ মুক্তির পর কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগদান। পাকিস্তান আমলে ১২ বৎসর কারাবাস।



বিনোদ বিহারী দত্ত (পরিদা)

১৯০৮ সালে পটিয়া থানার মটপাড়া গ্রামে জন্ম। পিতা দীনবন্ধু দত্ত। বিপ্লবী দলের সংগঠক। মাস্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসির পর দলের নেতা। আত্মগোপনে থেকে অভিযান পরিচালনা। ১৯৪১ সালে ধৃত, ৭ বৎসর কারাভোগ।



হরিপদ মহাজন

(১৯১৩-১৯৪০)

জন্মস্থান রাউজান থানার বীনাজুরী গ্রাম। অস্ত্রাগার দখল ও জালালাবাদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ। বার্মায় গিয়ে আত্মগোপন ও দুর্ঘটনায় মৃত্যু।



দীপ্তিমেধা চৌধুরী

জন্ম বোয়ালখালী থানার শাকপুরা। ১৯২৮ সালের শেষভাগে বিপ্লবীদলে যোগদান। ১৯৩০ সালের অভ্যুত্থানে পুলিশ ব্যারাক দখল ও জালালাবাদ যুদ্ধের সৈনিক।

লালমোহন সেন

(১৯১৪-১৯৪৬)

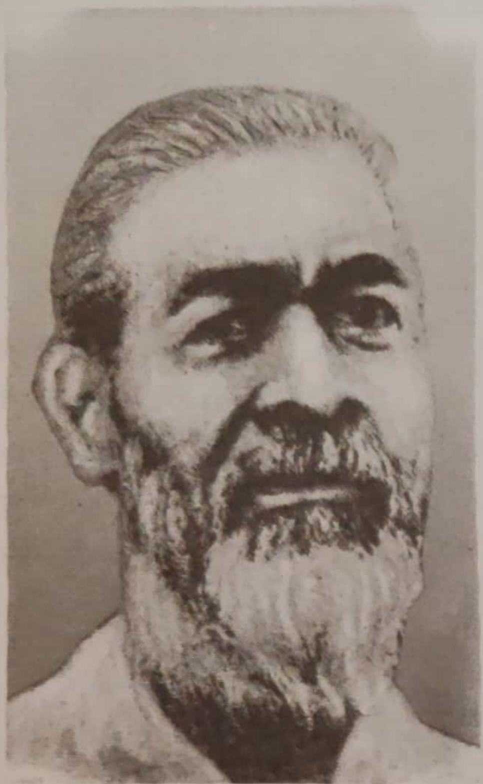
জন্মস্থান সন্দ্বীপের মনসুরপুর। ১৯২৯ সালে বিপ্লবীদলে যোগদান। ১৯৩০ এর অভ্যুত্থানে রেল লাইন উৎপাটনে অংশগ্রহণ। পরবর্তীতে আততায়ীর গুলিতে নিহত।



নারায়ণ সেন

জন্মস্থান ঢাকা। চট্টগ্রামে বাসস্থান দেওয়ান বাজার ঈশ্বর নন্দী লেন। ১৯৩০ এর অভ্যুত্থানে পুলিশ ব্যারাক দখল ও জালালাবাদ যুদ্ধের সৈনিক। পরবর্তী সময়ে শিক্ষকতা।

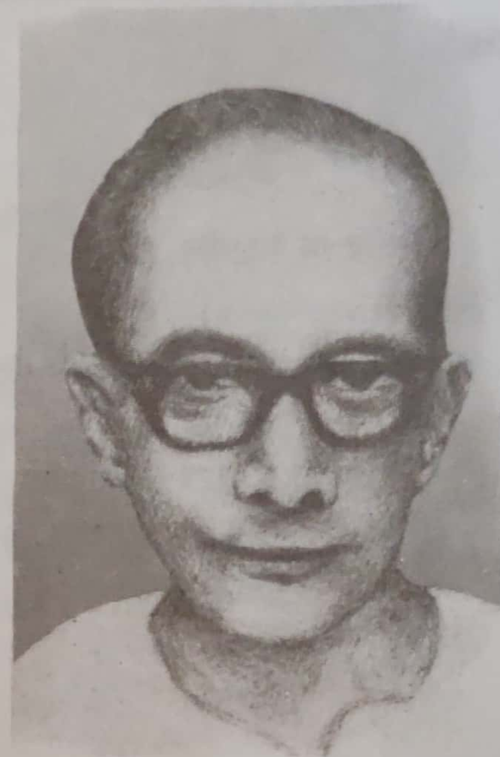




মৌলভী মীর আহমদ

(১৯১৫-১৯৭৩)

বোয়ালখালী থানার পোপাদিয়া গ্রামে জন্ম। ছাত্রজীবনেই মাস্টারদার বিপ্লবী দলে যোগদান। বিপ্লবী দলের ক্রিয়াকান্ডে অংশগ্রহণ। ১৯৩৩ সালে গ্রেপ্তার, ১৯৩৮ সালে মুক্তি পেয়ে কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগদান। ১৯৪৭ সালে হুলিয়ায় কোলকাতায় পলাতক জীবন। ১৯৭৩ সালে সেখানকার টিবি হাসপাতালে এন্তেকাল।



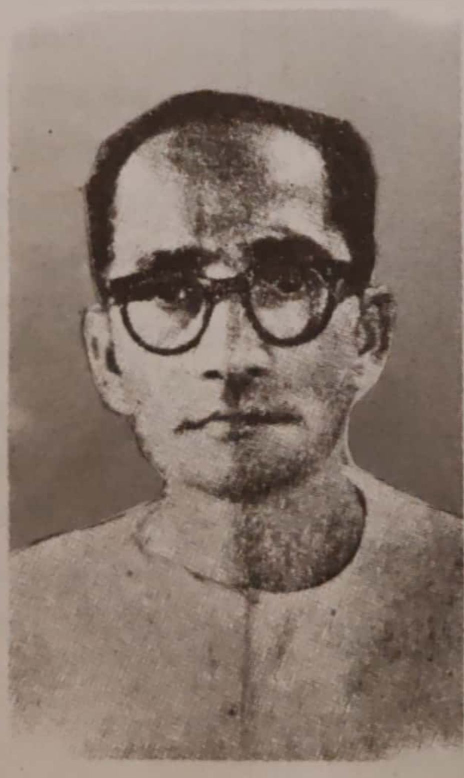
সুবোধ রায়

রাউজান থানার নয়াপাড়া গ্রামে ১৯১৩ সালে জন্ম। পিতা জমিদার রসিকচন্দ্র রায়, মাতা সরযু দেবী। ১৯২৯ সালে মাস্টারদার সংস্পর্শে এসে বিপ্লবে যুক্ত। দামপাড়া পুলিশ ব্যারাক দখল ও জালালাবাদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ। অস্ত্রাগার লুন্ঠন মামলায় দীপান্তর। মুক্তির পর কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগদান।

পূর্ণেন্দু দস্তিদার

((১৯১৬-১৯৭১)

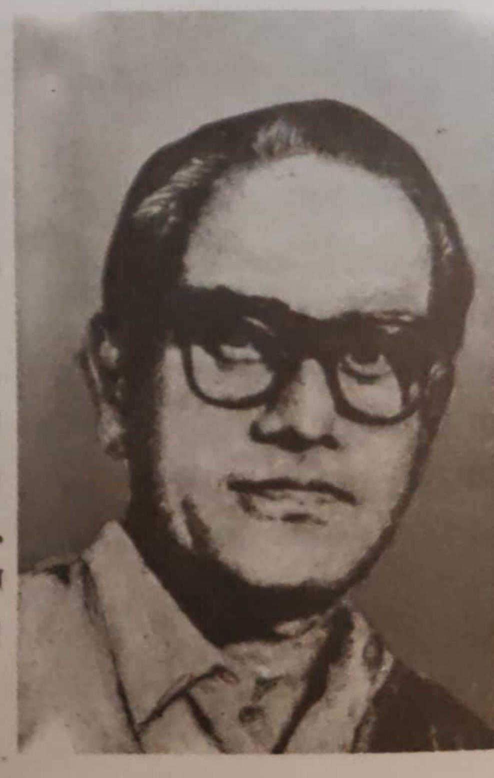
জন্ম পটিয়া থানার ধলঘাট গ্রামে। ১৯৩২ সাল থেকেই বিপ্লবী দলের কর্মী। পরবর্তীতে আইনজীবী। জেল থেকেই আইন পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেন। বহুবার জেলে যান। ৩৬ বৎসর জেল খেটেছেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে মৃত্যুবরণ।

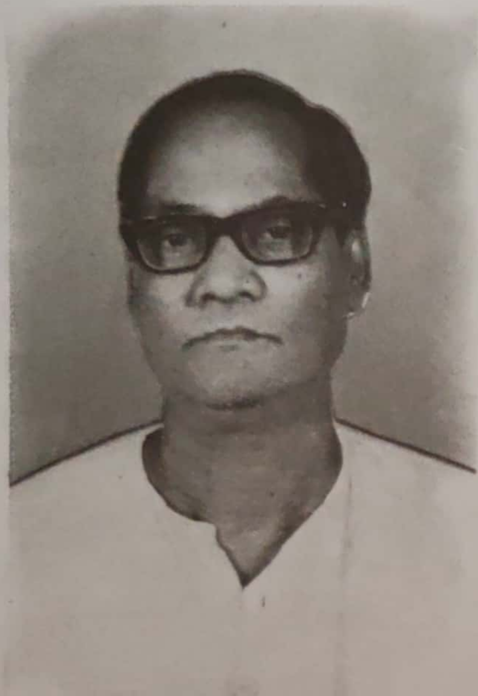


আবদুস সাত্তার

(১৯১৭-১৯৭৯)

চট্টগ্রামের রাউজানে জন্ম। ছাত্রজীবন থেকেই বিপ্লবী। মৌলভী মীর আহম্মদের অন্যতম সহযোগী। ১৯৩৪ সালে গ্রেপ্তার, ১৯৩৮ সালে মুক্তি পেয়ে কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগদান। কৃষক সমিতির আজীবন নেতা, কমরেড। আত্মগোপনে কাটান অনেক বৎসর। সড়ক দুর্ঘটনায় এন্তেকাল।

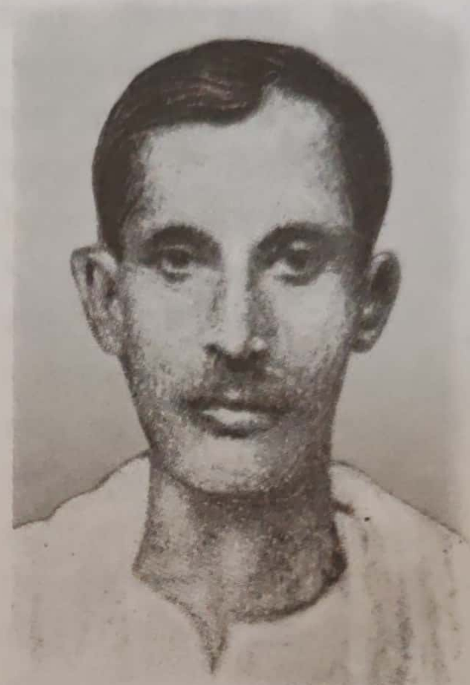




সুধাংশু বোস

(১৯১৩-১৯৮৮)

আনোয়ারা থানার পড়ৈকোড়া গ্রামে ১৯১৩ সালে জন্ম। ১৯৩০ এর অভ্যুত্থানে অস্ত্রাগার দখল ও জালালাবাদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ। ১৫ বৎসর পলাতক জীবন বার্মায়। ১৯৪৬ সালে চট্টগ্রাম ফিরে এলে গ্রেপ্তার। ১৯৪৭ সালের এপ্রিলে মুক্তি।



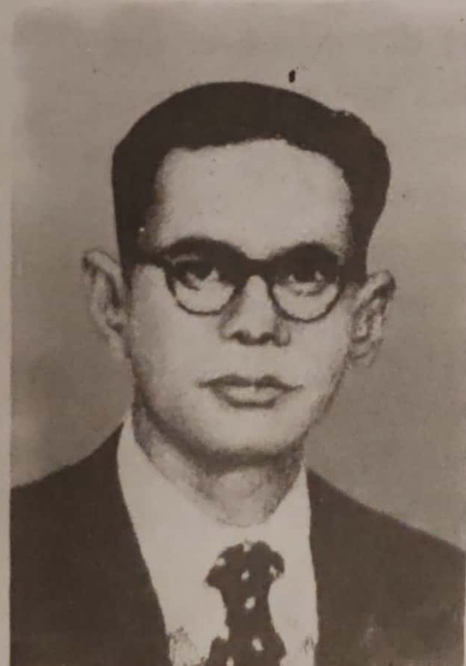
মহেন্দ্রলাল বিশ্বাস (কাকাবাবু)

জন্ম বোয়ালখালী থানার কধুরখীল গ্রাম। বিপ্লবীদের আশ্রয় ও অর্থ সাহায্য দিতেন। মাষ্টারদা সূর্যসেনের আদর্শে বিশ্বাসী। বিপ্লবীদের আশ্রয়দান ও অর্থ সাহায্যের অভিযোগে দীর্ঘকাল কারাভোগ করেন। ১৯৩৬ সালে কারাগারে অনশনে আত্ম-বিসর্জন দেন।

কালিকিঙ্কর দে

(১৯১০-১৯৮৮)

জন্মস্থান ডবলমুরিং থানার গোসাইলডাঙ্গা। পিতা দীনবন্ধু দে। ১৯৩০ সালে মাস্টারদার নেতৃত্বে পুলিশ ব্যারাক দখল ও জালালাবাদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ। দীর্ঘকাল আত্মগোপনে থাকেন। ৭৮ বৎসর বয়সে কোলকাতায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ।



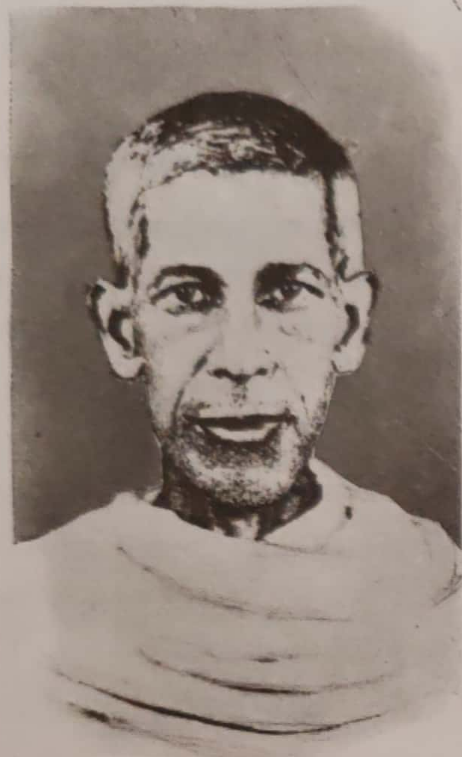
যতীন্দ্র মোহন রক্ষিত

(১৯০৪-১৯৬৯)

জন্মস্থান কানুনগোপাড়া, বোয়ালখালী। ১৯২৬ সাল থেকেই বিপ্লবী সংগঠনে যুক্ত। বিপ্লবী দলের সংগঠক। ১৯৩১ সালে জেলে যান, মুক্তি পান ১৯৩৮ সালে। পরবর্তীতে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

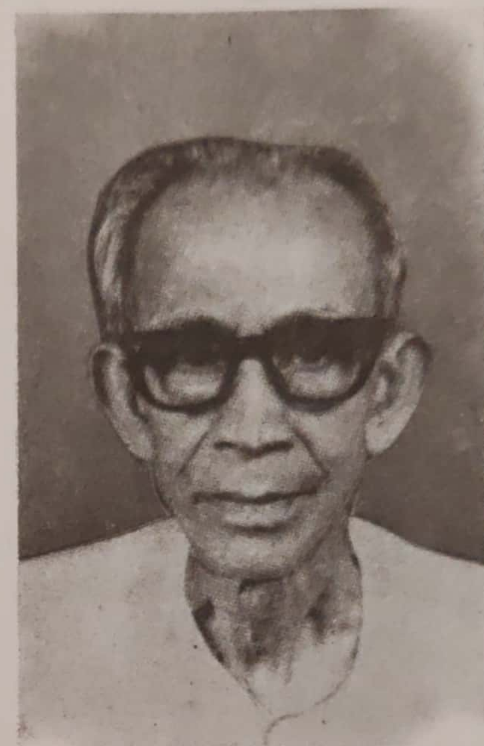


নেপাল দস্তিদার



জন্ম বোয়ালখালী থানার সারোয়াতলী গ্রামে ১৯১৮ সালে। পিতা বেনীমাধব দস্তিদার, মাতা কুসুম কুমারী দস্তিদার। কিশোর বয়সে মাস্টারদার সংস্পর্শে আসেন। মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে ১৯৩৩ সালে গ্রেপ্তার হন। অস্ত্র আইনে দণ্ডিত হয়ে কারাভোগ করেন ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত। জেল থেকে মেট্রিক, বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে আই,এ, বরিশালের বি, এম কলেজ থেকে বি,এ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এ ডিগ্রী লাভ করেন। ১০ বৎসরের অধিক সময় কারাভোগ করেন।

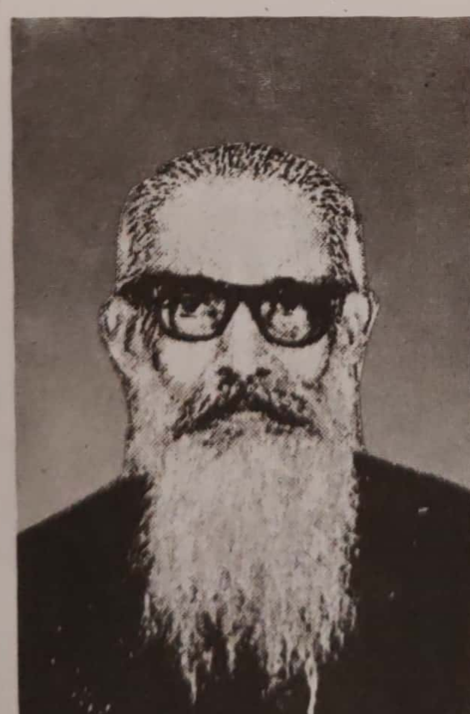
বিনোদ বিহারী চৌধুরী



১৯১১ সালে বোয়ালখালী থানার উত্তরভূর্ষি গ্রামে জন্ম। ১৯২৯ সাল থেকেই মাস্টারদার বিপ্লবীদলভুক্ত। ১৯৩০ সালের ঐতিহাসিক সশস্ত্র অভ্যুত্থানে দামপাড়া পুলিশ অস্ত্রাগার দখল ও জালালাবাদ যুদ্ধের সৈনিক। যুদ্ধে ভয়ানকভাবে আহত। তিন বছর আত্মগোপন। ১৯৩৩ সালে গ্রেপ্তার, ১০ বছর কারাভোগ।

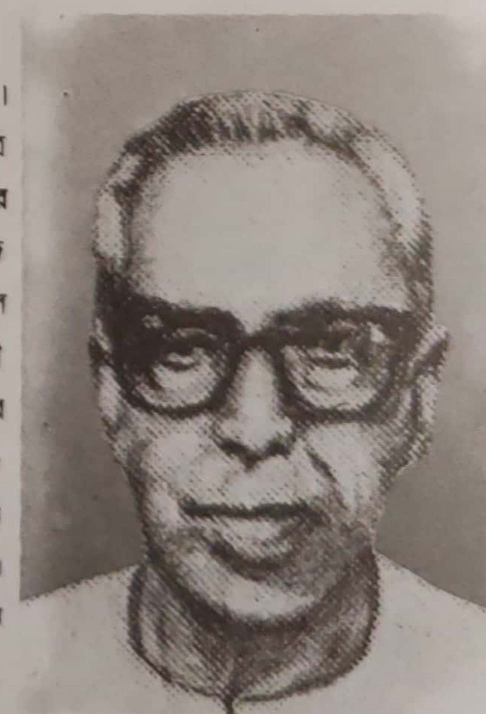
অনঙ্গ সেন

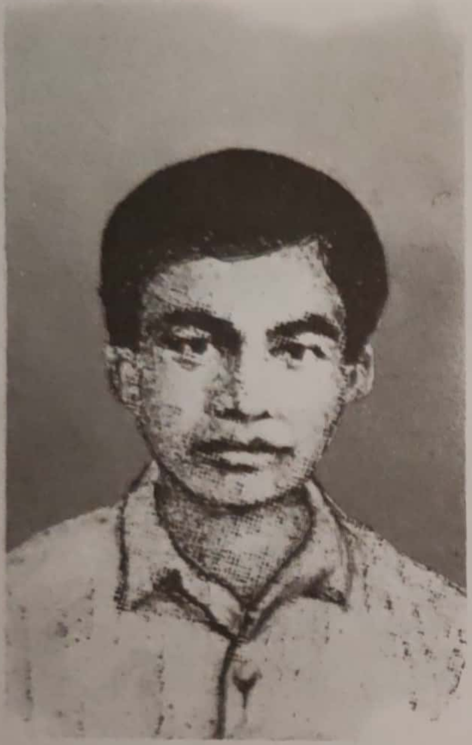
জন্ম ১৯১৪ সালে। চট্টগ্রামের দেওয়ানজী পুকুর পাড়ে বাসস্থান। ১৯২৮ সালে মাস্টারদা কংগ্রেস দলের সম্পাদক থাকাকালীন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কর্মী হিসেবে যোগদান। বিপ্লবীদলের প্রচারপত্র বিতরণের দায়িত্ব পালন। অস্ত্র লুকিয়ে রাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত। ১৯৩২ এর জুনে প্রথম গ্রেপ্তার, মেট্রিক পরীক্ষা দেয়ার পর নভেম্বরে আবার গ্রেপ্তার। ১৯৩৮ সালে মুক্তি। বর্তমানে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য।



পুলিন দে

জন্ম পটিয়া থানার ধলঘাট গ্রামে। ১৯২৯ সালে ধলঘাট স্কুলের ছাত্র থাকাকালীন সময়ে বিপ্লবী দলের ক্রিয়াকান্ডে আগ্রহ। জালালাবাদ যুদ্ধের পর মাস্টারদা ধলঘাট এলে তাঁর সংস্পর্শে আসা এবং বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত। ক্যামরুণ হত্যার পর ১৯৩২ এ গ্রেপ্তার। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম, হিজলী ও বক্সার জেলে কারাবাস। সোস্যালিষ্ট পার্টিতে যোগদান এবং বিভিন্ন সময়ে গ্রেপ্তার. ১৯৪৫ পর্যন্ত কারাজীবন।

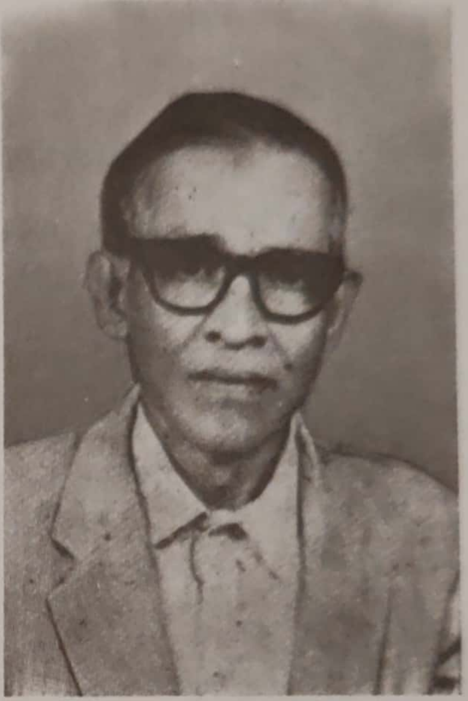




রোহিণী বড়ুয়া

(১৯১১-১৯৩৫)

জন্ম চট্টগ্রাম। ১৯২৮ সালে নয়াপাড়া গ্রামের প্রবীণ বড়ুয়ার প্রভাবে বিপ্লবীদলে যোগদান। গোয়ালন্দ থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার আরশাদ আলী অমানুষিক নির্যাতন চালাচ্ছিল এলাকার যুবক ও ছাত্রদের উপর। রোহিণী বড়ুয়া ঐ এলাকায় অন্তরীণে ছিলেন। ১৯৩৫ সালের ১৫ জুন তিনি আরশাদ আলীকে হত্যা করেন। ১৮ ডিসেম্বর ফরিদপুর জেলে ফাঁসিতে আত্মাহুতি দেন।



সুবোধ বল

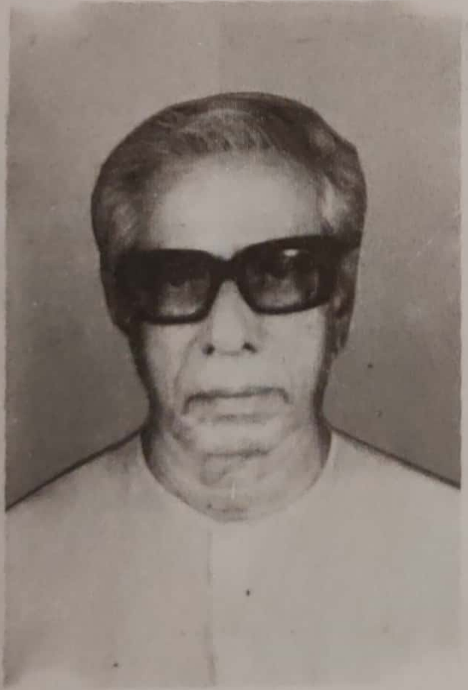
(১৯১৩-১৯৮৫)

জন্মস্থান বোয়ালখালীর কানুনগোপাড়া গ্রাম। দামপাড়া পুলিশ ব্যারাক দখল ও জালালাবাদ যুদ্ধের সৈনিক। দীর্ঘদিন আত্মগোপন কোয়েপাড়ায়। পরে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়। বিচারে দীর্ঘদিন কারাদণ্ড ভোগ করেন।

তেজেন্দ্র নারায়ণ দাশ

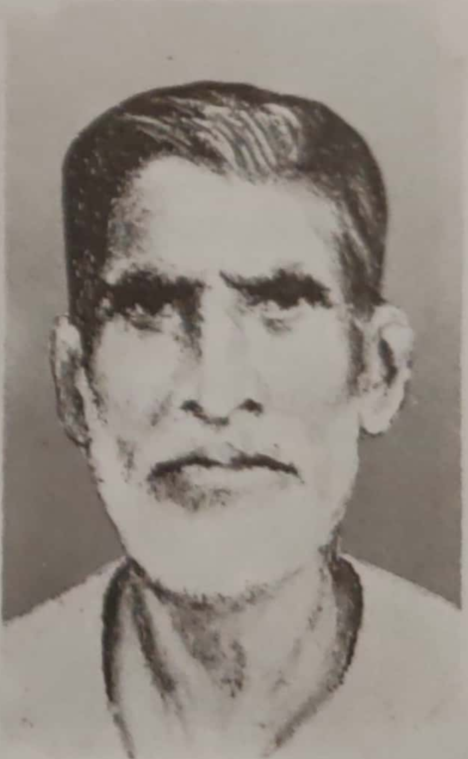
(নারায়ণ সিং)

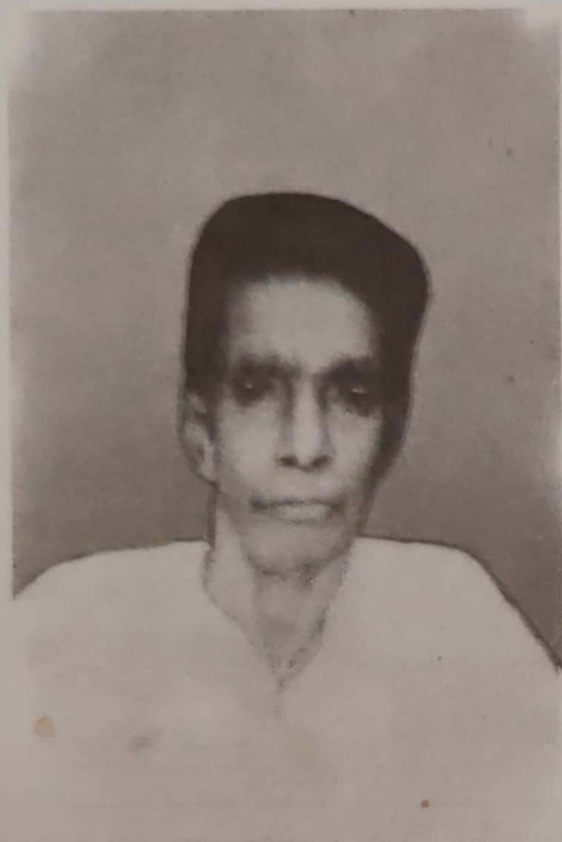
পটিয়া থানার মহিরা গ্রামে জন্ম ১৯১২ সালে। পিতা অপর্ণাচরণ দাশ, মাতা কালীতারা দাশ। ১৯২৭ সাল থেকে বিপ্লবী ক্রিয়াকান্ডে যুক্ত। আহসানউল্লা হত্যার পর পলাতক জীবন বার্মায়। বার্মার গভর্নর হত্যা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার, বিচারে মুক্তি।



কামাল উদ্দিন খাঁ

বোয়ালখালী থানার করলডাঙ্গায় জন্ম। ১৫ বছর বয়স থেকেই ব্যায়ামাগারে শরীর চর্চা। করলডাঙ্গা পাহাড়ে বিপ্লবীদের গোপন ঘাঁটি গড়ে উঠলে তাতে যোগদান। ১৯৩২ সালে মাষ্টারদার সংস্পর্শ। ১৯৩৯ সালে গ্রেপ্তার, মুক্তি ১৯৪২ সালে। পরবর্তীতে কমিউনিষ্ট কর্মী।



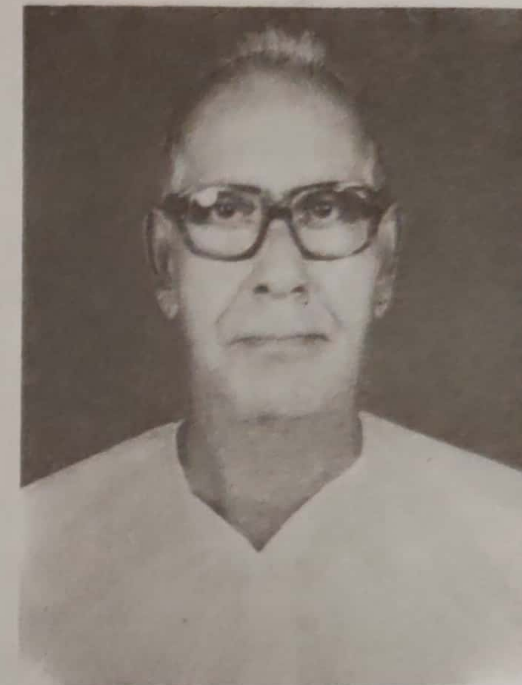


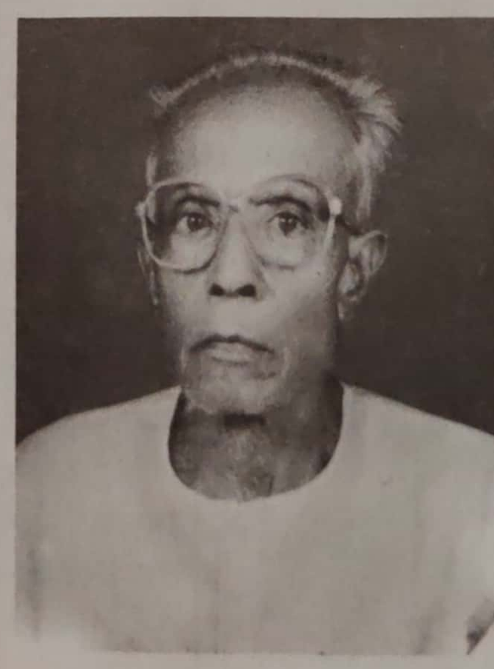
হরিপদ চৌধুরী

১৯১৬ সালে বোয়ালখালী থানার কধুরখীল গ্রামে জন্ম। পিতা সাঁচিরাম চৌধুরী মোক্তার। বিপ্লবী দলে যোগ দেন ১৯২৯ সালে। ১৯৩৪ সালের ৫ জানুয়ারী পল্টন ক্রিকেট খেলার মাঠ আক্রমণে অংশ গ্রহণ। এ আক্রমণে পুলিশ প্রধান ক্লিয়ারী নিহত। গ্রেপ্তার ১৯৩৬, মুক্তি ১৯৩৮ সালে।

বিমল বিশ্বাস

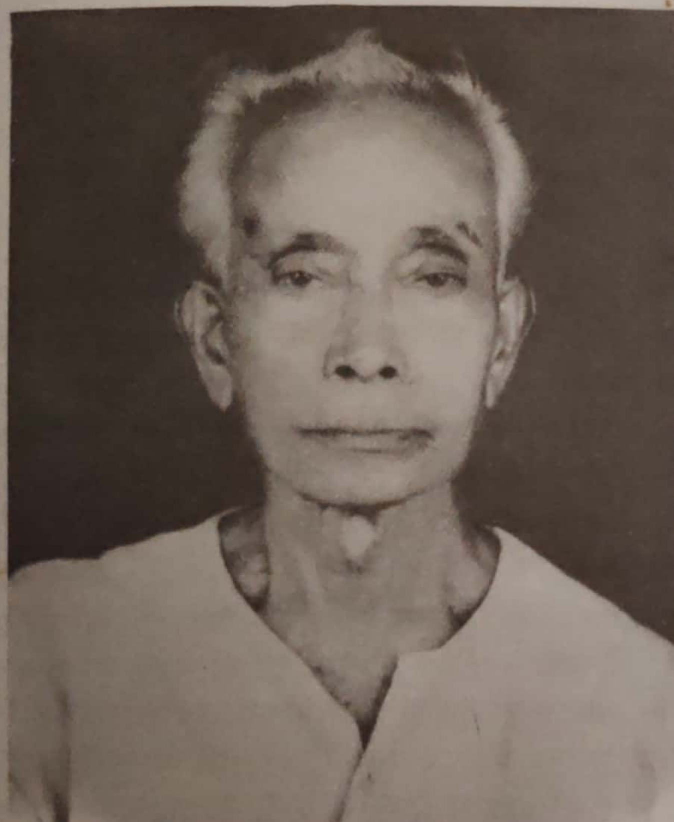
জন্ম ১৯১৭ সালে, বোয়ালখালী থানার কধুরখীলে। পিতা মহেন্দ্র বিশ্বাস, মাতা জানকী সুন্দরী। তাঁদের বাড়ি ছিল বিপ্লবীদের ঘাঁটি ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। পুলিশ এই ঘাঁটি আক্রমণ করে তাঁর পিতা ও তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তাঁর পিতা জেলে অনশন করে ১৯৩৬ সালে প্রাণ ত্যাগ করেন। এক বছর পর মুক্তি পান তিনি।





অমূল আচার্য্য

জন্ম ১৯১৮, বোয়ালখালী থানার পোপাদিয়া গ্রামে। পিতা নগেন্দ্র আচার্য্য, মাতা সরলা দেবী। বিপ্লবী নির্মল লালার সংস্পর্শে বিপ্লবীদলে যুক্ত হন ১৯২৯ সালে। ১৯৩১ সালে জ্যৈষ্ঠপুরা ঘাঁটিতে মাস্টারদার সাথে সাক্ষাৎ। বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িত থেকে ১৯৩৫ সালে গ্রেপ্তার ও ১৯৪৫ সালে মুক্তি।



নীরেন্দ্র লাল বড়ুয়া (চৌধুরী)

১৯১৪ সালে সীতাকুণ্ডের পান্থশালা গ্রামে জন্ম। পিতা রামদাস চৌধুরী, মাতা প্রসন্নময়ী। ১৯২৬ সাল থেকেই বিপ্লবীদলের সদস্য। লর্ড এণ্ডারসন শাসনামলে প্রথম কারাবরণ। ৪ মাস পর মুক্তি। কিছুদিন পর মিথ্যা মামলায় শাস্তি ও দীপান্তর। পরে আলীপুর সেন্ট্রাল জেল। আন্দামান থাকাকালীন কমিউনিস্ট পার্টিতে যুক্ত।

হেমেন্দু দস্তিদার (১৯১৫–১৯৭৫)

পটিয়া থানার ধলঘাট গ্রামে জন্ম। পিতা চন্দ্রকুমার দস্তিদার। ১৯৩০ সালের সশস্ত্র অভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণ। অস্ত্রাগার দখল ও জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশবাহিনীর বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত হন। তিনি জালালবাদ যুদ্ধে শহীদ অর্ধেন্দু দস্তিদারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। অভ্যুত্থানের সময় তাঁর বয়স ছিল পনর বৎসর।



বিজয়া

সূর্যসেন

তোমায় ঠাকুর বলব নিঠুর
কোন মুখে?

শাসন তোমার যতই গুরু
ততই টেনে লও বুকে।

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে
এ জীবন পূর্ণ কর দহন দানে।

আমার এ ক্ষুদ্র জীবনে কত বিজয়াই তো এসে গেছে! কিন্তু আজকের বিজয়া আর অন্য বিজয়ার মধ্যে কত তফাৎ- এবারকার বিজয়া যেন সব চেয়ে বেশী মূল্যবান! জীবনে যা দেখি নি, জীবনে যা পাই নি,জীবনে যা শিখিনি এমন কত অভিনব জিনিষ নিয়েই বিজয়া এলো আজ আমার কাছে! কত নূতন অভিজ্ঞতাই সে নিয়ে এলো! গত দু'মাস যেন আমার জীবনের অভিনব অভূতপূর্ব্ব অধ্যায়। এই দু'মাসের অভিজ্ঞতা অনুভুতি, আনন্দ, বিষাদ, জ্বালা আমার জীবনে খুব বড় সঞ্চয়ই হয়ে রইল। আজ বিজয়ার দিনে মার কাছে প্রার্থনা করছি যেন এই অমূল্য সঞ্চয়টুকু আমার জীবনকে ঐশ্বর্য্যময় করে তোলে। এই দু'মাসের সব কিছুর মধ্যে আনন্দই সবচেয়ে ছাপিয়ে উঠেছে। এত আনন্দ জীবনে যে পাই নি, বিষাদ আর জ্বালা আনন্দকে আরও মধুর করে তুলেছে। আমার দুর্ভাগ্য-একান্ত দুর্ভাগ্য যে এমন প্রাণমাতান আনন্দের মধুর স্মৃতিই আজ আমায় অহরহ ব্যথা দিচ্ছে। আমরা দুর্ব্বল মানব- আমাদের কাছে এত সুন্দর আনন্দটুকুর চেয়ে এমন আনন্দের ঢেউ খেলিয়ে গেল যে, তাকে হারাবার ব্যথাই বড় হয়ে উঠল।

আড়াই বৎসরের মধ্যে তিনটি বিজয়া এলো, এর মধ্যে কত অন্তরঙ্গ বন্ধু, কত আদরের ভাই বোনের জীবনের বিজয়াই চোখে দেখলাম- আর পূর্ণ দায়িত্বই ঘাড়ে নিলাম- আজ একে একে সব কথা মনে পড়ছে। আজ মনে পড়ছে, কত সুন্দর অমূল্য রত্নরাজি দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবনের সুখ, সম্পদ, ঐশ্বর্য্য সব তুচ্ছ করে হাসতে হাসতে মাতৃযজ্ঞে নিজেদের আহুতি দিয়ে চলে গেছে, একটু দ্বিধা করে নি, একটু সঙ্কোচ করে নি, আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে স্বেচ্ছায় মরণের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আর এমন পবিত্র দিনে তাদের কথা মনে করে আমার মত কঠিন হৃদয়ের চোখেও জল আসছে- তাদের বীরত্বের কাহিনী মনে পড়ে আমার গৌরবে বুক ফুলে উঠছে। নরেশ,বিধু, টেগরা, ত্রিপুরা, মধু, অর্দ্ধেন্দু, প্রভাস, নির্ম্মল, পূলিন, মতি, শশাঙ্ক, জিতেন, আন্দু,অমরেন্দ্র, মনা, রজত, দেবু, স্বদেশ, মাখন, রামকৃষ্ণ, নির্ম্মল, ভোলা সবারই কথা আজ একে একে মনে পড়ছে। আর স্মৃতির মধ্যে দিয়ে তাদের বিজয়ার সম্ভাষণ জানাচ্ছি। কত জীবনের বিজয়ার নিমিত্তই হলাম- কত স্নেহময়ী জননীর বুক শূন্য করে তাঁর সোনার পুতলিকে স্বাধীনতার বেদীমূলে আহুতি দিয়েছি- কতজনকে অন্তরীণে, কারাগারে, নির্ব্বাসনে, দ্বীপান্তরে পাঠিয়েছি, ঘরে ঘরে হাহাকারের সৃষ্টি করেছি- দেশের উপর গভর্ণমেন্টের অত্যাচার নির্যাতন টেনে এনেছি। এসবের দায়িত্ব থেকে নিজেকে বাদ দেই কি করে!

মা, আন্দনময়ি, মা আমার, আজ তোমার বিসর্জ্জনের দিনে তোমায় একান্ত ব্যাকুল হয়েই জিজ্ঞাসা করছি- আমি কি অন্যায় করে যাচ্ছি? পনর বৎসর আগে অনেক ভেবে চিন্তে, ভাল মন্দ বিচার করে জীবনের যে লক্ষ্য, যে আদর্শ গ্রহণ করেছিলাম আজও তাই আঁকড়ে ধরে আছি। দুর্ব্বলতা কি আসতে চায়নি? কত রকমের দুর্ব্বলতা আসতে চেয়েছে, কিন্তু তবুও নিজের লক্ষ্যটিকে তো ছাড়িনি। আজও মনে হচ্ছে, খুব নিঃসন্দেহেই মনে হচ্ছে, আমি যে পথে চলেছি দেশের অনেক লোক ভুল বুঝলেও সেই পথটাই ঠিক। এ বিশ্বাস এখনও আমার অটুট আছে যে, আমি অন্যায় করছি না,পাপ করছি না, দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতে গেলে আমার দেশে যে হাহাকার, অত্যাচারের সৃষ্টি হয়েছে, এর চেয়ে আরও অনেক বেশীই- সব দেশেই তাই হয়েছে। আমার আদর্শের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখেই আমার পথেই আমি চলেছি- এখনও কোন দ্বিধা আসে নি। মা তোমায় মিনতি জানাচ্ছি, যদি আমার ভুল হয়, আমার ভুল ভেঙ্গে দিও,আর যদি ঠিক পথেই আমি চলে থাকি তা হলে আমার বিশ্বাসকে আরও শক্ত করে দাও, আমাকে আরও শক্তিমান করে দাও-আমার মধ্যে যেন কোন রকমের দুর্ব্বলতা না আসে, আমি যেন আমার পথ থেকে কোন দিন এক চুলও না সরি। আমি যেন বড় নিঠুর ছিলাম,কিন্তু গত দু'মাসের পথচলা যেন আমার নিঠুর হৃদয়ের মধ্যে মমতা এনে দিয়েছে, কারুণ্যের সৃষ্টি করেছে; তাই অতি আদরের ছেলে মেয়ে, ভাইবোনকে হারিয়ে তাদের যে সব আত্মীয়স্বজন আজ বিজয়ার দিনে চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছেন ,তাঁদের কথা মনে করে আমার মনে আজ ভীষণ লাগছে। হয়ত তাঁরা আমাকে তাঁদের বুকের ধন হারাবার নিমিত্ত মনে করে আমায় অভিশাপ দিচ্ছেন- সেজন্য আমি চিন্তা করছিনা, কিন্তু তাঁদের বুকভাঙ্গা ক্রন্দন, মর্মভেদী হাহাকার যে আমার বুকে ভীষণ বাজছে! আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কত স্নেহময়ী জননী তাঁর আদরের সন্তানকে হারিয়ে কি মর্ম্মান্তিক কান্নাই কাঁদছেন! কি অসহ্য বেদনায় তাঁর হৃদয় অস্থির হয়ে উঠছে-বিজয়ার এমন আনন্দের দিনটি তাঁর কাছে কত যন্ত্রণাদায়ক হয়েছে! বাপ তাঁর আদরের দুলালকে হারিয়ে বিজয়ার দিনে সমস্ত উৎসবকে বিষাদময় করে তুলেছেন! ভাইবোন তাদের স্নেহের ভাইবোনকে হারিয়ে আজ কত অসহনীয় যাতনাই ভোগ করছে! কত বড়

অভাববোধ তাঁদের হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করেছে! এসব ভেবে আমার মত পাষাণও আজ গলে যাচ্ছে! আবার তোমায় জিজ্ঞাসা করছি মা, আমি কি অন্যায় করে যাচ্ছি? এত মায়ের চেখের জল, এত বাপের বুকফাটা কান্না,এত ভাইবোনদের হৃদয়ভেদী দীর্ঘশ্বাস , এ সবের কারণ হয়েছি বলেই আমি কি অন্যায় করছি? যদি তাই হয়,তুমি আমার ভুল ভেঙ্গে দিও, আমায় ঠিক পথে চালিও। কিন্তু আমার মনে হয় ,আমি ঠিক পথে চলেছি। তাই চারিদিকে শ্মশান সৃষ্টি হচ্ছে দেখে মনে ব্যথা পেয়েও আমি লক্ষ্যটিকে বুকে চেপে ধরে আছি- এই আশায় যে এ সকল পবিত্র শ্মশান-স্তুপের উপরে একদিন স্বাধীনতার সৌধ নির্মিত হবে।

পনের দিন আগে যে নিখুঁত পবিত্র, সুন্দর প্রতিমাটিকে এক হাতে আয়ুধ অন্যহাতে অমৃত দিয়ে বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছিলাম, তার কথাই আজ সবচেয়ে বেশী মনে পড়ছে। তার স্মৃতি আজ সবকে ছাপিয়ে উঠেছে। যাকে নিজ হাতে বীর সাজে সাজিয়ে সমরাঙ্গনে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, নিশ্চিত মৃত্যুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুমতি দিয়ে এসেছিলাম, তার স্মৃতি যে আজ পনর দিনের মধ্যে এক মুহূর্ত্ত ভুলতে পারলাম না। সাজিয়ে দিয়ে যখন করুণভাবে বললাম, 'তোকে এই শেষ সাজিয়ে দিলাম। তোর দাদা তো তোকে জীবনে কোনদিন আর সাজাবে না।'তখন প্রতিমা একটু হেসেছিল। কি করুণ সে হাসিটুকু! কত আনন্দের, কত বিষাদের,কত অভিমানের কথাই তার মধ্যে ছিল! সে নীরব হাসিটুকুর ভিতরে অফুরন্ত কথা আমার সারা জীবন ভাবলেও শেষ করতে পারব না- শেষ করতে চাইও না। তা যেন আমার জীবনে নিত্য নূতন চিন্তার উপকরণ যুগিয়ে আমার জীবনকে ঐশ্বর্য্যময় করে তোলে, দিন দিন উন্মত্ত করে তোলে। সে তো নিজ হাতে অমৃত পান করে অমর হয়ে গেছে। কিন্তু মরজগতে আমরা তার বিসর্জ্জনের ব্যথা যে কিছুতেই ভুলতে পারছিনা! আজ বিজয়ার দিনে,সেই দিনের বিজয়ার করুণ স্মৃতি যে আমার মর্ম্মে মর্ম্মে কান্নার সুর তুলছে- চোখের জল কিছুতেই রোধ করতে পারছি না- 'চাপিতে গেলে উঠে দু'কূল ছাপিয়া।'

সে যে আমার আনন্দের উৎস- নির্দোষ, নিষ্পাপ ছিল-সুন্দর,পবিত্র মহান্ ছিল! তারমধ্যে একাধারে যত গুণ দেখেছি আর কোন মানুষের মধ্যে তত গুণ আমি দেখিনি। তার অন্তরের সৌন্দর্য্য আমায় মুগ্ধ করেছিল। তার মনের জোর, দৃঢ় সংকল্প, সাহস,বীরত্ব কারও চেয়ে কম দেখিনি। তার সরলতা, বাধ্যতা খুব সুন্দরই ছিল। তার শিক্ষা,আদর্শের অনুভূতি, সুন্দর ব্যবহার কিছুরই অভাব ছিল না। সর্ব্বোপরি কঠোর বিপ্লবী মনোভাবের মধ্যে ভগবানের উপর অটুট ভক্তি , বিশ্বাস, সে যে ভাবে জয় করে রেখেছিল তা দেখলে বাস্তবিকই শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা হয়। এত গুণের আধার ছিল বলে তাকে খুবই স্নেহ করতাম- হৃদয়ের সমস্ত উজাড় করে তাকে দিয়েছিলাম- প্রতিদানে অসীম আনন্দই পেয়েছি, এত আনন্দ জীবনে পাই নি। এত স্নেহের, এত আদরের প্রতিমাকে নিজ হাতে বিসর্জ্জন দিয়ে চলে এলাম। তাই সে দিনের কথা আজ কেবলই মনে হচ্ছে, মনে পড়ছে সেই প্রতিমাটিকে। সে এত অফুরন্ত আনন্দ আমায় দিল, এত গুণ দেখিয়ে গেল, এত মহৎ আত্মদান করে গেল,দেবতার মত শ্রদ্ধা আমায় দিল, সে সব কথা মনে করে আজ আনন্দ না পেয়ে তাকে সরাবার ব্যথাই আমার প্রাণে এত বেশী বাজছে-আজ আমার এই একমাত্র দুঃখ।

অসুরদলনী মা আমার! আজ বিজয়ার দিনে তোমার কাছে এই কামনা , তুমি আমায় এই বর দাও- যেন তার স্মৃতি আমাকে আনন্দ দেয়, তার গুণের কথা মনে হলে যেন আমি গৌরব অনুভব করি। তার অপূর্ব আত্মদান আমার প্রাণে যেন আনন্দ দেয়, আমাকে যেন আরও শক্তিমান্ করে তোলে, তার শ্রদ্ধা যেন আমাকে তার শ্রদ্ধার উপযুক্ত করে তোলে- তাকে হারাবার ব্যথাটা এত আনন্দকে ছাপিয়ে যেন কিছুতেই না উঠে।

আমার স্নেহের প্রতিমাকে বলছি- "রাণী, তোকে আমি কতদিন কত ব্যথাই দিয়েছি; আজ বিজয়ার দিনে তোর দাদার সব দোষত্রুটি ভুলে যা, আমার উপর আর অভিমান রাখিস্ না। তোকে হৃদয় উজাড় করে স্নেহ করেছি, তোর গুণ দেখে দেখে আমি মুদ্ধ হয়েছি- তোর ভগবৎ ভক্তি দেখে তোকে শ্রদ্ধা করেছি; তোর সঙ্গে প্রাণখুলে নিঃসঙ্কোচে মিশেছি- এত আপনার করে নিয়েছিলাম বলেই হয়ত তোকে সামান্য দোষে অথবা বিনা দোষে কত গাল দিয়েছি, হয়ত কোন সময় ভুল বুঝে তোর মনে ব্যথা দিয়েছি, তোকে খুব স্নেহ করতাম বলে তোকে গাল দিতে কোন ইতস্তত করিনি। মনে করতাম তোকে হাজার গাল দিলেও তুই আমার উপর রাগ করবি না, কোন দিন করিস্ও নাই- শেষ মুহূর্তে তোকে ভুল করে আমি একটু গাল দিয়েছিলাম বলে তুই হয়ত অভিমান নিয়ে গেছিস্। আজকের দিনে তুই যেখানে আছিস্ সেখান থেকেই আমার সব দোষত্রুটির জন্য আমায় ক্ষমা করে যা। শেষ মুহূর্তে তোকে একটু কষ্ট দিয়েছি বলে আমি যে দিনরাত অশান্তির দহনে দগ্ধ হচ্ছি তা তুই দেখছিস্। তোর দাদা যেন শান্তি পায় তার ব্যবস্থা তুই করে দে। তোর কি মনে নাই, তোর দাদার দুঃখ একটুও সহ্য করতে পারতিস্ না। তাই আবার বলছি, আজকের এই পবিত্র দিনে আমার দোষত্রুটি সব ভুলে গিয়ে হাসিমুখে তোর দাদার বিজয়া-সম্ভাষণ গ্রহণ কর্। আমার স্নেহের সম্ভাষণ- শ্রদ্ধার সম্ভাষণ তোকে জানাচ্ছি। আজ মিলনের দিন, ভেদাভেদ ভুলে যাওয়ার দিন, বিবাদ- বিসম্বাদ, দোষত্রুটি সবই ভুলে যাওয়ার দিন। আজ তুই আমার পাশে থাকলে যে আনন্দ আমি পেতাম, দুর থেকেও সেই আনন্দ তুই আজ আমাকে দে। এমন সুন্দর দিনে মায়ের নামটি নিয়ে প্রাণ খুলে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, তোর মত নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক কাউকে আমি পাইনি। বাস্তবিক ফুলেরই মত তুই সুন্দর, পবিত্র ও মহান ছিলি। তোর অপূর্ব আত্মদানে তোকে আরও সুন্দর ,আরও মহনীয় করে তুলেছে।

বরদাত্রী মা আমার-আমায় আশীর্বাদ কর যেন আমার প্রতিমার মধ্যে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মহৎ দেখেছি তা যেন আমার এবং আমার প্রিয় ভাইবোনেরা জীবনে প্রতিফলিত করবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি না করে। "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক" শান্তি। শান্তি। শান্তি।

বর্মায় বিপ্লব প্রচেষ্টা ঃ সূর্য সেনের অনুগামীদের ভূমিকা

অমলেন্দু দে

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র বার্মায় ব্রিটিশ প্রাধান্য স্থাপিত হয়। তার ফলে বর্মীরা বিক্ষুব্ধ হন। বর্মার বিভিন্নস্থানে ব্রিটিশ শাসনকে বিপর্যস্ত করার প্রয়াস শুরু হয়। প্রথম দিকে এই ক্ষোভের কোন সংগঠিত রূপ ছিল না। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ক্রমশ তা সুসংগঠিত হয়। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত ঝালুন বিদ্রোহকে বর্মায় প্রথম সুসংগঠিত বিদ্রোহ বলা যায়। প্রায় একই সময়ে ভারতীয় বিপ্লবীদের কর্মপ্রচেষ্টাও বর্মায় লক্ষ করা যায়। অনেককাল আগে থেকেই চট্টগ্রামের হিন্দু ও মুসলমান বাসিন্দাদের বর্মার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। তাঁরা সেখানে গিয়ে চাকরি করতেন অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। অনেকে বর্মী মেয়েদের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়ে স্থায়ীভাবে বসবাসও করেন। এই শতাব্দীর সূচনায় চট্টগ্রাম শহরে বিপ্লবী দল প্রতিষ্ঠিত হয়। অরবিন্দ ঘোষ প্রচারিত বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে চট্টগ্রামে এসে পড়ল আলিপুর বোমার মামলার পলাতক কিছু আসামী গোপনে চট্টগ্রামে আশ্রয় নেবার পরে। চট্টগ্রামের নাগরিকদের মধ্যে কয়েকজন তাঁদের সেখানে লুকিয়ে থাকতে সাহায্য করেন। এই আসামীরাই চট্টগ্রামে সর্বপ্রথম বিপ্লবের বীজ বপন করেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামে গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয। যামিনীকান্ত সেন, মণীন্দ্র সেন ও অম্বিকা চক্রবর্তী তার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। সূর্যসেনও এই সমিতির সদস্য ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। তবে এখনও এই মতের সমর্থনে কোন প্রত্যক্ষ তথ্য পাওয়া যায়নি। ক্রমশ হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছাত্র ও যুবকেরা এই সমিতির সঙ্গে যুক্ত হন। অন্যদিকে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামে অনুশীলন সমিতির প্রভাব যে কিছুটা বৃদ্ধি পায় তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই সময়েই গোয়েন্দা সন্দেহে সত্যেন সেনকে চট্টগ্রামের সদরঘাট ২নং নালাপাড়া গলির প্রবেশ পথে গুলি করে হত্যা করা হয়। এই ঘটনাকে চট্টগ্রাম শহরের প্রথম রাজনৈতিক হত্যা' বলে উল্লেখ করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে চট্টগ্রামে বিপ্লবী ভাবধারার প্রসার ঘটে। ঢাকা ও কলকাতা থেকে অনুশীলন সমিতির কর্মীদের আগমন এবং বরিশালের 'স্বদেশবাণী' ও ময়মনসিংহের 'সুহৃদ' সমিতির যুবকদের প্রয়াস চট্টগ্রামের যুবকদের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে যোগদান করতে উৎসাহিত করে। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে সূর্য সেন চট্টগ্রামে একটি সুসংগঠিত বিপ্লবী দল গঠন করেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই এই দল যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে। এই বিপ্লবীদলের সদস্যরা অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেন। একই সঙ্গে তাঁরা গোপনে বিপ্লবী কর্মসুচী অনুযায়ী প্রস্তুত হতে থাকেন। প্রকাশ্যে তাঁরা কংগ্রেস মঞ্চ থেকেই কাজ কর্ম করেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের শুরুতে অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হওয়ার পর সূর্য সেনের পরিচালনায় বিপ্লবীরা তাঁদের নিজেদের দলের জন্যই সমস্ত শক্তি নিযোগ করেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে সূর্য সেন সহ এই দলের বহু কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই তাঁরা সবাই মুক্ত হন। কিন্তু এই দলের একজন প্রথম সারির নেতা অনুরূপ সেন বেনারসে অন্তরীণ থাকার সময়ে মারা যান। মুক্ত হওয়ার পরেই সূর্য সেন বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুতি শুরু করেন এবং ভারতের সাধারণতন্ত্রী বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখা তৈরী করে দলের সদস্যদের অভ্যুত্থানের জন্য সংগঠিত করেন।

স্বভাবতই অস্ত্র সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। শুধু কলকাতা থেকেই নয়, বর্মা থেকেও অস্ত্র সংগ্রহ করা হয়। ইতিমধ্যে বর্মায় ভারতীয় বিপ্লবীরা খুবই সক্রিয় হন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে জাপান যাত্রা পর্যন্ত রাসবিহারী বসু ছিলেন ভারতের জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম নেতা। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'গদর' (বিদ্রোহ) দলের সহযোগিতায় ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য রাসবিহারী বসু পরিকল্পনা করেন। গদর দলের কর্মীরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তাঁদের পরিকল্পনার জাল বিস্তার করেন। বিপ্লবীরা রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুত হন। স্থির হল ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারী অনুশীলন সমিতি, গদর পার্টি ইত্যাদি বিপ্লবীদের মিলিত উদ্যোগে সশস্ত্র অভ্যুত্থান অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু কৃপাল সিংহের বিশ্বাসঘাতকতায় এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। বহু বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করা হল, কয়েকজনের ফাঁসি হল, আর অনেকের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হল। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুরে সশস্ত্র অভ্যুত্থান হল। রুশ, জাপান ও ইংরেজ রণতরীর সাহায্যে এই বিদ্রোহও দমন করা হল। ডান্ডি খাঁ সহ কয়েকজন ভারতীয় সেনানীর প্রাণদণ্ড হয়। অধিকাংশ বিপ্লবী সৈনিক নিহত হন। কয়েকজন পালিয়ে বর্মায় ও শ্যামদেশে আশ্রয় নেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে বর্মাতেও সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন হয়। যাঁরা এখানে বিপ্লবী দল গঠনে উদ্যোগী হন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আলি মহম্মদ ও কাসেম আলি। তখন রেঙ্গুনে ১০৩ নং বেলুচ রেজিমেন্ট ছিল। এই রেজিমেন্টের সৈনিকদের সঙ্গে ভারতীয় বিপ্লবীদের যোগাযোগ ছিল। সোহন লাল পাঠক, মুস্তাফা হোসেন প্রমুখ বিপ্লবীরা তাঁদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। সেই সময় ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে প্রচারের সময়ে সোহনলাল ধরা পড়েন। ব্রিটিশ সরকার ষড়যন্ত্রের সন্ধান পেয়ে বহু বিপ্লবীকে বন্দী করেন এবং বর্মা ষড়যন্ত্র মামলা শুরু করে তাঁদের অভিযুক্ত করা হয়। এই মামলা মান্দালয় স্পেশাল ট্রাইবুনালে হয় এবং লালা হরদয়াল,

রাসবিহারী বসু, বরকতুল্লাহ ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত আছেন বলে উল্লেখ করা হয়। এই মামলায় সোহনলাল, কৃপারাম, হরনাম সিং, কালা সিং ও বাসুদেব সিং-এর ফাঁসি হয়,আর চৈৎরাম, কাপুর সিং, হরদিৎ সিং, বদন সিং গুজর সিং প্রমুখের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করায় বেলুচ রেজিমেন্টের প্রায় দুই শত সৈনিককে বিভিন্ন দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

বৃটিশ ভারতের সাম্রাজ্যভুক্ত বর্মায় যে সব বিপ্লবীরা চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের সাফল্যের জন্য সহায়তা করেন তাঁদের সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমেই দেবেন দে, নির্মল সেন ও মনীন্দ্র মজুমদারের ভুমিকা আলোচনা করতে হয়। তাঁরা বর্মায় থেকে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের পক্ষে অনুকুল পরিবেশ তৈরী করেন। সংগৃহীত অর্থ কি ভাবে চট্টগ্রামে পাঠাতে হবে তার ব্যবস্থাও তাঁরা করেন।চট্টগ্রামের বহু মানুষ বর্মায় কর্মরত থাকায় ও বর্মার ভৌগলিক অবস্থান অত্যন্ত উপযোগী হওয়ায় চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের সেখানে যোগাযোগ স্থাপন করে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহ করা সহজ ছিল। সূর্য সেনের নির্দেশে চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা বর্মার বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহ করা সহজ ছিল। সূর্য সেনের নির্দেশে চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা বর্মার বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরই অনুমোদন নিয়ে শচীন্দ্র নাথ গুহ রেঙ্গুনে যান। সেখানে শচীন্দ্রনাথের কাকা বর্মা একাউনটেন্ট জেনারেল অফিসে কাজ করতেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শচীন্দ্রনাথ রেঙ্গুনে পড়তে গেলেও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মী হিসেবে দায়িত্ব পালন করা। চট্টগ্রাম অনুশীলন দলের সদস্য নগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বর্মার একটি বিপ্লবী দলের নেতা ছিলেন। শচীন্দ্রনাথ সূর্য সেন পরিচালিত বিপ্লবী দলের কর্মী হলেও তাঁর সঙ্গে নগেন্দ্রনাথের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল। এই সময়ে রেঙ্গুনে বেঙ্গল একাডেমীর নবম শ্রেনীর ছাত্র জিতেন দাশগুপ্তের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তিনিই শচীন্দ্রনাথকে রেঙ্গুনের এক শক্তিশালী বিপ্লবী দলের নেতা জিতেন ঘোষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। জিতেন ঘোষ রেঙ্গুনের রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং অফিসে কাজ করতেন। রেঙ্গুনের রামকৃষ্ণ মিশন ও বেঙ্গল একাডেমীর ছাত্রদের মধ্য থেকেই বিপ্লবী দলের সদস্য সংগ্রহ করা হত। শচীন্দ্রনাথ এই বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত হন। এই দলের আরো দুজন নেতা ছিলেন। তাঁরা হলেন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র খগেন মুখার্জী (পরবর্তীকালে বর্মার অন্যতম কমিউনিষ্ট নেতা হন) এবং বেঙ্গল একাডেমীর ছাত্র সুকুমার সেন (পরবর্তী কালে যতীন সেন নামে কমিউনিষ্ট নেতা হিসেবে পরিচিত হন)। তাঁদের সঙ্গে শচীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটে। উল্লেখ্য এই, বর্মায় আসার আগে জিতেন ঘোষ মাদারীপুরের বিপ্লবী নেতা পূর্ণচন্দ্র দাসের পরিচালিত বিপ্লবী গ্রুপের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। বর্মায় বসবাসকারী নগেন দাশগুপ্ত অনুশীলন দলের কর্মী ছিলেন। বর্মায় অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দলের সদস্যরা একসঙ্গেই কাজকর্ম করতেন, তাঁরা ভারতের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্যে পরস্পরকে সাহায্য করতেন।

বাংলা থেকে বইপত্র বর্মায় নিয়ে আসার ব্যাপারে দায়িত্ব পালন করতেন রেঙ্গুনের বাসিন্দা দিনেশ বিশ্বাস। সম্ভবত তিনি ঢাকা থেকে রেঙ্গুনে আসেন। তিনি রেঙ্গুনের লুইস ষ্ট্রীটে 'বিশ্বাস কোম্পানী' নামে বই ও সংবাদপত্রের দোকান খুলে বিপ্লবী দলের দায় দায়িত্ব পালন করতেন। এই সময়ে রেঙ্গুনে চট্টগ্রাম অনুশীলন সমিতির সক্রিয় সদস্য প্রবীণ বড়ুয়া, সারদা ভট্টাচার্য, বসুধা রক্ষিত ও সুমতি মজুমদার বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এক সময়ে ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীও বর্মায় গিয়ে তাঁদের সাহায্য করেন। প্রবীণ বড়ুয়া বর্মায় রেলওয়েতে চাকরি করতেন এবং থিনাঞ্জং ষ্টেশনের কাছে এক ভাড়াটে বাড়িতে থাকতেন। তিনি **purity League** নামে একটি শরীর চর্চার কেন্দ্র গঠন করে বিপ্লবীদলের সদস্য সংগ্রহ করতেন। চট্টগ্রামের কেদারেশ্বর ভট্টাচার্য রেঙ্গুনের একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। তিনিও বিপ্লবী দলের একজন নেতা ছিলেন। তিনি জে, টি, স্যাণ্ডারল্যান্ড রচিত **India in Bondage** গ্রন্থটি বর্মী ভাষায় অনুবাদ করেন। কিন্তু তা বর্মী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে কোন খবর পাওয়া যায় না।

রেঙ্গুন বন্দরে বিভিন্ন দেশের জাহাজ আসা যাওয়া করত। জাহাজীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও শ্রীহট্টের বাসিন্দা। তাঁদের সাহায্যে অস্ত্র সংগ্রহ করে চট্টগ্রামে পাঠানো হতো। চট্টগ্রাম রেঙ্গুন যাতায়াত করত এমন একটি জাহাজে হোটেল চালাতেন রেবর্তী দত্ত। তিনি অনুশীলন সমিতির কর্মী ছিলেন। তিনি চাল ডালের মধ্যে অস্ত্র লুকিয়ে রেখে চট্টগ্রামে নিয়ে আসার ব্যাপারে সাহায্য করতেন। বর্মায় বিপ্লবীদের সঙ্গে রাসবিহারী বসু, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ প্রমুখ বিদেশে বসবাসকারী বিপ্লবীদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। রাসবিহারী বসু জাপানে **Pan-Asiatic Movement** সংগঠিত করে ভারতের অভ্যন্তরে বিপ্লব প্রচেষ্টায় সাহায্য করার চেষ্টা করেন। এই আন্দোলনের কাগজপত্র গোপনে বর্মা ভারতীয় বিপ্লবীদের সাহায্যে ভারতে পাঠানো হতো। তাছাড়া এই আন্দোলনের নেতারাও মাঝে মাঝে বর্মায় এসে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। চট্টগ্রামের বিপ্লবী নেতা নির্মল সেনের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ ছিল। রাসবিহারী বসু যে **Pan-Asiatic League** গঠন করেন তার ডিরেকটরদের মধ্যে কয়েকজন জাপানী ও রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ ছিলেন। এই লীগের ইংরেজি মুখপত্র **Voice of India**- তে ভারতের খবর প্রকাশিত হত।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে ভারতের সর্বত্র বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। বর্মাতেও এই আন্দোলনের ঢেউ এসে পৌছায়। বর্মা প্রবাসী ভারতীয়রাও বিক্ষুব্ধ হন। স্বদেশপ্রাণ বর্মীদের মনেও ক্ষোভের সঞ্চার হয়। বর্মা সরকার ও ব্রিটিশ ভক্ত বর্মীরা সাইমন কমিশনকে স্বাগত জানান। এই উপলক্ষে রেঙ্গুনকে আলোক সজ্জায় সজ্জিত করা হয়। আতস বাজী পোড়ানো হয়। সুসজ্জিত রেঙ্গুন লেকে কমিশনের সদস্যদের জন্য প্রমোদ বিহারের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু বর্মায় যেসব তরুণ তরুণী ভারতীয় বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন তাঁরা এই কমিশনের প্রতি বিরূপ ছিলেন। সেই সময়ে জিতেন দাশগুপ্ত ও শচীন্দ্রনাথ গুহ এই অভিজ্ঞতাই লাভ করেন। তাঁরা দুজনে কমিশনের সদস্যদের সংবর্ধনা জানানোর দিনে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে বর্মীদের প্রতিক্রিয়া অবগত হওয়ার চেষ্টা করেন। রেঙ্গুনের **Monkey Point** নামক স্থানে অনেক রাত পর্যন্ত তাঁরা ছিলেন।

বর্মায় রাজনীতি সম্বন্ধে শচীন্দ্রনাথ যে সব তথ্য সংগ্রহ করেন তার সাহায্যে তিনি কলকাতা থেকে প্রকাশিত যুগান্তর দলের মুখপত্র 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় 'বর্মার বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তা এই পত্রিকায় ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ মার্চ প্রকাশিত হয়। তিনি লেখেন, বিদেশী শাসন বর্মাকে সব দিক থেকেই পঙ্গু করে ফেলেছে। বর্মীদের মধ্যে অনেকগুলো রাজনৈতিক দল রয়েছে। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষপাতি রাজনৈতিক দলও আছে। সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দলের নাম ছিল **General Council of Burmese Association;** পরে তা কতগুলো ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়। শিক্ষিত মহিলাদের নিয়েও একটি রাজনৈতিক দল সংগঠিত হয়। কোন কোন দলে বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরও প্রভাব ছিল। বর্মার বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা রাজনীতিতে সচেতন ছিলেন। তাছাড়া গোপন বিপ্লবী দলও ছিল। বর্মার থারাওয়াডী অঞ্চলের সায়া সান পরিচালিত গোপন বিপ্লবী দলের সঙ্গে বাংলার বিপ্লবীদের যোগাযোগ ছিল। উ, স, নামে একজন বিপ্লবী নেতার সঙ্গেও তাঁদের পরিচয় ছিল। কেমেণ্ডাইন স্টেশনের কাছে। উ, স-র যে ছাপাখানা ছিল তা ছিল বর্মা ও ভারতীয় বিপ্লবীদের যোগাযোগের অন্যতম কেন্দ্র।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রামে সূর্য সেনের নেতৃত্বে ভারতীয় সাধারণতন্ত্রী বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখা চট্টগ্রামে ব্রিটিশ শাসনকে পর্যুদস্ত করে। সেই সংবাদ বর্মায় প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ শাসকদের অস্বাভাবিক তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। ১৯ এপ্রিল রেঙ্গুনের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রের দোকানে সশস্ত্র প্রহরী মোতায়েন করা হয়। বর্মার সংবাদপত্রে সংক্ষিপ্ত সংবাদ বের হল "চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের দুঃসাহসিক অভ্যুত্থান। অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত"। কালার পোল সংগ্রাম সম্বন্ধে বাঙ্গালী সম্পাদিত 'রেঙ্গুণ মেইল' সংবাদপত্রের শিরোনামা ছিলঃ **A Pitched battle near Chittagong** চট্টগ্রামের অভ্যুত্থানের সংবাদ আসার পরেই রেঙ্গুনের বিপ্লবী নেতারা আলোচনা করে বিপ্লবমূলক প্রচারপত্রের মাধ্যমে বিপ্লবের বাণী প্রচার করার ব্যবস্থা করেন এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উপর প্রচণ্ড আঘাত হানার পরিকল্পনাও করেন। বর্মী ও ভারতীয় বিপ্লবীরা যুক্তভাবে এই পরিকল্পনাকে কার্যকর করতে উদ্যোগী হন। রেঙ্গুণ পুলিশ কমিশনার অফিসের নগেন দাশগুপ্ত, রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং অফিসের জিতেন ঘোষ, শিক্ষক কেদারেশ্বর ভট্টাচার্য এবং বর্মার বিপ্লবী নেতা উ,স নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। মংজী ও তাঁর বোন মাজী নামে দুজন তরুণ বিপ্লবীও এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মংজীর ছিল কাঠের ব্যবসা, আর মাজী ছিলেন রেঙ্গুণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। তখন বর্মায় ভারতে প্রকাশিত দুটো বই বর্মী যুবকরা আগ্রহ করে পড়তেন-**Revolutionaries of Bengal** এবং **What the students of other Countries have done;** চট্টগ্রামের অভ্যুত্থানের পর মাজী এই দুটো বই বর্মী ভাষায় অনুবাদ করার ব্যবস্থা করেন।

রেঙ্গুনের বিপ্লবী নেতাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইংরেজী ও বর্মী ভাষায় বিপ্লবমূলক প্রচারপত্র 'ভ্যানগার্ড' বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই প্রচার পত্রের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি অর্জনের জন্য ছাত্র ও জনসাধারণকে আহব্বান জানানো হয়। 'ভ্যানগার্ড'কে বর্মায় প্রচারিত প্রথম বিপ্লবমূলক প্রচারপত্র বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি বর্মায় ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যে আবেদনপত্র প্রচারিত হয়েছিল তা আমেরিকা থেকে বর্মায় আগত 'গদর' বিপ্লবীরা করেন। আর তা করা হয়েছিল বর্মায় কর্মরত ভারতীয় সামরিক বাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর উদ্দেশ্যে। এই আবেদেন পত্রের শিরোনামায় এইসব কথা লেখা ছিলঃ **A message of home to military brethrne, to the native officers of the military police.** চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের পরে বিপ্লবী সৈনিকরা যদি আত্মগোপন করে বর্মায় প্রবেশ করেন তাহলে তাঁদের নিরাপদ আশ্রয়ে রাখার ব্যবস্থাও হয়। বর্মার দক্ষিণের বেসিন শহর থেকে প্রায় ১৫ মাইল দূরে তাবং গ্রাম। এখানে ব্যবসা করতেন নিকুঞ্জ বৈদ্য। তিনি আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের আশ্রয়দানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আর একজন আশ্রয়দাতা ছিলেন মধ্য বর্মার টডিং ডেঞ্জী ডাকঘরের কর্মী মনোরঞ্জন চক্রবর্তী। এঁরা দুজনেই ছিলেন চট্টগ্রামের বাসিন্দা। আরো কয়েকটি গোপন আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা হয়। কিছুদিন পরেই চট্টগ্রাম থেকে এসে পৌছলেন মনোরঞ্জন দত্ত ও হেমেন্দু দস্তিদার। তাঁরা দুজনেই চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। হেমেন্দু দস্তিদার জালালাবাদ যুদ্ধের সৈনিক ছিলেন। বর্মায় তাঁদের গোপন আশ্রয়স্থলে রাখা হয়। এই সময়ে রেঙ্গুন শহরের একটি মানচিত্র গোপনে সূর্য সেনের কাছে পাঠানো হয়। নগেন দাশগুপ্ত বর্মার পুলিশ কমিশনার অফিস থেকে পুলিশের বিশেষ মানচিত্র রেবতী দত্তের মারফৎ চট্টগ্রামে পাঠান।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে বর্মায় বিপ্লবীরা সুসংগঠিত হল। সেপ্টেম্বর মাসে বেঙ্গল একাডেমীর অর্থলুণ্ঠিত হয়। বর্মার গ্রীষ্মকালীন রাজধানী মেমিও থেকে কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী রেঙ্গুনে ট্রেনে করে রওনা হন। নগেন দাশগুপ্তের নেতৃত্বে কয়েকজন বিপ্লবী টাঙ্গু জেলার ন্যাঙ্গচি ভডিকে ট্রেনটি লাইনচ্যুত করে তাঁদের প্রাণনাশের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁরা সফল হননি। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর থারাওয়াডী জেলায় বিপ্লবীরা সায়া সান-এর নেতৃত্বে বিদ্রোহ করেন। অন্যান্য কয়েকটি জেলাতেও বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২ আগস্ট সায়া সান সুমসি অঞ্চলে ধরা পড়েন। এবং ২৮ নভেম্বর ফাঁসি হয়। এই বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করার জন্য প্রায় তিনশত বিপ্লবীকে ফাঁসি দেওয়া হয়। বহু মানুষকে বন্দী করা হয়। বর্মার ইতিহাসে এই বিদ্রোহ থারাওয়াডী বিদ্রোহ নামে পরিচিত। এই বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশ সরকার প্রচণ্ড বর্বরতা প্রদর্শন করে। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ জুন ওয়েটো নামক স্থানে বিদ্রোহীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে ২২ জন বিপ্লবী মারা যান। ১৬ জন বিপ্লবীর মুণ্ডচ্ছেদ করে লম্বা খুঁটিতে বেঁধে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়ে দেখানো হয়। তারপর শহরের রাস্তায় এই কাটা মুণ্ডগুলোকে সাজিয়ে রাখা হয়। এইভাবে বর্মার জনসাধারণকে ব্রিটিশ শাসকরা ভীত-সন্ত্রস্ত করে। বিদ্রোহী নেতা সায়া-সান-এর বহু সহকর্মীকে ইনসিন কারাগারে আবদ্ধ করা হয়। তাঁদের মধ্যে ২০ জনকে ফাঁসি দেওয়া হয়। এই বিপ্লবীরা ফাঁসির মঞ্চে জীবনদানের পূর্ব মুহূর্তে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেন; আমরা যা করেছি, সবই ভালোর জন্য" । এই বিদ্রোহ দমনের জন্য বর্মী সরকার ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ জানুয়ারী একটি অর্ডিন্যান্স জারি করেন। সমগ্র বর্মায় বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করা হয়। থারাওয়াডী বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে নগেন দাশগুপ্ত, জিতেন ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবী নেতা ও কর্মীদের গ্রেপ্তার করে ইনসিন জেলে বন্দী করা হয়। এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা দিল্লীর ব্যবস্থা পরিষদে স্যার জেমস ক্রেরার বিবৃতি থেকে জানা যায়। থারাওয়াডী জেলার বিদ্রোহ শুধু একটি জেলাতেই আবদ্ধ থাকেনি। অন্যান্য জেলাতেও এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে এবং সঙ্ঘবদ্ধ বিদ্রোহী দল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ায়। এই বিদ্রোহে বর্মার সাধারণ মানুষও যোগদান করেন। কিন্তু কি কারণে বিদ্রোহীরা ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ কামনা করেন, সেই বিষয়ে স্যার ক্রেরার কিছুই বলেননি। সামরিক পুলিশ কিভাবে তাঁদের দমন করে সেই কথাই তিনি শোনান। এই বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হলেও, ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব দূর করা সম্ভব হয়নি। মাঝে মাঝেই বর্মার বিভিন্ন স্থানে বিপ্লবমূলক প্রচারপত্র প্রকাশ করা হত। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে এই রকম তিনটি প্রচারপত্র কয়েকটি স্থানে প্রচারিত হয়। তাতে লেখা ছিল; **Freedom First, Freedom Second and Freedom Third,** কারো কারো মতে, ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে বর্মার বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ভিক্ষু বিজয়ের আত্মদান এবং ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামের সশস্ত্র অভ্যুত্থান বর্মার থারাওয়াডী বিদ্রোহকে তরান্বিত করে। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৯ এপ্রিল কারাগারে কয়েকটি দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে তিনি অনশন শুরু করেন এবং ১৬৩ দিন অনশন করার পর কারাগারের অভ্যন্তরে ২০ সেপ্টেম্বর শহীদের মৃত্যু বরণ করেন। বর্মার এই মহান বিপ্লবীর শোচনীয় মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য বর্মার বিপ্লবীরা প্রস্তুত হন। বর্মার ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব তীব্র হয়। থারাওয়াডী বিদ্রোহে তা লক্ষ করা যায়। এই কারণেই এই বিদ্রোহ দমনে প্রচণ্ড বর্বরতা প্রকাশ করতে ব্রিটিশ শাসকরা বিন্দুমাত্র সংকোচবোধ করেনি। চট্টগ্রামের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরেই বর্মার থারাওয়াডী বিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসকদের ভয়ানক শঙ্কিত করে তোলে।

অভ্যুত্থানের মূল কেন্দ্র চট্টগ্রাম হলেও সূর্য সেনের বিপ্লবী অনুগামীদের কর্মকাণ্ডের যে যথেষ্ট ব্যাপ্তি ছিল তা বর্মায় তাদের ভূমিকা থেকেই বোঝা যায়। বর্মায় বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন এমন কয়েকজন বিপ্লবী চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণ করে শহীদও হয়েছেন। তাই বর্মার প্রেক্ষাপট বাদ দিয়ে চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের ইতিহাস আলোচনা করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে ভারতীয় বিপ্লবীদের ভূমিকা অগ্রাহ্য করে বর্মার বিপ্লবী আন্দোলনের ছবিটি পরিস্ফুট হয় না। চট্টগ্রামের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার প্রয়োজনে এই বিষয়ে আরো তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

সূর্যসেনের রচনাবলী প্রসঙ্গ

আশা দাশ

তিনিই কবি যিনি জীবনে পরম বস্তু লাভের পথ প্রদর্শন করেন। দু'শো বছরের পরাধীন জাতির জীবনে সে পরম বস্তুটি কি? অবশ্যই তা মাতৃমুক্তি। বক্ষ শোণিতের বিনিময়ে মাতৃমুক্তি বরণ করে নিতে হবে-এটাই উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা। আর সে পথ ক্ষুরধারের ন্যায় নিশিতা দুরত্যয়া। এ পৃথিবীর বুকে দেবতার দীপ হাতে নিয়ে যাঁদের আবির্ভাব তাঁরা রুদ্রের দূত। বিপ্লবী সূর্যসেনও জাতিকে মৃত্যুর ভিতর দিয়ে অমরত্বের পথে আমন্ত্রণ করেছেন। জীবনে সহজ পথের অভিযাত্রী তিনি কোনও দিনই ছিলেন না। শুধু বিদ্রোহের নয়, কর্ম ও জ্ঞানের প্রেরণাও তিনি দিয়ে গেছেন। তিনি নিজে শিল্পী মনের অধিকারী ছিলেন। তাঁর কথাবার্তা, রচনা ও চিঠিপত্রের মধ্য দিয়ে পুনঃ পুনঃ তা আমাদের কাছে আভাসিত হয়েছে। এই শিল্পীমন মূর্ত হয়েছে তাঁর সৃজনশীল কর্মকৃতিত্বে এবং 'সাম্যাশ্রম' সংগঠনে। তাঁর 'মাষ্টারদা' নামকরণ কেবল বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকেনি, সারা ভারতে তা প্রসার লাভ করেছে। মূখ্যত তাঁর ভূমিকা ছিল বিপ্লব পথিকৃতের। দেশপ্রেম ও বৈপ্লবিক কর্মের ভিত্তির উপর ভারতের জাতীয় জীবনকে গড়ে তোলার ব্রত তিনি গ্রহণ করেন। তাঁর 'পত্রাবলী', 'বিজয়া', 'অনুভূতি', 'শেষ বাণী', প্রভৃতি রচনার মধ্য দিয়ে কেবল বিপ্লবীর নয়, এক ধ্যানস্থ জিজ্ঞাসু পুরুষের মূর্তিও পাঠকের নয়ন সমক্ষে সমুজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়। তাঁর পত্রগুলি রচিত হয়েছে দীর্ঘ এগারো মাস চট্টগ্রামের পাষাণ কারার অন্তরালে অবরুদ্ধ জীবনে। এই পত্রগুচ্ছে আছে ঈশ্বরে ঐকান্তিক বিশ্বাস, প্রকৃতির প্রতি গভীর প্রেম এবং সার্বজনীন ভালবাসা, যে ভালবাসা গৃহ পরিবারের সীমাকে ছাড়িয়ে তাঁকে নিয়ে গেছে এক অজানা অনুভূতির অনির্দেশ্যলোকে। মাস্টারদা বিপ্লবের কঠিন পথের পথিক, সর্বপ্রকার কাঠিন্যের উপাদানে তাঁর ব্যক্তিসত্তা গঠিত। কিন্তু তবুও তিনি পারিবারিক স্নেহমমতা হতে রিক্ত নহেন। কঠিন শিলাময় পর্বতের বুকে যেমন ঝরণা ধারা বয়ে চলে তেমনি এই বিপ্লবী পুরুষের হৃদয়ের গভীরেও স্নেহমমতার ফল্গুধারা নিয়ত বয়ে যেত। 'বিজয়া' 'অনুভূতি' 'চিঠিপত্র' ইত্যাদি রচনা সেই সাক্ষ্য বহন করে। আত্মীয় পরিজনদের কাছে লেখা তাঁর পত্রগুচ্ছ জাতীয় ঐশ্বর্যের মর্যাদা পাওয়া উচিত। পত্রগুলি কেবল রসোত্তীর্ণই নয়, দার্শনিক তত্ত্বে ও গভীর উপলব্ধিতেও সমৃদ্ধ। তাঁর মধ্যে যে সাহিত্য প্রতিভা ছিল এ কথা তাঁর জীবনীকারেরাও স্বীকার করেছেন। কিন্তু বিপ্লবী নেতার সদা-সতর্ক, বিঘ্নবহুল পথযাত্রায় এবং কর্মময় জীবনে সাহিত্য প্রতিভার স্ফুরণের সুযোগ কোথায়? বিপ্লবের প্রদীপ্ত অগ্নিবাহী হয়েও তিনি ছিলেন কল্পলোকের অভিযাত্রী। চরম ক্ষণের প্রতীক্ষারত বিপ্লবীর পত্রপুটে ধরা পড়েছে গাছের পাতার রঙ, ধরণীর সৌগন্ধ, নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্য, আকাশের নীলিমা। সেলের অভ্যন্তরে অবরুদ্ধ নিঃসঙ্গ বিপ্লবী উর্ধ্বে মহামৌন আকাশ আর নিম্নে ধরিত্রীর স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে নিয়েছেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে লিখেছেন-

'আমার মনও ২/৪ দিনের মধ্যেই প্রকৃতির মধ্য থেকে নিজের সঙ্গী জুটিয়ে নিল। সেই সঙ্গী হচ্ছে **Two trees, sky and the moon.** আমার ঘরের সামনেই দুটো গাছ দেখা যায়। রোজ ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুয়ে সামনের অশ্বথ গাছটার দিকে চেয়ে চেয়ে **Reserch** করতাম। অশ্বত্থ গাছটার সব পাতাগুলো তখন ঝরে গিয়েছিল, একটু একটু করে নূতন পাতার অঙ্কুর, একটু একটু করে পাতাগুলোর কোমল রং, বাতাসে পাতাগুলোর নৃত্য- **minutely** দেখতাম আর সেই পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধনের বৈজ্ঞানিক কারণগুলি ভাবতাম। আর সঙ্গে সঙ্গে অন্য গাছটির বৃদ্ধ জীর্ণ পাতাগুলোর সঙ্গে অশ্বত্থ গাছের পাতাগুলোর তুলনা করতাম। এই দেখে দেখে সকালবেলা অনেক্ষণ কেটে যেত। নীল আকাশে পাখীগুলো কেমন আনন্দে উড়ে বেড়াচ্ছে দেখে আমিও খুব আনন্দ পেতাম। সন্ধ্যার সময় নির্মল আকাশে চাঁদের দিকে দেখে খুবই ভাল লাগত- যতক্ষণ চাঁদ দেখা যায় ততক্ষণ দেখতাম। যেদিন চাঁদ দেখা যেত না সেদিন তারাগুলোর দিকে চেয়ে থাকতাম।'

সূর্যসেনের 'পত্রগুচ্ছ', 'বিজয়া', 'অনুভূতি' প্রভৃতি রচনায় অপরাজেয় বিপ্লবী যে কঠিন আত্মপ্রত্যয় ও ত্যাগদীপ্ত অনুভূতি নিয়ে অনিবার্য মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়েছেন তা আমাদের বিস্ময়ে অভিভূত করে। এক অনন্যসাধারণ মহিমায় মৃত্যু এসে সফলকাম বিপ্লবীদের কাছে উপনীত হয়েছে। বিজয়ী বীর মৃত্যুকে বরণ করবেন। জীবনে বহুবার মৃত্যুর হাতছানি তাঁর কাছে এসেছে, কিন্তু আজ আর কোন আড়াল আবডাল নেই, পরম লগ্নের জন্য একেবারে দিনক্ষণ স্থির হয়ে গেছে। কিন্তু জীবনের সহজ চলার পথ অতিক্রম করে বার্ধক্যে মৃত্যুর কাছে অনিবার্য আত্মসমর্পণ এ নয়, দীর্ঘ রোগাক্রান্ত জীবনের অবসানও নয়, বা হঠাৎ অপঘাতে একমুহূর্তে পৃথিবীর বুক থেকে জীবনের চিরবিদায়ও এ নয়। এ হল স্বেচ্ছায় জীবনের অমৃত-ভাণ্ড ফেলে রেখে মৃত্যুর বিষ পান করে নীলকণ্ঠ হওয়া। পৃথিবীর রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের বরণ ডালা উপেক্ষা করে পরিপূর্ণ যৌবনে মৃত্যুপথের পথিক হওয়া। বিপ্লবী তো পৃথিবীটাকে কত ভালবাসতেন, এর জন্য স্নেহ, মমতা, কর্তব্য, দায়িত্ব সবই

আছে, অথচ প্রতি মুহূর্তে চরম ক্ষণের জন্য রয়েছে মানস প্রস্তুতি। প্রয়োজন হলেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হবে। একটি ক্ষণও চিন্তা করার বা পিছিয়ে পড়ার অবসর নেই, সময় নেই প্রিয়মুখ ভেবে একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করার। কেমন করে বিপ্লবীরা এমন করে মৃত্যুকে বরণ করেন? বৌদিকে লেখা সূর্যসেনের পত্রে তাঁর মানস প্রস্তুতির সে আভাস ফুটে উঠেছে-

'আমার এ পারে পথ চলা হয়ত শেষ হয়ে এল, পার হওয়ার আশায় ঘাটে এসে বসে আছি, তারপর ওপারের পথচলা শুরু হবে। এই জন্য নিজেকে তৈরী করছি।

কেমন করে মৃত্যুকে তাঁরা এত সহজে বরণ করে নেন? এর উত্তর- স্বদেশকে ভালবেসে। একদিকে স্বদেশের প্রতি বিপুল প্রেম, আর এক দিকে মৃত্যুরূপা নিয়তি। স্বদেশের প্রয়োজনে মৃত্যুরূপা নিয়তির কাছে নিজেকে তাঁরা সমর্পণ করেন, জীবন দান করে হন জীবিতেশ্বর। মৃত্যুকে এমন সহজে, এত অবলীলাক্রমে, এমন অকুণ্ঠে শুধু মৃত্যুঞ্জয়ী মহাপ্রাণই নিতে পারেন। এ জন্য বিপ্লবীর রচনায় মৃত্যুর সহজ, সুন্দর রূপমাধুরী ফুটে উঠেছে। সূর্যসেন তাঁর মেজদিকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে লিখেছেন-

'আমার পথচলা শেষ হয়ে এল। তোমাদের স্নেহের বন্ধন ছেড়ে ভগবানের নিবিড় বন্ধনের মধ্যে ধরা দিতে আমি চলেছি। ভগবান আজ আমায় ডেকেছেন, এভাবে তিনি সবাইকে নিজের কাছে ডেকে নেন। কারো ডাক দু'দিন আগে আসে, কারো ডাক দু'দিন পিছে আসে- এই মাত্র তফাৎ। ভগবান শুধু সৃষ্টির কর্তা নন, তিনি ধ্বংসেরও দেবতা। ব্রহ্মরূপে তিনি সৃজন করেন, বিষ্ণুরূপে তিনি পালন করেন এবং শিবরূপে তিনিই আবার ধ্বংস করেন। এই বিশ্বরাজ্য তাঁর লীলা বই আর কিছু নয়। সংসার পারাবারের তীরে বসে আমাদের নিয়ে তিনি খেলছেন- ছোট ছেলেমেয়েরা যেমন বালির ঘর বেঁধে তার ভিতর পুতুল সাজায়, কত ঘটা করে পুতুলের বিয়ে দেয়, বাজনা বাজায়, স্ফূর্তি করে আবার কিছুক্ষণ পরে সব ভেঙ্গেচুরে দিয়ে ঘরে চলে যায়। আমরা ভগবানের হাতের ক্রীড়ক মাত্র। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া আমাদের কিছু করার জো নেই। এতকাল তাঁর ইচ্ছায় চলেছি আবার তাঁর ইচ্ছায় তাঁর কাছে ফিরে যাচ্ছি। যা অবশ্যম্ভাবী মানুষ, জীবজন্তু সবারই যা শেষ পরিণাম, তার জন্য দুঃখ করা, শোক করা কখনই উচিত নয় মেজদি, মরণ জিনিষটাকে মানুষ খুব ভয়ানক জিনিষ বলে মনে করে। এজন্যই মানুষ দুঃখ পায়। কিন্তু যে জিনিষটাকে কিছুতেই এড়ানো যাবে না, যে জিনিষটাকে প্রত্যেক মানুষকে একদিন না একদিন আলিঙ্গন করতেই হবে, তাকে ভয় করে লাভ কি। তাকে বন্ধুভাবে, প্রিয়জনের মত বরণ করে নিতে পারলেই মানুষ শান্তি পায়। কবি লিখেছেন- 'জীবন শুধু চেয়ে থাকা, মরণ তাঁরে বুকে পাওয়া।' বাস্তবিক মৃত্যুর ভিতর দিয়ে যদি আমার প্রিয়তম দেবতাকে পেতে পারি তবে মরণ আমার পক্ষে লোভনীয় হবে না কেন? ভগবানের ইচ্ছার উপর নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দিয়েছি, তাঁর আহবানে সাড়া দেওয়ার জন্য পুরোপুরি তৈরী হয়েছি।

প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে বিপ্লবীরা বুঝে ফেলেন মৃত্যুর শক্তি কত। তারপর মৃত্যুকে স্পর্শ করে তাঁরা মৃত্যুঞ্জয়ী হন, মৃত্যু বরণ করে হন ভূমানন্দ ঋষি। সূর্যসেন তাঁর বৌদিকে লিখেছেন-

'মানুষ কি অমর থাকে? যদি আপনাদের মধ্যে আমাকে ফিরে নাও পান তাতেও দুঃখ কি? আমি তো হাজার চেষ্টা করলেও কিছুতেই চিরদিন আপনাদের মধ্যে থাকতে পারতাম না। ভগবান যে কাউকে মর্ত্যের মাটিতে চিরদিন থাকতে দেন না। ভগবানের বিধানের কথা উপলব্ধি করে আপনারা মনকে শান্ত করে ফেলুন- অনর্থক ব্যাকুলতায় এবং অস্থিরতায় যে কোন লাভ নেই।

সূর্যসেন চেয়েছিলেন জীবনের চলার পথে মৃত্যু তাঁর কাছে আসবে শত্রুর গুলীতে নয়, দ্বীপান্তরে বা কারাগারের অন্তরালেও নয়, অথবা গোপনে বিঘ্নসঙ্কুল অভিযানের রুদ্ধ পথেও নয়। মৃত্যুর অম্লান বরণ মালা তাঁর কণ্ঠে দুলবে ফাঁসির রজ্জু হয়ে। তিনি বিশ্বাস করতেন মৃত্যুতেই জীবনের শেষ নয়, মৃত্যু মহৎ সৃষ্টির পূর্ব সূচনা মাত্র। বিপ্লবীর দেহে, বিপ্লবীর রক্তে দেশের মাটি হবে উর্বরা, আর সে জমিতে ফলবে সোনার ফসল-রক্তবীজের মত দেশ ভরে যাবে মাতৃভক্ত দেশপ্রেমিকে। এ জন্য বিপ্লবের পথ মৃত্যুর পথ হলেও, এ পথ তাঁর কাছে শুধু রমনীয় নয়, বরণীয়ও।

অনীহার সঙ্গে আত্মপ্রত্যয়ের মিলন হয়েছে তাঁর রচনায়-

'নীল আকাশের বিরাট চালচিত্রের নীচে কচি কচি ডাল সবুজ পাতায় ভরে গেল। আকাশ কী নীল আর পাতাগুলো কী ঘন সবুজ। মুহূর্তে জীবনের আবির্ভাব দেখছি। জীবন অনির্বাণ, অমর।" এ যে চিরজীবী হওয়ার তপস্যা। এ তপস্যায় প্রতি মুহূর্তে তিনি মৃত্যুকে জয় করেছেন। তিল তিল করে জীবন দান করেছেন, দান সম্পূর্ণ করে হয়েছেন দধীচি।

মৃত্যু সম্পর্কে যখনই তিনি কিছু লিখেছেন সে রচনায় ফুটে উঠেছে মৃত্যুর তপস্যায় প্রশান্ত আত্মসমর্পণের আকাঙ্ক্ষা, দ্বন্দ্বহীন ভগবদ ভক্তি, স্নিগ্ধ হৃদয়াবেগ ও নিবিড় আত্মবিশ্বাস। পুরোহিত মহামৃত্যুরূপা মাতার বন্দনা শেষ করেছেন, এবার মৃত্যুর মহাশঙ্খের আহবান তাঁর কানে এসেছে, কিন্তু এ আহবান যেন শ্রেয়কে বরণ করার জন্য অনন্ত জীবনের আহবান।

প্রদীপ শিখা তার সবটুকু আলোকরশ্মি দেবীপ্রতিমার অবয়বের ছন্দে ছন্দে নিঃশেষে বিলীন করে দিয়ে নিজেকে সমাপ্ত করে দেয়, বিপ্লবী সূর্যসেনও তাঁর সমগ্র সত্তা দিয়ে দেশমাতৃকার মঙ্গলারত্রিক সমাপন করে গেছেন। আর সকলকে এই বলে প্রবোধ দিয়েছেন যে, মৃত্যু ভয়ঙ্কর কিছু নয়, অনভিপ্রেতও নয়। মৃত্যু বিশ্ববিধাতার অমোঘ বিধান, শান্ত সংযত চিত্তে সে বিধান তিনি মেনে নিয়েছেন। বৌদিকে লিখিত পত্রে বিশ্বপ্রকৃতির অপরূপ রূপমাধুরীর রাজ্যে অবগাহন করে পরমেশ্বরের চরণে করুণ আত্মনিবেদনের আর্তি ফুটে উঠেছে। লিখেছেন-'সন্ধ্যায় আঁধার পৃথিবীতে নেমে আসবার আগেই সন্ধ্যা তারাটি আকাশে দেখা দেয়। রোজ এই গোধুলির তারাটির দিকে চেয়ে থাকি। প্রথম যখন তারাটি ওঠে তখন খুব ছোট বলেই মনে হয়। ধীরে ধীরে অন্ধকার ঘনিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে তারাটি যেন বড় হতে থাকে এবং খুব উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তারাটির দিকে চেয়ে চেয়ে কি ভাবি কিছুই জানি না। কিন্তু তার মধ্যে থেকে যেন আমি অসীমের সাড়া পাই, তার মধ্যে যেন ভগবানের অস্তিত্বের আভাস পাই। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তারাটি দেখার পর প্রার্থনা করতে বসি এবং প্রার্থনার শেষে একটি ব্রাহ্মসঙ্গীত মনে মনে আবৃত্তি করে আমার প্রার্থনা শেষ করি। রাত্রে যখন অনন্ত নীলাকাশ চাঁদের আলোয় ভরে যায় তখন তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকি এবং ভগবানের অপূর্ব সুন্দর সৃষ্টির মহিমা উপলব্ধি করতে করতে মন আনন্দে ভরে উঠে। অসংখ্য নক্ষত্রখচিত নীল আকাশে যখন চাঁদের আলো থাকে না-তখনও তার অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হই। এসব দেখতে দেখতে কত সুন্দর সুন্দর ভাবই মনে আসে এবং কত বড় কবির লেখা সুন্দর লাইনগুলি মনে পড়ে। বাস্তবিক বৌদি, অনন্ত আকাশ, অকুল সমুদ্র প্রভৃতি অসীম জিনিষের দিকে একদৃষ্টে এক মনে তাকালে এ সকল সুন্দর সুন্দর জিনিষের সৃষ্টিকর্তা সেই আদিহীন, অন্তঃহীন পরমপিতা পরমেশ্বরের কথাই মনে পড়ে। ....

আমার মনে কোন দুঃখ নেই, কোন গ্লানি নেই। ভগবানের বিধান হাসি মুখে মাথা পেতে নেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েছি। জেলের মধ্যে প্রায় নয় মাস আছি। এ সময়টুকু কেবল ভগবান মঙ্গলময়-এ কথাটুকু উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেই কাটিয়েছি। আজ মনে হচ্ছে আমার চেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। অনুধাবনের বিষয় এই যে, তাঁর পত্রগুচ্ছে ঈশ্বরে ঐকান্তিক বিশ্বাস, বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ, গৃহপরিজনের প্রতি অসীম মমতা কত সহজে সমন্বিত হয়ে ধরা পড়েছে।

'বিজয়া' সূর্যসেনের আত্মসমালোচনামূলক অর্ধসমাপ্ত রচনা। অস্ত্রাগার অভিযানের পর আত্মগোপন করে অবস্থানকালে 'বিজয়া' রচিত হয়েছে। তাঁর সংবেদনশীল করুণ চিত্তে অনুগত মৃত্যুঞ্জয়ী বিপ্লবীদের আত্মোৎসর্গ, তাদের শৌর্য বীর্যের শত ব্যঞ্জনা যে বেদনা আর অনীহার সৃষ্টি করেছে 'বিজয়া' তার বাঙময় প্রকাশ। রচনাটি লিখিত হয়েছে শহীদ প্রীতিলতার আত্মত্যাগের ১৫ দিন পর বিজয়া দশমীর দিনে। লিখেছেন-

'কত জীবনের বিজয়ার নিমিত্তই হলাম-কত স্নেহময়ী জননীর বুক শূন্য করে তাঁদের সোনার পুতলিকে স্বাধীনতার বেদীমূলে আহুতি দিয়েছি-কত জনকে অন্তরীণে, কারাগারে, নির্বাসনে, দ্বীপান্তরে পাঠিয়েছি, ঘরে ঘরে হাহাকারের সৃষ্টি করেছি-দেশের উপর গভর্ণমেন্টের অত্যাচার নির্যাতন টেনে এনেছি। এ সবের দায়িত্ব থেকে নিজেকে বাদ দিই কি করে। সফলকাম সংগ্রামীর জীবনে এসেছে এক ব্যাকুল প্রশ্ন। পরম একটি জিজ্ঞাসার মুখোমুখি তিনি দাঁড়িয়েছেন-হত্যা, সন্ত্রাস, অরাজকতা সৃষ্টি ঠিক কিনা?

"আমি কি অন্যায় করে যাচ্ছি? পনর বৎসর আগে অনেক ভেবে চিন্তে, ভালমন্দ বিচার করে জীবনের যে লক্ষ্য, যে আদর্শ গ্রহণ করেছিলাম আজও তাই আঁকড়ে ধরে আছি। দুর্বলতা কি আসতে চায়নি? কত রকমের দুর্বলতা আসতে চেয়েছে, কিন্তু তবুও নিজের লক্ষ্যটিকে তো ছাড়িনি। আজও মনে হচ্ছে, খুব নিঃসন্দেহেই মনে হচ্ছে, আমি যে পথে চলেছি দেশের অনেক লোক ভুল বুঝলেও সেই পথটাই ঠিক। এ বিশ্বাস এখনও আমার অটুট আছে যে, আমি অন্যায় করছি না, পাপ করছি না, দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে আমার দেশে যে হাহাকার অত্যাচার সৃষ্টি হয়েছে, এর চেয়ে আরো অনেক বেশীই, সব দেশেই তা হয়েছে। আমার আদর্শের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখেই আমার পথেই আমি চলেছি-এখনও কোন দ্বিধা আসেনি।

.... আমি যেন বড় নিঠুর ছিলাম, কিন্তু গত দু'মাসের পথচলা যেন আমার নিঠুর হৃদয়ের মধ্যে মমতা এনে দিয়েছে, কারুণ্যের সৃষ্টি করেছে, তাই অতি আদরের ছেলে, মেয়ে, ভাই-বোনকে হারিয়ে তাদের যে সব আত্মীয়স্বজন আজ বিজয়ার দিনে চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছেন, তাঁদের কথা মনে করে আমার মনে আজ ভীষণ লাগছে। ...... এত মায়ের চোখের জল, এত বাপের বুকফাটা কান্না, এত ভাইবোনের হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাস, এ সবের কারণ হয়েছি বলেই আমি কি অন্যায়

করেছি?...... কিন্তু আমার মনে হয়, আমি ঠিক পথেই চলেছি। তাই চারিদিকে শ্মশান সৃষ্টি হচ্ছে দেখে মনে ব্যথা পেয়েও আমি লক্ষ্যটিকে বুকে চেপে ধরে আছি-এই আশায় যে এ সকল পবিত্র শ্মশান-স্তূপের উপরে এক দিন স্বাধীনতার সৌধ নির্মিত হবে। 'বিজয়া' মাতৃচরণে বিপ্লবী সূর্যসেনের অশ্রু-স্নিগ্ধ পুষ্পাঞ্জলি। 'বিজয়া' রচিত না হলে কঠিন শিলাময় পর্বতের বুকের কন্দরে স্নেহ ও করুণার যে অন্তঃশীল গোপন ঝর্ণা ধারা বয়ে চলেছে তার সংবাদ কি করে পাওয়া যেত? বহু জীবনের সুখের পুষ্পদল ছিন্ন করে করে যিনি অগ্রসর হয়েছেন, বহু মৃত্যুর প্রত্যক্ষ কারণ যিনি, তিনি নিজের সুখ ও শান্তির স্বর্গ হতে চিরনির্বাসিত। কিন্তু আত্মপ্রত্যয়ের সামান্যতম অভাবও তাঁর মধ্যে দেখা দেয়নি। মৃত্যুর বুকে যে অমোঘ বীর্য, নব-জীবনের মন্ত্র তাই তাঁকে প্রবুদ্ধ করেছে।

'অনুভূতি' ছোট রচনা, শহীদ প্রীতিলতা যিনি ছিলেন বিপ্লবের পথে একটি স্নিগ্ধ প্রদীপ শিখা-অতুলনীয় আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান সেই মহীয়সী নারীর পরম আত্মোৎসর্গকে স্মরণ করে রচিত। সূর্যসেনের কাছে প্রীতিলতা ছিলেন-'স্নিগ্ধ সুষমায় ভরা একটি পবিত্র ফুল তার পরিপূর্ণ সৌন্দর্য নিয়ে এই দীন পূজারীর কাছে এসেছিল মায়ের চরণে অর্ঘ্য হওয়ার প্রবল আকাঙ্খা নিয়ে। পূজারী ফুলটিকে অতি সমাদরে গ্রহণ করেছে, তার নিষ্কলঙ্ক শুভ্রতায়, সৌরভে মুগ্ধ হয়েছে, মায়ের চরণে তার যাওয়ার ব্যাকুলতা দেখে তাকে শ্রদ্ধা করেছে, শেষে মায়েরই চরণে তাকে অঞ্জলি দিয়ে তার আকাঙ্খা পূর্ণ করেছে। মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে জীবন মৃত্যুর যথার্থ স্বরূপ ও মৃত্যুর মহীয়ান রূপ তাঁর কাছে উদ্ভাসিত হয়েছে। এই উপলব্ধির আলোয় ব্যক্তি জীবনের গন্ডী ভেঙ্গে গেছে-অসম্পূর্ণ জীবন অনন্ত অসীমের সাযুজ্য লাভ করে পূর্ণতায় উপনীত হয়েছে। ভক্ত ও ভগবান, অসীম ও সসীম আজ সহসা তাঁর দৃষ্টি সম্মুখে একাকার হয়ে গেছে, আর -'এমন পবিত্র দৃশ্য দেখতে দেখতে আমার প্রাণ আনন্দে ভরে গেল। ধ্যানের মূর্তিটি এবং ধ্যানে নিরত মানুষটি-দু'জনকে একসঙ্গে দেখতে দেখতে আনন্দে আমার চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল।'

সূর্যসেনের 'শেষবাণী' মৃত্যুঞ্জয়ীর কণ্ঠ থেকে উদ্‌গীত মৃত্যুহীন, প্রাণের অমর ঘোষণা। জলন্ত দেশপ্রেম, বৈপ্লবিক নিষ্ঠা আর অনুগামীদের প্রতি বিজয়ী পূর্বসূরীর আবেদন এই বাণীতে অনুরণিত হয়েছে। 'শেষ বাণী' সূর্যসেনের বিপ্লবী আত্মার শেষ বিস্ফোরণ। বিপ্লবের জ্যোর্তিময় আলোয় দলীয় স্বার্থের কুহেলিকা দূর হয়ে যাবে এ তিনি বিশ্বাস করতেন, আরো বিশ্বাস করতেন সহস্র অমঙ্গল, নির্যাতন আর ক্লেশের মধ্য দিয়ে একদিন 'নতুন উষার স্বর্ণদ্বার' খুলবেই আর সে পথেই দেখা দেবে স্বাধীনতার নবারুণ। **The day of bondage is disappearing and the dawn of freedom is ushgered in. Be up and doing. Never be disappoited. Success sure. God bless you!'** (বিদায়বাণী) এ ছাড়াও ছিল সূর্যসেনের অর্ধ-সমাপ্ত 'আত্মজীবনী,' এবং কানুনগোপাড়া ও জ্যৈষ্ঠপুরা কেন্দ্রের বিপ্লবীদের হাতে-লেখা মাসিক পত্রিকা 'শক্তি'-তে প্রতি সংখ্যায় লাল কালিতে প্রথম পাতায় লেখা তাঁর রচনা 'জীবনালেখ্য', এবং ভারতীয় সাধারণতন্ত্র বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার রাজনৈতিক ঘোষণাপত্রসমূহ।

ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবের বিপ্লবী ঐতিহাসিক লিখেছেন- 'সূর্যসেনের দেহ রূপে একটুও জলুস ছিল না। বাইরে থেকে তিনি অতি সাধারণ। ছোট্ট শীর্ণ চেহারার মানুষ। তাঁর ব্যক্তিত্ব আছে বলেই বোঝা যায় না। কিন্তু দুটা চোখ! কী তীক্ষ্ণ, কী সুদূর প্রসারী ও অন্তর্ভেদী! অমিত শক্তির অধিকারী এই পুরুষ ভিতরে ভিতরে। দু'টি নয়ন দীপে সে শক্তির জ্যোতিচ্ছটা। এই শক্তি কিছু জন্মগত, কিছু অর্জিত। প্রতি মুহূর্তে তিনি আহরণ করেছেন এ শক্তি ছোট বড় নানা কর্মের মাধ্যমে। তাই ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত সূর্যসেন বিরাজ করতেন সবার গোচরে। যাঁরা তাঁর নিকট সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরা মুহূর্তে অগ্নিতাপ অনুভব করেছেন। ভস্মের জলুসহীনতা দেখে পিছিয়ে যাবার পূর্বেই তাঁর চরিত্রের অগ্নিজ্বালায় প্রজ্জ্বলিত হতে পেরেছে।' এ মন্তব্য যদি যথার্থ হয় তাঁর বহিপ্রকৃতি ও অন্তর প্রকৃতি সম্পর্কে তবে আমরা বলব সূর্যসেনের রচনাবলী সম্পর্কেও এই মন্তব্যটাই সত্য। তাঁর প্রতিটি রচনার ভাষা সহজ, সরল অথচ মর্মস্পর্শী ও বীরত্বব্যঞ্জক। এ যেন আত্মোৎসর্গের এক একটি বরুমন্ত্র। তাঁর ভাষায় আবেগ আছে, উচ্ছ্বাসও আছে, তবে তা অতি সংহত ও গভীর। কোমল ও কঠোরের এক অপূর্ব সমন্বয় তাঁর রচনা। যিনি একজন রুদ্র বিপ্লবী পুরুষ, অন্তরে তিনি কত কোমল, কত স্নিগ্ধ।

'ত্রিশের সশস্ত্র অভ্যুত্থান' গ্রন্থ থেকে

সূর্যসেন ঃ একটি মূল্যায়ন

স্বরূপ হাসান শাহীন

'এই প্রথম সিপাহী বাহিনী হত্যা করল তাদের ইউরোপীয় অফিসারদেরঃ মুসলমান ও হিন্দুরা তাদের পারস্পরিক বিদ্বেষ পরিহার করে মিলিত হয়েছে সাধারণ মনিবদের বিরুদ্ধে,' হিন্দুদের মধ্যে থেকে হাঙ্গামা শুরু হয়ে আসলে তা শেষ হয়েছে দিল্লীর সিংহাসনে এক মুসলমান সম্রাটকে বসিয়ে।'-কার্ল মার্কস [১]

মূল ঘটনা

১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল।

এ তারিখ রাতে ব্রিটিশ শক্তির দম্ভ চূর্ণ করা হবে। সূর্যসেনের নেতৃত্বে চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।---এই পরিকল্পনায় গণতন্ত্রী বাহিনী গঠিত হল। বাহিনীর প্রেসিডেন্ট সূর্যসেন। এর সামরিক বাহিনী পরিচালনার দায়িত্বে থাকছেন লোকনাথ বল, অম্বিকা চক্রবর্তী, নির্মল সেন, অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষ। প্রেসিডেন্টের নির্দেশে সকলে উপস্থিত।

রাত দশটা

যুগপথ আক্রমণ শুরু হয়ে গেল। টেলিফোনভবন আক্রমণ হল নির্ধারিত সময়ের পাঁচ মিনিট পুর্বে। এক্সচেঞ্জ বোর্ডটি হাতুড়ী মেরে ধ্বংস করা হল। আগুন ধরিয়ে দেয়া হল ভবনটিতে। পুলিশ লাইন ও এ, এফ আই হেডকোয়াটার দখল হল। লাইনচ্যুত হল মালবাহী ট্রেন। টেলিগ্রাফের তার কেটে দেয়া হল। বিলি হল বিপ্লবী প্রচারপত্র। বির্বিঘ্নে সব হয়েছে। বিপ্লবীদের সবাই অক্ষত।

ইংরেজদের জন্য দিনটি ছিল শোক দিবস-গুডফ্রাইডে। তাই তারা সেদিন রাতে মদ পান করতে ক্লাবে আসেনি। সেজন্য নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেল কয়েক শত ইংরেজ।

প্রাথমিক বিজয় সাধিত হল। সবদল মিলিত হলেন পুলিশ লাইনে। সবাই সজ্জিত হলেন পুলিশের মাস্কিটরি ও ব্যাগভর্ত্তি কাতুর্জ নিয়ে। ম্যাগজিন রাইফেলের ৩০৩ ব্যাসের টোটা পাওয়া যায়নি একটিও। সে কারণে সরকারী অস্ত্রাগারের সব রাইফেল হাতে পেয়েও বিপ্লবীরা কাজে লাগাতে পারেনি।--- ফলে অনেকখানি দমে গেল তারা। তার পরেও মাস্কিটরি সম্বল করে গণতন্ত্রী বিপ্লবী বাহিনী তাদের অভিযানে দৃঢ় সংকল্প।

এই সময় পুলিশ লাইনের অস্ত্রাগারে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগানোর সময় হিমাংশু সেন নামের একজন বিপ্লবী মারাত্মক ভাবে আহত হল। হিমাংশুকে চিকিৎসার জন্য তার বাড়িতে পৌঁছাতে নিয়ে গেলেন গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, মাখন ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্ত।

গণতন্ত্রী বিপ্লবী পার্টির চার জন যোদ্ধা আহত হিমাংশুকে রেখে সময় মত ফিরে আসতে পারলেন না। সূর্যসেন চিন্তিত হয়ে পড়লেন। হঠাৎ সিদ্ধান্ত দিলেন সূর্যসেন- এখন আমাদের ঘাঁটি হবে জালালাবাদ পাহাড়ে।

১৮ এপ্রিল রাতে জালালাবাদ পাহাড়ে ঘাঁটি তৈরীর কাজ সম্পন্ন হল বিপ্লবী গণতান্ত্রিক বাহিনীর। শেষ পযর্ন্ত ফিরে আসেনি বাহিনীর গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, মাখন ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্ত।

২২ এপ্রিল সরকারী বাহিনী গণতন্ত্রী বাহিনীকে আক্রমণ করে।--- পাল্টা আক্রমণ হয় বিপ্লবী বাহিনীর পক্ষ থেকে। মরণপণ যুদ্ধে বিপ্লবীদের তের জন শহীদ হন। সরকারী বাহিনীর নিহত চুয়াল্লিশ। আহত শতাধিক।---- একটানা চৌদ্দ ঘন্টা যুদ্ধের পর সর্বাধিনায়ক সূর্যসেন নিশ্চিত হলেন ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী পালিয়ে গেছে। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে। সূর্যসেন নির্দেশ দিলেন লোকনাথ বল ও নির্মল সেনকে- অস্ত্রশস্ত্র গুছিয়ে নাও, ঘাঁটি গুটাও।---১৮ এপ্রিল রাতে সরকারী বেসরকারী সকল ইংরেজ তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে কর্ণফূলী নদীর মোহনায় নোঙ্গরকৃত একটি জাহাজে আশ্রয় নিয়েছিল। [২]

কে এই সূর্যসেন

সূর্যসেন ছিলেন চট্টগ্রাম ন্যাশনাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক। মুক্ত ও স্বাধীন ভারত ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা। তাই তাঁর জীবনের রাজনীতি হয়ে উঠেছিল অনুসঙ্গ হিসেবে। যুক্ত হয়েছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের সাথে। নিজ কর্মদক্ষতায়, অল্প সময়ের মধ্যে কংগ্রেসের চট্টগ্রাম শাখার সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন। আবার 'অনুশীলন ও যুগান্তর' এর রাজনীতিও তাঁকে আকৃষ্ট করতো। একদিকে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির রাজনীতি অন্যদিকে সশস্ত্র অভ্যুত্থান- সমকালীন ব্রিটিশ ভারতের রাজনীতির এই দুই ধারার প্রতি তাঁর আনুগত্য ছিল। সেই নিমিত্তে '১৯১৯ সালে চট্টগ্রামের পাঁচজন বিপ্লবী যুবক নগেন সেন, অনুরূপ সেন, চারু বিকাশ দত্ত, অম্বিকা চক্রবর্তী ও সূর্যসেন মিলিত হয়েছিলেন বিপ্লবী সংঘ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে।'[৩] এই ভাবে দুই ধারাকে সমন্বিত করে এগিয়ে যেতে থাকেন সূর্যসেন। দীর্ঘ এগার বছর বিদেশী অপশাসনের নির্যাতন, কারাভোগ, নিজেদের মধ্যেকার ভাঙ্গাগড়া, অস্ত্র ও বোমা সংগ্রহ, প্রশিক্ষণ, অর্থ যোগাড়, অসীম সাহস, সংযম ও ধৈর্য, অমানুষিক কঠোর পরিশ্রমের পর সূর্যসেন এবং তাঁর পরিষদ চট্টগ্রাম থেকে উপনিবেশিক শক্তিতে বলপ্রয়োগে উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করলেন। সিদ্ধান্ত প্রয়োগে প্রাথমিকভাবে বিজয় হলেও শেষ পর্যন্ত প্রাসঙ্গিক কিছু ভুলের জন্য বিজিত শক্তিতে পরিণত। ফলে যুদ্ধের যা রীতি তাই হল। অধিনায়ক সূর্যসেন ও তাঁর সহযোদ্ধারা দণ্ডিত। কারো ফাঁসি, কারো যাবজ্জীবন, কারো দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড। কেউ বা বিনা বিচারে আটক দীর্ঘদিন।

কেন সূর্যসেন

ব্রিটিশ বিগত, পাকিস্তান অতীত, বাঙলাদেশ হয়েছে ২২ বছর। প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত। উপনিবেশ এখন আর প্রত্যক্ষ নয়, এই অবস্থায় সূর্যসেন এবং তাঁর কর্ম নতুন করে আলোচনার ভিত্তি কোথায়? ১৯৩০ সালের ১৮ থেকে ২২ এপ্রিল কালের প্রবাহে চৌষট্টি বছর পেছনে। তারপরও চট্টগ্রাম অভ্যুত্থান, সূর্যসেনের কর্মতৎপরতা আমাদের ভাবিত করে। কারণ-

১. আত্মপরিচয় ও ঐতিহ্য প্রেরণার সন্ধানে। ২. ইতিহাস চেতনার উদ্ভাবনে।

আত্মপরিচয় ও ঐতিহ্য প্রেরণার সন্ধানে সূর্যসেন

এককালের গ্রামের চাষাভুষা অন্ত্যজ বাঙালি আজ স্বাধীন রাষ্ট্রকাঠামোর বাঙালিতে রূপান্তরিত। তাই এই বিবর্তন উত্তরণ দীর্ঘকালের, বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে অগ্রসর। আজকের বাঙালিকে অনাগত ভবিষ্যত গড়তে অতীত অহঙ্কার তাকে উজ্জীবিত করবে। যত ক্ষুদ্রতর হোক না কেন, তার বীরত্ব, তার গৌরব, সাহসিকতা, উদারতা তার ঐতিহ্য তাকে সমৃদ্ধশালী করবে। ঐতিহ্য চেতনাসম্পন্ন জাতি বলিষ্ঠ জাতি হিসেবে কীর্তিত হয়। সূর্যসেন এবং তাঁর পরিষদ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে সশস্ত্র অভ্যুত্থান সংঘটিত করেছিলেন, যে বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন, যে সাহসিকতা, দক্ষতা আর রণকৌশলের পরিচয় দিয়েছিলেন, তা নিঃসন্দেহে বাঙালিকে স্বাধীনতা অর্জনের পথে উজ্জীবিত করেছে। আগামীতে যে কোন সংগ্রামে, রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে, সমাজ বদলের লড়াইয়ে সূর্যসেন হাজির হবেন - প্রেরণায়, চেতনায়, নিদর্শনে আর কালের প্রবাহে সূর্যসেন তাই অমলিন। এজন্যে আমাদের আত্মপরিচয়ে, ঐতিহ্যে, ঋদ্ধে, প্রেরণার উৎস- সূর্যসেন ও তাঁর কর্ম চিরন্তন বলেই বিবেচিত হবে।

ইতিহাসচেতনা উদ্ভাবনে সূর্যসেন

ইতিহাস সচেতনতা যে কোন জাতির ভাগ্য পরিবর্তনের সোপান। কারণ অতীতকে প্রভাবিত করার সাধ্য মানুষের নেই। বর্তমান তার নিজস্ব রূপ নিয়ে আমাদের সামনে এসেই পড়েছে। বাকী আছে কেবল ভবিষ্যৎ। সুতরাং একমাত্র ইতিহাসের আলোতে দাঁড়িয়েই ভবিষ্যৎ তৈরী করা যায়।

যারা ভবিষ্যতে বাংলাদেশে সফল সমাজবিপ্লব করতে প্রয়াসী তাদেরকে অবশ্যই সূর্যসেন, তাঁর দল এবং সেই দলের কার্যকলাপ সম্পর্কে জ্ঞাত হতে হবে। জানতে হবে-১৯৩০ সালের সেই ঐতিহাসিক ঘটনার গতি প্রকৃতি, ঘটনার অন্তর্নিহিত স্রোতধারা, ঘটনার অন্তরালের ঘটনা, আর এই অনুসন্ধানই আগামীতে সমাজ বিপ্লবের সঠিক পথ নির্ধারণের সহায়ক। এই আলোকেই সূর্যসেন আলোচিত এবং ইতিহাসের সাথে তাঁর সম্পর্ক।

অগ্রজনেরা ও সূর্যসেন

ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামে সূর্যসেন একমাত্র ও নিঃসঙ্গ নন। ফারাজী আন্দোলন (১৮১০ -১৮৩০), নীল আন্দোলন (১৮১৭- ৫৩), বুন্দেল খণ্ডের বিদ্রোহ (১৮২৫), গুজরাটের কোলি বিদ্রোহ (১৮৩৯-৪৫), ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের খাসী বিদ্রোহ (১৮২৯-৩৩), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫), সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭), নীলকর বিদ্রোহ (১৮৫৯-৬০), শিখদের কুকা বিদ্রোহ (১৮৬০-৭০), পাবনার কৃষক বিদ্রোহ (১৮৭৩), দাক্ষিণাত্যের কৃষক বিদ্রোহ (১৮৭৪), কেরালার কৃষক বিদ্রোহ (১৮৩৮-৮০), রাসবিহারী বসুর সশস্ত্র অভ্যুত্থান (২১ ফেব্রুয়ারী ১৯১৫), যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘা যতীন) প্রচেষ্টা ইত্যাকার আন্দোলন সংগ্রামের ভেতর দিয়ে ভারতীয় জনগণের আকাঙ্ক্ষা বার বার প্রকাশিত। এই আন্দোলনগুলোর মধ্যে একমাত্র সিপাহী বিদ্রোহই ইংরেজ শাসনকে শঙ্কিত ও বিব্রত করে তুলেছিল। পুরো উনিশ শতক ও বিশ শতকের প্রথম দশকে সংগঠিত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এসব আন্দোলন সংগ্রাম বিশ্লেষণ করলে যে বৈশিষ্ট্যসমূহ ধরা পড়ে-

১. আন্দোলনে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণ (রাসবিহারী ও বাঘা যতীনের কার্যক্রম ছাড়া)। ২. আন্দোলন সংগ্রামে অস্ত্রের ব্যবহার। ৩. প্রথম দিকের আন্দোলনে সফলতা ও পরে ব্যর্থতা। ৪. আন্দোলন হয়েছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চল ভিত্তিক (সিপাহী বিদ্রোহ ছাড়া)। ৫. আন্দোলনকারীদের মধ্যে পরস্পরের কোন প্রকার যোগাযোগ ও ঐক্য ছিল না। ৬. অঞ্চল ভিত্তিক বিভিন্ন ইস্যুতে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়ে পরে তা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে রূপান্তর। ৭. আন্দোলন ছিল অসাম্প্রদায়িক ও হিন্দুমুসলমানের যৌথ উদ্যোগে। ৮. এই আন্দোলন সমূহ ব্রিটিশ রাজধানী কলকাতাকে স্পর্শ করতে পারেনি।

এখন আমাদের দেখার বিষয় পূর্বসুরীদের এই আন্দোলন সংগ্রাম, যার ইতিহাস অনেকটাই ব্যর্থতার, তা থেকে সূর্যসেন কতটুকু শিক্ষা নিয়েছিলেন। ইতিহাস অভিজ্ঞতা তাঁকে কি পরিমাণ সমৃদ্ধ করেছে। কারণ পরাস্ত সৈন্যবাহিনীই শেখে ভালো।[৪]

এছাড়া উনিশ বিশ শতকে আন্তর্জাতিকভাবে সংগঠিত ১৮৭১ সালের প্যারী কমিউন, ১৯১৭ সালের রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব, ইতালী ও আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা সংগ্রাম, চীনের পরাধীনতা মুক্ততা যা সমকালের স্বদেশীদের কৌতূহলী করে তুলেছিল। আন্তর্জাতিক এইসব ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা সূর্যসেন মানসকে বিকশিত হতে কতটুকু সহায়তা করেছে তাও বিচার্য।

সূর্যসেন বিপ্লবী? সন্ত্রাসী?

সাম্রাজবাদের কাছে সন্ত্রাসী - স্বাধীনতাকামীদের কাছে বিপ্লবী। সূর্যসেন এই দুই বিশেষণে বিশেষিত।

বিপ্লবী

স্বাভাবিক নিয়মে সমাজ বিকাশের ধারাকে দ্রুততর করার জন্য ব্যাপক জনগোষ্ঠী বা সুনির্দিষ্ট শ্রেণীকে সংগঠিত করে জনগণ বা শ্রেণীর সাংস্কৃতিক চেতনার ন্যূনতম মান অনুধাবনে জোরপূর্বক তথা সশস্ত্র শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দ্রুত পরিবর্তন ঘটানোই বিপ্লব। এই বিপ্লব প্রক্রিয়ায় জড়িত কর্মীই বিপ্লবী।

সন্ত্রাসী

ব্যাপক জনগোষ্ঠী বা শ্রেণীকে সংগঠিত না করে জনগণ বা শ্রেণীর সাংস্কৃতিক চেতনার মানকে গুরুত্ব না দিয়ে সমাজ বিকাশের গতিকে দ্রুততর করার জন্য বল বা শক্তি প্রয়োগ করাকে সন্ত্রাস বলে। সন্ত্রাস-কাজে লিপ্তরাই সন্ত্রাসী।

বিপ্লব এবং সন্ত্রাসের মধ্যে যে পার্থক্য তা দশ, বিশ ও তিরিশ দশকে এত স্পষ্ট ছিল না। এই না থাকাটা ছিল কালের সীমাবদ্ধতা, যা থেকে এই সময়কার স্বাধীনতাকামীরা মুক্ত ছিলেন না। সূর্যসেন সম্পর্কে আলোচনায় এই কথাটি মনে রাখা বাঞ্ছনীয়।

সূর্যসেন ও গুপ্ত সমিতি

আগেই উল্লেখিত, সূর্যসেন অপশক্তির হাত থেকে মাতৃভুমিকে মুক্ত করার জন্যে গুপ্ত সমিতি গঠন করেছিলেন,এই গুপ্ত সমিতি তৎকালীন অনুশীলন বা যুগান্তর কারো নিয়ন্ত্রণে না থাকলেও এই সমিতি কলিকাতার যুগান্তর দলের সঙ্গে সহযোগিতা করত।[৫] এই দুটি সন্ত্রাসবাদী দল- অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর পার্টি শুধু মাত্র হিন্দুদের নিয়ে সংগঠিত হয়েছিল। সদস্যদের দলভুক্তির অন্যতম শর্ত গঙ্গায় অবগাহন করতে হবে। আর শক্তিমাতা কালীর প্রতি নিবেদিত হতে হবে।[৬] এই কারণে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে মুসলমানদের অংশগ্রহণ খুব অসুবিধাজনক। এবং সে সব দলের মধ্যে মুসলমানদের প্রবেশাধিকার ছিল না।[৭] কিন্তু সমকালীন সন্ত্রাসবাদী দলগুলোর এই আচরণবিধি সূর্যসেনের দলের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়না। আর সেজন্যে দলিল উদ্দিন,মীর আহমদ, আব্দুস সাত্তারের মত মুসলমানরা অনায়াসে তাঁর দলে স্থান পেয়েছিলেন।[৮] এছাড়াও তাঁর দলের সদস্যরা যে অসাম্প্রদায়িক চেতনার অধিকারী ছিলেন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ জালালাবাদ যুদ্ধে আহত অম্বিকা চক্রবর্তীর মতো ব্রাহ্মণ নিঃসংকোচে ও নির্দ্বিধায় আমজাদ আলী ও ফয়জুন্নেসার আতিথ্য ও সেবা শুশ্রূষা গ্রহণ করেছিলেন। সন্ত্রাসবাদী দলগুলো থেকে সূর্যসেন ও তাঁর দলের এই পার্থক্য অনুধাবনযোগ্য এবং নিঃসন্দেহে তা অগ্রসর চিন্তার পরিচায়ক যা সূর্যসেনকে একজন আদর্শ বিপ্লবী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে।

সূর্যসেন ও গুপ্তহত্যা

তত্ত্বগতভাবে সন্ত্রাসীদের উদ্দেশ্যই ছিল বোমাবাজী ও বুলেটের মাধ্যমে ব্রিটিশরাজের উচ্চপদস্থ আমলাদের খতম করা[৯] ১৯৩০ সালের পুর্বে সূর্যসেনের দলকর্তৃক দারোগা প্রফুল্লকে হত্যা করা ছাড়া আর কোন ঘটনার কথা আমাদের জানা নেই। এই পর্যায়ে সূর্যসেন ছিলেন অত্যন্ত সংযত ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন। গুপ্তহত্যা যে বিপ্লব নয়, এর মাধ্যমে যে বিদেশী শক্তিকে উৎখাত করা যাবে না, সূর্যসেন ছিলেন সে বিষয়ে নিশ্চিত। তাই ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত গুপ্ত সমিতি ১৯৩০ সাল পর্যন্ত মাত্র একটি ছাড়া আর কোন গুপ্তহত্যায় যায়নি।

১৯৩০ সালের (১৮থেকে ২২ এপ্রিল) সশস্ত্র অভ্যূত্থান এর দিন ইউরোপীয়ান ক্লাব, পরবর্তীতে পাহাড়তলী খেলার মাঠে আক্রমণ ও চাঁদপুর রেল স্টেশনে ক্রেগ হত্যা প্রচেষ্টা ইত্যাদি ঘটনা গুপ্তহত্যা ও সন্ত্রাসেরই নামান্তর।

সূর্যসেন ও তহবিল গঠন

সূর্যসেনের গুপ্তসমিতি তহবিল গঠনকল্পে ডাকাতির সিদ্ধান্ত নেয়।[১০] এবং এই সিদ্ধান্ত সমকালীন সন্ত্রাসবাদীদের কার্যক্রমেরই প্রভাব। এভাবে টাকা সংগ্রহ যে বিপজ্জনক, এতে যে সংগঠনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। জনগণের কাছে বিপ্লবীদের ভাবমূর্তির মুল্য অপরিসীম। যদিও সন্ত্রাসীরা বিষয়টিকে অত গুরুত্ব দিতে চায় না কিন্তু সূর্যসেন উপলব্ধি করেছিলেন এই পদ্ধতিতে অর্থসংগ্রহ সঠিক নয়। তাই তিনি এই পথ পরিত্যাগ করেছিলেন। সেজন্য রেলওয়ের টাকা লুণ্ঠিত হওয়ার পর চট্টগ্রামের বিপ্লবী দল তহবিল গঠনকল্পে আর ডাকাতি করেনি। সন্ত্রাসবাদের এই কাল-প্রবণতা পরিহারই সূর্যসেনকে বিপ্লবীর আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

সূর্যসেন ঃ রাষ্ট্রক্ষমতা ও কেন্দ্রবিন্দু

বহুবছর ধরে ভারতবর্ষের বিপ্লবী কার্যক্রম ডাকাতি ও খুনে সীমাবদ্ধ ছিল। সরকারী উচ্চ ইংরেজ কর্মচারী খুন করাই বিপ্লবীর কাজ বলে পরিগণিত ছিল। 'আমাদের মনে হল, প্রচলিত আন্দোলনের গতি ও তার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আবশ্যক। ক্ষমতা হস্তগত করাই সমস্ত বিপ্লবী কার্যের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। তদনুযায়ী আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম চট্টগ্রামকে স্বাধীন করে দেশের সামনে একটা আদর্শ স্থাপন করব।'[১১] লোকনাথ বলের এই বর্ণনা আমাদেরকে সূর্যসেন এবং তাঁর দলের মূল লক্ষ্যঃ (ক) রাষ্ট্রক্ষমতা দখল, (খ) সে নিমিত্তে কেন্দ্র হিসেবে চট্টগ্রাম দখল সম্পর্কে অবহিত করে।

যেকোন বিপ্লবের লক্ষ্য থাকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল। সেই আকাঙক্ষা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যেই বিপ্লবীদের সমস্ত কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। সেজন্য তারা তাদের প্রতিপক্ষের ক্ষতির কেন্দ্রবিন্দু নির্ধারণ করে। যেখানে আঘাত করলে রাষ্ট্রক্ষমতা পরিবর্তন হতে বাধ্য। ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী ছিল নয়া দিল্লী অর্থাৎ সে তার শক্তির কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে এই অঞ্চলকে সংহত করেছে। এই পর্যায়ে সূর্যসেনকে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে হলে অবশ্যই দিল্লীতে আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কিন্তু তিনি

তা না করে প্রস্তুতি নিলেন চট্টগ্রাম দখলের। শক্তির কেন্দ্রবিন্দুকে পরিহার করে অন্য অঞ্চল দখল করলেও যে টিকিয়ে রাখা যাবেনা বা পূর্বে যায়নি তা ইতিহাসই বলে দেয়। সূর্যসেনের সেই ইতিহাস অজানা থাকার কথা নয়। তাই ইংরেজ শক্তিকে উচ্ছেদ করে রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখলের আকাঙ্ক্ষা সূর্যসেনের বিপ্লবী মানস প্রবণতা, কিন্তু সে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু নির্ধারণে ব্যর্থতা তাঁর দলীয় শক্তির সীমাবদ্ধতা, যার ফলশ্রুতি তাঁকে সন্ত্রাসবাদীদের সমগোত্রীয় করে।

সূর্যসেন : অভ্যুত্থান ও সময়

'সময়' বিপ্লবে অনিবার্য ও অপরিহার্য। এই 'সময়' একদিকে সমাজের পরিবেশ পরিস্থিতিগত, অন্যদিকে যে বা যারা বিপ্লব করতে চায় তাদের প্রস্তুতিগত। তাই ইচ্ছে করলেই যে কোন সময়ে বিপ্লব করা যায় না। এজন্য দরকার হয় সঠিক মুহূর্তের। অপেক্ষায় থাকতে হয় যথার্থ সময়ের। তাই বিপ্লবের জন্য পরিস্থিতি অনুধাবন করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারাটাই একজন বিপ্লবীর পারঙ্গমতা। সূর্যসেন ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল, অভ্যুত্থানের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা ছিল যথার্থভাবে সময়োপযোগী। বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশী, অসহযোগ, খেলাফত, লবণ ও আইন অমান্য প্রভৃতি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন, আবার অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা, ক্ষুদিরামের ফাঁসি, বাঘা যতীনের মৃত্যু, রাসবিহারী বসুর ব্যর্থ অভ্যুত্থান -বিশ শতকের ইত্যাকার ঘটনায় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণকে স্বাধীনতাকামী করে তুলেছিল। সেই সময় স্বাধীনতার পক্ষে যে কোন আন্দোলনকে গ্রহণ করতে জনগণ ছিল প্রস্তুত। এ ছাড়া ১৯৩০ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে লবণ ও আইন অমান্য আন্দোলন জনগণের চেতনায় ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সুতীব্র হয়ে উঠেছিল। সে দিক থেকে সূর্যসেন নির্ধারিত ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সিদ্ধান্ত ছিল সঠিক।

এর পর সময়োপযোগী দলগত প্রস্তুতি। সূর্যসেন সারা ভারতব্যাপী না হলেও সমগ্র বাংলাদেশে যে বিপ্লবের ঝাণ্ডা উড়াতে চেয়েছিলেন তা সত্য। কিন্তু তিনি 'চট্টগ্রামের বিপ্লবী নেতাদের ছাড়া অন্য কোন জেলার বা কলিকাতার বিপ্লবী নেতাদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানে সামিল করতে পারেননি।'[১২] তখন নিজেরা পরামর্শ করে স্থির করলেন যে, কেউ যদি তাদের সঙ্গে যোগ না দেয় সূর্যসেনের নেতৃত্বেই এই জেলা সদরে সশস্ত্র অভ্যুত্থান করবে।[১৩] এবং এই বিজয় অভ্যুত্থান যে ক্ষণস্থায়ী হবে তা সূর্যসেন ও তাঁর পরিষদ জানতেন। তারপরও এই ঘটনার সৃষ্টির প্রধান কারণ- লোকনাথ বলের ভাষায়- 'চট্টগ্রামকে স্বাধীন করে দেশের সামনে একটা আদর্শ স্থাপন করব'। এ থেকে স্পষ্ট সূর্যসেন ও তাঁর পরিষদ সমগ্র বাঙলায় বিপ্লব করার জন্য নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে তৈরী করতে পারেননি।

সূর্যসেনের রণকৌশল ও অভিজ্ঞতা

যে বৃটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য কখনো অস্ত যেতনা- সূর্যসেন সেই বিশাল শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, যুদ্ধ একটি শিল্প বা আর্ট। শুধুমাত্র লোকবল বা সমরাস্ত্র দিয়ে যুদ্ধে জেতা যায় না। এর জন্য প্রয়োজন হয় বুদ্ধিমত্তা, রণকৌশল ও অভিজ্ঞতা, এই পর্যায়ে সূর্যসেনমানসকে সমৃদ্ধ করেছে ইটালীর বীর ম্যৎসিনি ও গ্যারিবল্ডি, আইরিশ বিপ্লবী মাইকেল কলিনস্, এমোন ডি ভেলেরার স্বদেশ প্রেমের বৈপ্লবিক নীতি ও কৌশল।[১৪] আইরিশ বিপ্লব সূর্যসেনকে এত অধিক প্রভাবিত করেছিল যে, তিনি 'আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি' এর নামানুসারে তাঁর দলের নামকরণ করেন- 'ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি।' এছাড়া ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল অভ্যুত্থানের প্রাক্কালে সূর্যসেন যে ইস্তেহার রচনা করেন তাও ছিল আইরিশ বিপ্লবের ম্যানিফেষ্টোর বঙ্গানুবাদ।[১৫] আইরিশ বিপ্লবীদের ন্যায় 'গুড ফ্রাইডে'কে সূর্যসেন চট্টগ্রাম সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দিন ধার্য করেছিলেন। এই অনুকরণকে অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতা বললে অত্যুক্তি হবে না। ইংরেজ উৎখাত করার সহজতম অভিজ্ঞতা স্বদেশেই ছিল। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ ইংরেজ শক্তিকে প্রায়ই কোণঠাসা করে ফেলেছিল। সে বিদ্রোহে সিপাহীরাই ছিল মুখ্য। সে বিদ্রোহ যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে ব্যর্থ হয়। তাতে কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না। সাম্রাজ্যবাদের মূলকেন্দ্র রাজধানী ছিল অনেক দূরে।

এই সিপাহী বিদ্রোহ কেন ব্যর্থ হলো, এর অন্তর্নিহিত শক্তি কি, দূর্বলতা কি, এসব জেনেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রণকৌশল নির্ধারণ করা সহজ হত। এছাড়া আরো যে সব আঞ্চলিক বিদ্রোহ বৃটিশ শক্তিকে বিব্রত করেছিল যেগুলোতে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল, সেসব ঘটনা সূর্যসেনকে অভিজ্ঞ হতে সাহায্য করেনি। বরং তিনি সমকালে চলমান যে সন্ত্রাসবাদ ছিল- তা আশ্রয় করে অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি জানতেন, বাঘা যতীন, রাসবিহারী এ পথে ব্যর্থ, তারপরও তিনি সে পথকে অনুসরণ করলেন। চিন্তায় মননে তিনি কালের গণ্ডিকে অতিক্রম করতে পারেন নি। প্রচণ্ড এক অপশক্তির বিরুদ্ধে, সৈন্য হিসাবে গড়ে তোলেন ছাত্র ও যুবসমাজকে, এদের উপর এত বেশী নির্ভর করলেন যে সমাজে তখন বিকাশমান শ্রমিক কৃষকশ্রেণী, সিপাহী, (লেনিন যাদেরকে উর্দী পরা কৃষক বলেছেন) তথা

ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণ তাঁর ধর্তব্যে আসেনি। তাই ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন-'আমাদের সমস্তই বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছিল ও কল্পনাপ্রবণ বাঙালির হস্তে তাহা তরিৎগতিতে অন্য রাস্তা ধরিল, দেশের তদানীন্তন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অভাব অভিযোগের সঙ্গে ভারতীয় বিপ্লববাদের সর্ম্পক বড়ই কম ছিল। আমাদের ন্যাশনালিজমও বিদেশ হইতে আমদানী এবং টেররিজমও বিদেশ হইতে আমদানী। সেজন্য জনসমাজ হইতে বিপ্লববাদ দূরে ছিল' [১৬]

সূর্যসেন পৌরহিত্য

পৌরহিত সূর্যসেন দু'ভাবে প্রকাশিত। ১. সম্পাদক সূর্যসেন। ২.প্রেসিডেন্ট সূর্যসেন।

সম্পাদক সূর্যসেন

সূর্যসেন ছিলেন জাতীয় কংগ্রেস চট্টগ্রাম শাখার সাধারণ সম্পাদক। নিয়মতান্ত্রিক ধারার রাজনীতিতে তাঁর অংশগ্রহণ ও কর্মতৎপরতা বিচার করলে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা ও দক্ষতা ছিল অপরিসীম। ১৯২০ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত আত্মগোপন ও কারাবাসের দিনগুলো বাদ দিয়ে, বাকী সময়গুলোতে চট্টগ্রামের প্রতিটি আন্দোলন, সংগ্রামকে অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেছেন সূর্যসেন। চট্টগ্রামে গান্ধীজী, আলী ভাই, সুরেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন এর আগমন উপলক্ষে সভা, অসহযোগ আন্দোলন, জাহাজ শ্রমিক ও নাবিকদের সংগ্রাম, আসাম চা বাগান শ্রমিকদের আন্দোলন, লবণ ও আইন অমান্য আন্দোলন- প্রত্যেকটি আন্দোলনে সূর্যসেন অপরিহার্য। গণরাজনীতির একজন সফল সেনাপতি হিসাবে সূর্যসেন প্রমাণ করেছেন তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, তরিৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সিদ্ধহস্ততা। দায়িত্ব পালনে আন্তরিক একনিষ্ঠ, কর্তব্য পালনে একাগ্র সূর্যসেন সম্পাদক হিসাবে তাঁর যোগ্যতা প্রমাণ করলেও গণরাজনীতি আত্মীকরণে অসম্পূর্ণ। নিয়মতান্ত্রিক ও গণরাজনীতির প্রধান যে ভিত্তি গণসম্পৃক্ততা ও গণভিত্তি,সূর্যসেন সে বিষয়ে অস্পষ্ট। তিনি কর্মীদের ভেতর যতটা সুপরিচিত ও জনপ্রিয় ছিলেন, জনগণের কাছে সেরূপ নন। এই গণসম্পৃক্ততার অভাবের ফলে প্রতিপক্ষ অতি সহজেই তাঁর সম্পর্কে অপবাদ প্রচারের সুবিধা পেয়েছিল। রেলওয়ের টাকা লুণ্ঠিত হওয়ার পর পুলিশ ও সাধারণ জনগণ দ্বারা ডাকাত হিসাবে ঘেরাও এবং তাড়া খাওয়ার সময় একজনও তাঁকে চিনতে পারল না। অথচ জাতীয় কংগ্রেস এর চট্টগ্রাম শাখার সাধারণ সম্পাদকের বেলায় তা হওয়ার কথা ছিলনা। জনগণ থেকে এই বিচ্ছিন্নতা সমকালে তাঁকে যেমন সন্ত্রাসগোত্রীয় করেছে আবার তাঁর মতো সেই সময়ে কোন সন্ত্রাসীকে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির সাথে জড়াতেও দেখা যায়নি। অর্থ্যৎ সূর্যসেন দ্বৈত সত্তায় এগিয়ে গেছেন।

প্রেসিডেন্ট সূর্যসেন

যোগ্যতার বিচারে ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির প্রেসিডেন্ট হিসাবে সূর্যসেন ছিলেন অতুলনীয়,'অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন।'[১৭] তাঁর অনমনীয় চারিত্রিক দৃঢ়তা, অদম্য সাহসিকতা, লক্ষ্যর্জনে সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা, কর্তব্য পালনে একনিষ্ঠতা, সহযোগীদের প্রতি আন্তরিকতা চট্টগ্রামের গুপ্ত সমিতিতে প্রাণের এবং আশার সঞ্চার করেছিল। পরিকল্পনায় তিনি যে অদ্বিতীয় ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়- রেলওয়ের টাকা ছিনতাই কালে। এত নিখুঁত হয়েছিল সেই ঘটনা- কর্তৃপক্ষ বুঝতেই পারেনি এই ঘটনা কারা ঘটিয়েছে। সংগঠন গোছানো ও গড়াতে তিনি ছিলেন অনন্য। এই কারণে চট্টগ্রামের গুপ্ত সমিতি ছিল- দেশের অন্য দুটি সমিতি থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্যের। অংকের শিক্ষক সূর্যসেন অর্থ বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ, তাই সমিতিতে ডাকাতির মাধ্যমে অর্থসংগ্রহ নিষিদ্ধ হয়েছিল। তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও সংযমের জন্য ১৯৩০ সালের পূর্বে মাত্র একটি খুন বা হত্যা সংগঠিত হয়। মোট কথা একজন আদর্শ সেনাপতি হিসাবে সূর্যসেন নিজেকে গড়ে তুলে এগিয়ে যাচ্ছিলেন ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিলের দিকে এবং এই দিন যেভাবে ঝটিকা আক্রমণ করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে পর্যুদস্ত করেছিলেন তা আগামীতে যে কোন সেনাপতির জন্য একান্ত শিক্ষণীয় বিষয়। এখানে সূর্যসেন যে কর্মদক্ষতা দেখিয়েছেন তা বিশ্বের আধুনিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যে কোন সেনাপতির সমতুল্য।

১৮ এপ্রিল সশস্ত্র অভ্যূথানে ত্রুটি সমূহ

১. সিদ্ধান্তানুযায়ী সঠিক সময়ে অভ্যুথান শুরু করা যায়নি। ২. অস্ত্র ও গোলাবারুদ এক জায়গায় থাকেনা- এই তথ্য অজানা। ৩. বন্দরের ওয়ারল্যাস ও অস্ত্রাগার দখলে আনা হয়নি। ৪. যুদ্ধ ময়দানের সকল পশ্চাৎভূমি অরক্ষিত রেখে, থানা সমূহ দখলে না রেখে শুধু পাহাড়তলী ও দামপাড়া অস্ত্রাগার দখল। ৫. চট্টগ্রাম রেল

ষ্টেশন দখল ও নিয়ন্ত্রণে না রেখে শুধুমাত্র রেল লাইন উপড়ানো। ৬. অভ্যুত্থানকারীর স্বল্পতা। ৭. যুদ্ধের প্রাথমিক বিজয়ের পর প্রতিপক্ষের উপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করে দ্রুত শহরমুখী না হওয়া। ৮. ডাক্তার ,খাদ্য ও পানীয় যুদ্ধে অপরিহার্য। অভ্যুত্থান সময়ে এসবের ব্যবস্থা না রাখা। ৯. অভ্যুত্থানে দূর্ব্বল গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক। ১০. অভ্যুত্থানকালে একই সময়ে সাম্রাজ্যবাদের গোয়েন্দা বিভাগ ও যুদ্ধের সাথে সম্ভাব্য জড়িত উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের আটক না করা। ১১. যুদ্ধের প্রাথমিক সাফল্যের পর সামরিক পোষাক ত্যাগ না করা। ১২. আহত সৈন্যকে রেখে আসতে প্রধান যোদ্ধাদের অন্যতম কয়েকজনকে পাঠানো। ১৩. দীর্ঘক্ষণ দামপাড়ায় অবস্থান করা। ১৪. প্রচার ও যোগাযোগের অব্যবস্থা। ১৫. ১৮ এপ্রিলের ঘটনার গতিপ্রকৃতি জেনে জনগণের মধ্যে মিশে না গিয়ে জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় নেয়া।

এরূপ আরো অনেক ছোট ছোট ভ্রান্তি সূর্যসেনের ভাগ্য নির্ধারণ করেছে।

সূর্যসেন ইতিহাসের মিশ্রিত নায়ক

পরাধীনতার হাত থেকে ভারতকে স্বাধীন করার সুতীব্র আকাঙক্ষায় প্রজ্বলিত একজন যোদ্ধা, যিনি বুকের যন্ত্রণাকে লাঘব করেছিলেন ফাঁসির মঞ্চে গিয়ে। সেই ফাঁসি মঞ্চের নায়ক সূর্যসেন- যাঁর মধ্যে একই সাথে যেমন বিপ্লবী গুণাগুণের সমাবেশ ঘটেছিল, তেমনি সাম্রাজ্যবাদীর সন্ত্রাস প্রতিরোধে সন্ত্রাসের পথও গ্রহণ করতে হয়েছিল। এই দ্বৈত সত্তা নিয়েই সূর্যসেন ইতিহাসের সন্তান।

তথ্য সূত্র

১. কার্ল মার্কসঃ প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ ১৮৫৭- ১৮৫৯ মস্কো। সং ১ম । পৃঃ ৪১
২. শ্রীভাস্করঃ ব্রিটিশত্রাস সূর্যসেন। ১ম প্রকাশ। জানুয়ারী। চট্টগ্রাম। পৃঃ ৫৫-৫৯
৩. পূর্বোক্ত। পূর্বোক্ত,পূর্বোক্ত,পৃঃ২৮
৪. ভঃ ইঃ লেলিন ঃ রচনা সংকলন-৪। মস্কো, পৃঃ ১৮
৫. পূর্ণেন্দু দস্তিদারঃস্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম, ২য় সং, ১৩৭৬ বাংলা, চট্টগ্রাম। পৃঃ ৪৭
৬. প্রেমেন আড্ডি ও ইবনে আজাদ ঃ বিভাগ পূর্ববাংলার রাজনীতি ও সমাজ। ঢাকা। সং- ১ম। পৃঃ ৫৫-৫৬।
৭. বি, বি মিশ্রঃ দি ইনডিয়ান মিডলক্লাস। কলকাতা। পৃঃ ৩৯৬।
৮. এই দলিলউদ্দিন সূর্যসেনের এত আস্থাভাজন ও বিশ্বস্ত ছিলেন যে রেলওয়ের লুণ্ঠিত টাকা তার মাধ্যমে কলকাতায় পৌছেছিল।
৯. প্রেমেন আড্ডি ও ইবনে আজাদঃ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৬
১০. পূর্ণেন্দু দস্তিদার ।ঃ পূর্বোক্ত। পৃঃ ৪৭।
১১. লোকনাথ বলঃ চট্টগ্রাম বিপ্লবের বহ্নিশিখা। চট্টগ্রাম। সং-১ম। পৃঃ ২১
১২. পূর্ণেন্দু দস্তিদারঃ পূর্বোক্ত। পূর্বোক্ত। পৃঃ১০২
১৩. পূর্ণেন্দু দস্তিদারঃ পূর্বোক্ত। পূর্বোক্ত। পৃঃ১০৩
১৪. শ্রীভাস্করঃ পূর্বোক্ত। পূর্বোক্ত। পৃঃ ২৮
১৫. ভূপেন্দ্র কুমার দত্তঃ চট্টগ্রামঃ বিপ্লবের বহ্নিশিখা, চট্টগ্রাম। পৃঃ২৭
১৬. ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তঃ ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম। ১ম খণ্ড, কলকাতা। পৃঃ৫৫
১৭. রমেশচন্দ্র মজুমদারঃ বাংলাদেশের ইতিহাস। চতুর্থ খণ্ড। কলকাতা সং- ২য়। পৃঃ২৮৮

জালালাবাদ ! জালালাবাদ !

রমেশ শীল

জালালাবাদ ! জালালাবাদ !
শহীদ খুনে রাঙ্গা তুমি জালালাবাদ ! জালালাবাদ !
দুশমন হঠাতে তব বক্ষমাঝে রুখিয়া দাঁড়াল বীরের দল,
অসীম প্রতাপে যায় বীরদাপে, সঞ্চারিয়া দেহে নবীন বল।
ভঙ্গ দিল ত্রাসিত শ্বেতাঙ্গ, টুটিল তাদের ধৈর্যের বাঁধ।
সূর্য উঠিল তূর্য নিনাদি, জ্যোতিষ্কমণ্ডল ভাতিল তায়,
হটিয়া গেল বিপক্ষ সেনানী, মনেতে গণিল পরমাদ।।
বাজিয়া উঠিল বিজয়ের ভেরী, দিগ্‌দিগন্ত উজালা,
অজুত কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিল বীর প্রসবিনী চট্টলা।
বীরের দেশে জনম লভেছি, পূর্ণ হয়েছে মনোসাধ!
শহীদ খুনে রাঙ্গা তুমি, জালালাবাদ ! জালালাবাদ !

অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা মৃত্যুকে কিভাবে দেখতেন?

গণেশ ঘোষ

ক্রুর অত্যাচারে নিপীড়িতা মাতা
চক্ষে অশ্রুরাশি কণ্ঠে কাতরতা,
ডাকি কহিলেন 'কেবা আছ কোথা,
আপনার প্রাণে ঘুচাইবে জননীর ব্যথা!'
যারা আগে ছিল পিছে যায় ত্রাসে,
সব ঠেলে এক যুবা আগে আসে,
বক্ষে হানে কর উচ্চে কহে বীর,
'মাতৃভূমি লাগি, আমি দিব শির।'

শত্রুর চর ছিল আশে পাশে,
শুনি সে ঘোষণা আগাইয়া আগে;
বিদ্রূপে কহে বাঁধিয়া যুবারে
মরিবারে চাহ মিলিবে অচিরে।

বিদেশী দস্যুরে কহিল তরুণ
তুলি উচ্চ শির মৃত্যু ভয়হীন,
'আমারে দেখাও মরণের ভয়,
মরণের ভয়ে আমি ভীত নই।'

পরদিন অস্পস্ট নবীন প্রভাতে,
সূর্য তখনো আসেনি ধরাতে,
ঘাতক আসিয়া কয় করাঘাতে,
'যেতে হবে এবে, এস মোর সাথে।'

বন্দী গভীর সুপ্তি মগনে
স্বপন দেখিছে, মধুর আননে
দেবী এক আসি
মৃদু মৃদু হাসি,
মুখ তুলি দেবী চাহে যুবা পানে।

বসিল দেবী শয্যার ধারে,
হাত বুলাইয়া দিলা শিরোপরে,
মুছাইয়া মুখ আপনার করে,
ঢালি দিলা স্নেহ সীমাহীন ধারে।

অঞ্চলে দেবী মুছায় বদন,
চুম্বনে সুধা ঢালে অনুক্ষণ;
আপন কণ্ঠের মালাখানি খুলি
বন্দীর গলে পরাইলা তুলি।

'কে গো, কে গো, দয়াময়ী
আসিলে হেথায়?' বন্দী শুধায়;
দেবী শুধু কয়, 'আজি মধুপ্রাতে হয়েছে সময়
এসেছি মৃত্যু বরিতে তোমায়।'

তিনি উঠে দাঁড়াবেন

কাশেম আদনান

ক – গোল ঘুরছে ঘুরছেই
দিনরাত, রাতদিন, দিনরাত,
কী দৈবে যোগ হয় অনন্ত
আলোক মানুষের গৃহে
মাটির কুটিরে, জতুগৃহে!

কোন মহাকাশ ফুঁড়ে উড়ে আসে
অদৃশ্য অচিন্ত্য আত্মার ঢেউ
নাকি মার্ক্সীয় জড়তার উৎকর্ষ উন্মীলন,
বাখান যাহাই করো বন্ধু, কমরেড,
কিছু কিছু সূর্য চিৎকার শুনেছে ঠিকই
কোন কোন বিশাল শিশুর।

এইসব ক্ষুণ্নিবৃত্তি, পিপাসা, কেবলই দেহবাদ
সব ছাপিয়ে ওঠে সহস্র বছরের মানবিক ডাক।
কী স্পর্ধা রাখে এ' শব্দমালা!
কবিতা সঞ্চিতা মানব ভাঁড়ারে –
উদরে নিতে পারে তেমন কীর্তিবয়ান?
তেমন স্ফীত বুক, দৃপ্ত শপথ, উত্থিত হাত
হৃদয়ের তেমন কল্লোল কবোষ্ণ উচ্ছ্বাস?

সকল কাগুজে সংলাপ মাড়িয়ে
জন্মান্তরের ইতিহাস পার হয়ে,
খ–গোলে মাথা রেখে তিনি ঠিক উঠে দাঁড়াবেন
মাটির মমতাশিশু, মানবমুকুট বীর সূর্যসেন।

বুড়ো সন্ত্রাসবাদী
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

আন্দামানের বনে তুমি ঘুমোওনি একরাশি বছর।
তোমার হৃদয়খানির পাথুরে দেশপ্রেমের সোনাকে
তোমারি চিন্তায় পুড়িয়ে খাঁটি করেছে মার্কস, লেনিন আর স্ট্যালিন।
চাটগাঁ থেকে তোমায় তাড়িয়ে দিয়েছে চাটগাঁর মালিক?
আগ্নেয়গিরির পুরানো খনি চাটগাঁ,
... পাহাড়ের বিস্ফোরণে ধরা পড়েছিল,
সোনায় ঠাসা সে খনি, ইস্পাতের মতো তীব্র সোনা।
চাটগাঁ থেকে তোমায় তাড়িয়ে দিয়েছে চাটগাঁর মালিক?
বেশ করেছে,
তাড়িয়ে দিয়েছে বলেই তো এবার
ওদের যে তাড়াতে হবে,
জগৎ থেকে,
এটা বুঝে তুমি,
মার্কস লেনিন স্ট্যালিনের
স্যাঙাৎ হয়েছো।

চট্টগ্রাম ঃ ১৯৪৩
সুকান্ত ভট্টাচার্য

ক্ষুধার্ত বাতাসে শুনি এখানে নিভৃত এক নাম—
চট্টগ্রামঃ বীর চট্টগ্রাম!
বিক্ষত বিধ্বস্ত দেহে অদ্ভুত নিঃশব্দ সহিষ্ণুতা
আমাদের স্নায়ুতে স্নায়ুতে
বিদ্যুৎপ্রবাহ আনে, আনে আজ চেতনার দিন!
চট্টগ্রামঃ বীর চট্টগ্রাম!
এখনো নিস্তব্ধ তুমি
তাই আজো পাশবিকতার
দুঃসহ মহড়া চলে,
তাই আজো শত্রুরা সাহসী।
জানি আমি তোমার হৃদয়ে
অজস্র ঔদার্য আছে; জানি আছে সুস্থ শালীনতা
জানি তুমি আঘাতে আঘাতে
এখনও স্তিমিত নও, জানি তুমি এখনো উদ্দাম—
হে চট্টগ্রাম!
তাই আজো মনে পড়ে রক্তাক্ত তোমাকে
সহস্র কাজের ফাঁকে মনে পড়ে শার্দূলের ঘুম
অরণ্যের স্বপ্ন চোখে, দাঁতে নখে প্রতিজ্ঞা কঠোর।
হে অভুক্ত ক্ষুধিত শ্বাপদ—
তোমার উদ্যত থাবা, সংঘবদ্ধ প্রতিটি নখর
এখনো হয় নি নিরাপদ।
দিগন্তে দিগন্তে তাই ধ্বনিত গর্জন
তুমি চাও শোণিতের স্বাদ—
যে স্বাদ জেনেছে স্তালিনগ্রাদ।
তোমার সংকল্পস্রোতে ভেসে যাবে লোহার গরাদ
এ তোমার নিশ্চিত বিশ্বাস।
তোমার প্রতিজ্ঞা তাই আমার প্রতিজ্ঞা, চট্টগ্রাম!
আমার হৃৎপিণ্ডে আজ তারি লাল স্বাক্ষর দিলাম।।

এখন যেমন বাংলাদেশ
মুর্তজা বশীর

এ লাশ পিতার নয়।
এ লাশ মাতার নয়
এ লাশ জায়ার নয়
এ লাশ পুত্রের নয়
এ লাশ কন্যার নয়

আত্মীয় কুটুম্ব
বা বন্ধু বান্ধব
কেউ নয়
কেউ নয়

গভীর আঁধার রাতে
জলোচ্ছ্বাসে ভেসে আসা
কৃষাণ—কৃষাণী নয়।
গহীন সমুদ্র জলে
ঘূর্ণিঝড়ে ডুবে ভাসা
মাঝিমাল্লা জেলে নয়।

অন্ধকার ঘড়িঘরে
চেরা বুক ও উদরে
এ লাশ বেওয়ারিশ লাশ।
যেমন এখন বাংলাদেশ।

এ লাশ আমার
এ লাশ তোমার

সেই সব স্বপ্ন
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কারাগারের ভিতরে পড়েছিল জ্যোৎস্না
বাইরে হাওয়া, বিষম হাওয়া, সেই হাওয়ায় নশ্বরতার গন্ধ
তবু ফাঁসির আগে দীনেশ গুপ্ত চিঠি লিখেছিল তার বউদিকেঃ
'আমি অমর, আমাকে মারিবার সাধ্য কাহারো নাই।'

মধ্যরাত্রি আর বেশী দেরী নেই
প্রহরের ঘন্টা বাজে, সান্ত্রীও ক্লান্ত হয়
শিয়রের কাছে এসে মৃত্যুও বিমর্ষ বোধ করে
কণ্ডেমন্‌ড সেলে বসে প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য লিখছেঃ
"মা, তোমার প্রদ্যোৎ কি কখনো মরতে পারে?
আজ চারিদিকে চেয়ে দ্যাখো
লক্ষ 'প্রদ্যোৎ তোমার দিকে চেয়ে হাসছে-
অমি বেঁচেই রইলাম মা, অক্ষয়....

কেউ জানতো না সে কোথায়
বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল ছেলেটি, আর ফেরেনি
জানা গেল, দেশকে ভালোবাসার জন্য সে পেয়েছে মৃত্যুদণ্ড
শেষ মুহূর্তের আগে পোস্টকার্ডে ভবানী ভট্টাচার্য
অতি দ্রুত লিখেছিল ছোট ভাইকেঃ
'অমাবস্যার শ্মশানে ভীরু ভয় পায়-
সাধক সেখানে সিদ্ধিলাভ করে
আজ আমি বেশী কথা লিখবোনা
শুধু ভাববো, মৃত্যু কত সুন্দর।'
লোহার শিকের ওপর হাত
তিনি তাকিয়ে আছেন অন্ধকারের দিকে
দৃষ্টি ভেদ করে যায় দেয়াল, অন্ধকারও বাঙময় হয়

সূর্য সেন পাঠালেন তাঁর শেষ বাণীঃ
'আমি তোমাদের জন্য কী রেখে গেলাম?
শুধু একটি মাত্র জিনিস,
আমার স্বপ্ন- একটি সোনালি স্বপ্ন
এক শুভ মুহূর্তে আমি প্রথম এই স্বপ্ন দেখেছিলাম!'

দধীচি সরণি
মণীন্দ্র রায়

যে নাম এখনো লাখো মানব-হৃদয়ে
প্রজন্মে প্রজন্মে দৃপ্ত ধ্বনি প্রতিধ্বনি,
যে নাম ফাঁসিমঞ্চে আত্মদানে হয়েছে অমর,
যে নাম নির্জিত প্রাণে নির্ভয়ের তোলে কণ্ঠস্বর,
সেই সূর্য আজো দেখি খোলে প্রাণে দধীচি সরণি।

মাস্টারদার ঘ্রাণ
আহমদ খালেদ কায়সার

শব্দের কি ঘ্রাণ থাকে? শব্দের কি প্রাণ থাকে?

তা না হলে মুক্তি এই একটি শব্দের কাছে
এতো লোক কেন জমা হয়?
কেন জড়ো হয় এতো স্বপ্ন?
মনের ভেতর থেকে ফুঁসে ওঠে জড়তার বন্দী স্পৃহা।

বিদ্রোহ শব্দ হয়ে যায় বড়ো সংক্রামক,
মন্ত্রমুগ্ধ যৌবন ওঠে নড়ে চড়ে,
সাহস বিস্তৃত হয়, আশংকার প্রতিধ্বনি
বধির হয়ে ওঠে
মৃত্যুকেও মনে হয় বড়ো নিরুপদ্রব আর সহজ।

কতো শব্দ এসে শিরায় শিরায় জ্বালায় অগ্নি,
ভয়গুলো চলে যায় ঘুমের জঙ্গলে।

ওঠে খোঁজ বিপ্লবের।

তরুণ মিছিল হয়ে যায় তরুণতর,
ভাসে সেই ঘ্রাণ, গন্ধে গন্ধে চলে আসে মুক্তির শরীরে

মাস্টারদা, আপনার মতো আমরাও
সেসব শব্দের কাছে গেলে
আপনার ঘ্রাণ খুঁজে পাই খুঁজে পাই প্রাণ,
নতজানু জীবনের কাছে নত হইনা বলে।

মাস্টারদার হাতঘড়ি
শামসুর রাহমান

মাস্টারদা, আপনি কি ঘাতঘড়ি পরতেন কখনো? জানি না,
এই প্রশ্ন কেন আমার সঙ্গে কাঠঠোকরার মতো আচরণ
করেছে আনেকবার। মাস্টারদা, আপনার বিষয়ে
অনেক কিছুই জানা আছে আমার।
আপনার শরীরের গড়ন, মূল্যবান রত্নের মতো
চোখে দীপ্তি জীবন–যাপনের
ধরন – এ রকম
বহুবিধ খুঁটিনাটির আলো আমি পেয়েছি
গ্রন্থের কালো অক্ষরের মধ্যে ভ্রমণ করতে করতে।

কিন্তু মাস্টারদা, আপনি কখনো
হাতঘড়ি পরতেন কিনা আজ অব্দি আমার জানা হয়নি।
তবে আপনি যে মাঝে–মধ্যে ঘড়ির দিকে
তাকাতেন, তা ধরে নেয়া যেতে পারে।
যিনি নিজে সময়কে শাসন করেন,
সময়ের শাসনও তাকে মেনে নিতে হয়
কখনো সখনো। যখন আপনি পিস্তলের
ট্রিগার টিপেছেন কিংবা মেতেছেন
গোরা সেনাদের অস্ত্রাগার দখলে
অথবা পায়চারি করেছেন চট্টগ্রাম জেলের
নীরন্ধ্র সেলের ভেতরে,
তখন সময়ের ধ্বনির প্রতি আপনি কি
উদাসীন ছিলেন?

মাস্টারদা, সেই যে মাঝে মাঝে
আপনার কণ্ঠে উচ্চারিত হতো একগুচ্ছ শব্দ,
সেই অনুসারে আপনি নিজে
চোখেও শুনতেন, কানেও দেখতেন।
ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, বীর আশফাক উল্লাহ, অপরূপ
অগ্নিবলয়ের মতো এক মহামাল্যের মনিরত্ন–
ওদের ঝলকানিতে গান গেয়ে উঠতো
আপনার চেতনা, যখন আপনি বসে থাকতেন
চুপচাপ, নীল নকশা আঁকতেন প্রতিরোধের
কিংবা সহযাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করতেন
সামনে পা চালিয়ে যাওয়ার জন্যে।

মাস্টারদা, যখন আপনার মাথার ওপর
ঝুলছিলো ফাঁসির দড়ি, তখন
আপনার ঋজু মেরুদণ্ড কি শিরশিরিয়ে উঠেছিলো
শীতার্ত ডালের মতো? আপনার হৃৎপিণ্ডের
স্পন্দন কি থেমে গিয়েছিলো
ক্ষণিকের জন্যে? মাস্টারদা, আপনার
ব্যক্তিগত মৃত্যু এক লহমায়
হয়ে উঠেছিলো বিপুল জনগোষ্ঠীর যুগপৎ
মৃত্যু এবং জীবন।

মাস্টারদা, আপনি কখনো
হাতঘড়ি পরতেন কি না জানি না; জানবার
প্রয়োজনও নেই তেমন। অমরতা
জ্যোতির্বলয়ের মতো রাখি পরিয়ে দিয়েছে
আপনার কব্জিতে।

আপনার হাত সূর্যোদয়ের প্রসন্নতা নিয়ে
প্রসারিত হয়ে আছে সেই বিশাল ভূখণ্ডের দিকে,
ভাবীকাল যার ডাক নাম।
এবং একটি অলৌকিক হাতঘড়ি যা আপনি
হয়তো পরেননি, অথচ আপনরারই নামাঙ্কিত
ক্রমাগত বেজে চলেছে
আমাদের হৃৎপিণ্ডে, অনন্তের রৌদ্র–নিঃসীম ঝালরে।

আর এক মুক্তিযুদ্ধের অপেক্ষায়
হেমেন্দু বিকাশ চৌধুরী

এই শীতের সকালে ঘাসের ডগায় রক্ত
কালো ধোঁয়ায় মুখ ঢেকেছে সোনালী আকাশ
কে বা কারা আজ মেতেছে নরমেধ যজ্ঞে
দুহাতে লাল রক্ত মেখে কাদের উল্লাস
ভেঙে দিচ্ছে আকাশের নীল স্তব্ধতা!

এখানে আজ এত মৃতের মিছিল
লাল রক্তে ভরে গেছে সবুজ প্রান্তর
মুখ থুবড়ে পড়ে আছে বেকার যুবকের বুলেটবিদ্ধ দেহ
বুক থেকে বুলেট বের করে নিয়ে
কে শোনাবে আজ মুক্তিযুদ্ধের গান?

উন্নত হাত
নির্মলেন্দু গুণ

আগুন লেগেছে রক্তে মাটির গ্লোবে।
যুবক গ্রীষ্মে ফাল্গুন পলাতক,
পলিমাখা চাঁদ মিছিলে চন্দ্রহার।
উদ্ধত পথে উন্নত হাত ডাকে,
সূর্য ভেঙেছে অশ্লীল কারাগার।

প্রতীক সূর্যে ব্যাকুল অগ্নি জ্বলে,
সাম্যবাদের গর্বিত কোলাহলে
আগুন লেগেছে রক্তে মাটির গ্লোবে।

রক্তক্ষরণে সলিল সমাধি কার?
মানুষের মুখে গোলাপের স্বরলিপি
মৃত্যু এনেছে নির্মম দেবতার।
পুরোভাগে হাঁটে মুক্ত ভূমণ্ডল,
আগুন লেগেছে রক্তে মাটির গ্লোবে।

মানুষের হাতে হত্যার অধিকার?
পুষ্পের নিচে নিহত শিশুর শব,
গোরস্থানেও ফসফরাসের আলো।
অর্জুন সবে স্বপ্নের সম্ভবে।
আগুন লেগেছে রক্তে মাটির গ্লোবে।

প্রেরণার মতো জ্বলজ্বলে
নাসির আহ্‌মেদ

'স্বাধীনতা'—এই একটি অমোঘ শব্দ
আমাদের খরা—দগ্ধ বিরান ভূমিতে
বুনে দিয়েছিলে তুমি।
সেই শব্দের বীজ থেকে থোকা থোকা
ফসল ফলেছে, রক্তবীজের সোনালি ফসল
আমাদের এই মুক্ত স্বদেশ।

মুক্তির সেই মিছিলের পুরোভাগে
তুমি দাঁড়ানোর আগে
ঐক্য বলতে কিছুই ছিলনা আমাদের জানা—
সেই দিন থেকে আমরা সম্মিলিত।
ফাঁসির রজ্জু পুষ্পমাল্য করে
তুমি পরেছিলে বলে
তার চেয়ে কোনো মহৎ পুষ্পমাল্য
আমরা চিনি না।

উদাত্ত তোমার কণ্ঠস্বর ছাড়া
আমাদের কোনো তরঙ্গক্ষুব্ধ সাগর ছিল না।
তোমার দু'চোখ ছাড়া
আমাদের কোনো সার্বভৌম আকাশ ছিল না;
তোমার চুলের অবাধ্য ওই উড়ন্ত পতাকা ছাড়া
আমাদের কোনো জাতীয় পতাকা কখনো ছিল না।

রক্তে তোমার জ্বেলেছিলে যে আগুন
হে প্রমিথিউস! তার আগে কোনো অগ্নি দেখিনি।
সেই অগ্নিতে আমরা জ্বেলেছি
অন্ধকারের বিরুদ্ধে লাল শিখা।
ছোপ ছোপ লাল রক্তসিক্ত আগুন রঙের পথ
শতাব্দী ব্যাপী পাড়ি দিতে পারি
প্রেরণার মতো জ্বলজ্বলে তুমি
স্মৃতিতে রয়েছো বলে।

সূর্যসেন স্মরণে
মারুফ রায়হান

জলদি করো জল্লাদ, লোকটাকে লটকে দাও
ওর পরিচয় জেনে তোমার কী দরকার, কী লাভ
রাষ্ট্রের চোখে সে মস্ত অপরাধী, অর্থাৎ কিনা দেশদ্রোহী
জেলের বাইরে যতোই গর্জাক বন্দে মাতরম্‌, ছুটুক হররা
পাবে না রেহাই সে ব্রিটিশ—রাজের ফাঁসীর রজ্জু থেকে
আহ্‌, আর দেরী কোরো না জল্লাদ, জলদি লটকাও

(জল্লাদ, জানতে পাবে পরে সে হলো দেশপ্রেমিক সূর্যসন্তান
কালো কাপড় সরালেই চোখ দেখে তুমি চিনবে তাকে
তখন কি পারবে ঝোলাতে মাষ্টারদা'কে
মনে পড়বে চট্টগ্রামের কথা, অসমাপ্ত স্বপ্নের কথা
নমিত—মস্তক জীবনকে বদলে ফেলার ইচ্ছে জেগে উঠবে
সরকারী কাজে ভুল হবে, বড় ক্ষতি হয়ে যাবে
জলদি করো জল্লাদ, লোকটাকে লটকে দাও
আহ্‌ আর দেরী কোরো না, জলদি লটকাও

সূর্য বসলে পাটে
তরুণ সান্যাল

মধ্যরাতে আকাশ থেকে চাঁদ খসেছে আর
তারারা দলছুট
ঝাঁকড়া–মাথা বনবাদাড় রক্ত দাঁতে নখে
পাহাড়–টিলা লুঠ

কে তোমরা কও স্বপ্ন মরছে রক্ত ঝরছে বলে
স্বপ্ন সেকি মরে
এক মহলা ভেঙে পড়লেও দশ মহলা বাড়ী
মনের মধ্যে গড়ে

আর কিছু নয় সভ্যতা না গাছ–গাছালি নদী
সঙ্গী হয়ে হাঁটে
মিথ্যামিথ্যি ভয় দেখাচ্ছ ভয় পাইনি মোটেই
সূর্য বসলে পাটে

ঐ তো নীলে শাম্পান যায় ঐ তো মেঘে পাল
ঐ পারে এক দেশ
নীল–সমুদ্র পাহাড়–ঝর্ণা জুম চাষে বিষ শিকড়
যাজ্ঞসেনীর কেশ

আমি তোমাকে ভালোবেসেছি আমি তোমারও আপন
আমারও কথা বলা
জালালাবাদে শিখিয়েছিলে শেখালে ধূমঘাটে
জননী চট্টলা।

দুঃখ ও সূর্যসেন
আবদেল মাননান

কোন ভরসার ফাঁদ তোমাকে নিঃসঙ্গ করেছে
নিজের বিরুদ্ধে যারা যায় অর্থমূল্যে সবটুকু বেচে

প্রাচীন যন্ত্রণার কাঁটা ওদের রক্তাক্ত করেনা
হারানো কীর্তির ছায়ায় নিজেকেও ঠেকে অচেনা

সেই ঘুম মৃত্যুবৎ–স্বপ্নে যার থাকে না কোনো ধ্যান
আত্মসমর্পণের সঙ্গে যুদ্ধমান কবির দুঃখ ও সূর্যসেন।

মাস্টারদা
মহাদেব সাহা

যখনই বুকের মধ্যে ঝলসে ওঠে সেই নাম
অন্ধকার নির্জন গুহায় যেন অকস্মাৎ আলো এসে
পড়ে, শুনি পাহাড়ী ঝর্ণার কলধ্বনি; প্রবল
উদ্দাম ঝড় যেন মুহূর্তে উড়িয়ে নেয় ভীরুতার গ্লানি।
সূর্যসেন এই নাম প্রকৃতই ধারণ করে
সূর্যের অমিত তেজ, কখনো যায় না তাকে বাঁধা
স্বার্থ, লোভ, ক্ষুদ্রতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে,
সূর্যের মতোই নিয়ত ভাস্বর তিনি মাস্টারদা সূর্যসেন;
যার বুকে স্বাধীনতা এই তুমুল শব্দটি
অবিরাম অনিঃশেষ সঙ্গীতের মতো বেজে যায়,
ভোরের রক্তিম আকাশের মতো স্বাধীনতা যার বুকে
শোভা পেতে থাকে; অসম্ভব রঙিন গোলাপ হয়ে
ফুঠে ওঠে যার বুকে এই স্বাধীনতা, সহস্র নদীর
কলতানে ভরা থাকে যার বিপ্লবী হৃদয়।
এখনো যখনই এই স্বপ্ন আর স্বাধীনতা শব্দগুলি
উচ্চারণ করি, কখন অজান্তে আমার সন্মুখে এসে
দাঁড়ান এই বিপ্লবী বাঙালী; দেখি তার সাহস–বিস্তৃত
বক্ষপট, গভীর উজ্জ্বল দু'টি চোখ; স্বপ্ন আর
স্বাধীনতা বলতেই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মুখ
হয়ে যায় মাস্টারদা সূর্যসেন, হয়ে যায়
অমর মুজিব, স্বাধীনতা, রক্তিম গোলাপ।

হিমযুগে
ওমর কায়সার

চোখ মুদে আসে ঠাণ্ডা হাওয়ায়
বরফের বোরকা পরা–এটা একটা সময়
যখন স্থির দীঘির জলে বালকের হাজার ঢিলেও
কোন তরঙ্গ ওঠেনা,
কূপ মণ্ডুক ব্যাঙদের যেন কিছু যায় আসে না।

এটা একটা সময়, এ সময় তিনি আসলেন
কবন্ধ বৃক্ষ আর পাণ্ডুর পাতাদের
শ্মশানে নিয়ে গিয়ে তাদের মুখাগ্নি করলেন
প্রতিটি হিমযুগে তিনি
আলোর অধিক কিছু এরকম আলো জ্বালাবেন।

টেগ্‌রা বল
দিলওয়ার

সচকিত অন্ধকার, আসে এক আগ্নেয় গোলক
অতিক্রম করে যায় মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টির সীমানা,
এ–গোলক তারুণ্যের নির্বিদার শক্তির নিশানা,
দীপ্তিমান ইতিবৃত্ত ধ্রুবসত্যে সংগ্রামী ঝলক।

পাহাড় জালালাবাদ স্নান সেরে বঙ্গোপসাগরে
তোলে শির ঊর্ধলোকে। ক্লাইভের বংশধরগণ
শোণিতে অজ্ঞাতসারে অনুভব করে ভূকম্পন,

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার! বুকে তার সূর্যরশ্মি ঝরে!

মানুষের স্বাধীনতা নিসর্গের অস্তিত্বের সার,
এ–সত্যে প্রত্যয়ী তারা সেই দিন যুদ্ধ করেছিলো,
পাহাড় জালালাবাদে নক্ষত্রসত্তায় ঝরেছিলো,

একুশে ও একাত্তুরে পেয়েছি তাদেরি অঙ্গীকার!

মুক্ত বাংলাদেশ চায়, মৃত্যুকে বিজিত করা বল,
জনসমুদ্রের বুকে দুর্নিবার প্রাণের কল্লোল।

সূর্যসেনের ঋণশোধ
খুরশীদ আনোয়ার

পক্ষিরথে ইন্দ্র কিংবা
আগামেমনন যে অশ্বরথে চড়তেন
ওটা ওরকম ছিলনা
হয়তো কোনো টাট্টু কিংবা আরব্য জাতের–
তুমি এবঙ তারকেশ্বর
অবরুদ্ধ লোহার কফিনে
পতেঙ্গার দিকে
সাগর শৈবালের দিকে
এক লক্ষ টন পাথর চাপায়
এখন তোমরা বুঝি বাঙলার রঙিন
ক্রীড়নক রঙধনু মাছের পিরিতে

সেদিন বিকেলে আমি আকাশ মুখো
কার হাত দেখলামঃ জলসিক্ত মেটালিক রাইফেল!
সফেদ ত্বকের লোক নেই
বাঙলার তেপান্তরে ....
মহেন্দ্র বিশ্বাসের উঠোনে
রাজাকার–বৃক্ষ ছুঁয়ে আছে দিগন্তের রেখা
আমাদের আস্তিনের ভাঁজ থেকে
নেত্র সেনের চেয়েও বিষধর সাপ
লাফ দিয়ে নামে
বৃদ্ধ মৌলবাদী বাঙলার মাটিতে পুঁতে
সাম্প্রদায়িক রোয়া

পিতা,
জালালাবাদ থেকে ধলঘাটের সবুজে
কৃষ্ণচূড়ার সব ক'টি ডাল পালা
নক্ষত্রদের শুভ্রতা ছোঁবার কথা,
অথচ আমাদের পাড়ার হৃষিকেশ কাকা
রাত নাববার আগে সীমান্তের দিকে
পা বাড়ান সাত পুরুষের ভিটে ছেড়ে........

পাহাড় জালালাবাদ
ত্রিদিব দস্তিদার

পাহাড়ের উর্দ্ধে ছিল সেদিনের হাত
যেন স্বদেশী পতাকা
সূর্য ছিল মাথার ওপর
কোন প্রত্যাশার প্রেমে লাল
রঙে ছিল বারুদের ঘন–কালো আভার বিস্তার
প্রবাহিত বিপ্লবের স্রোতস্বিনী বিশ্বাস
আজও আছে সে পাহাড় জালালাবাদের নাম।

কারা এসেছিল এ পাহাড়ে?
কারা গেয়েছিল গান, মাস্টারদা
– না ক্ষুদিরাম?

সাক্ষী রেখে রক্ত–ঝর্ণা
সঠান দাঁড়িয়ে পাহাড়
একে একে দেখেছিল কামানের ক্ষত
আর মানুষের লাশ
এ সবের রাজসাক্ষী আজ কে দেবে আমাদের
– পাহাড়, সময়, না বৃটিশরাজ?

অমর দ্রোহের হৃদয় শাপলার মতো ফুটে আছে জলে ও মানুষে

ফাউজুল কবির

আমি যাবো। কেউ না এলেও যাবো, কেউ না গেলেও যাবো।
এই কথা বলেছিলো একদিন এদেশের তুখোড় রক্তজবা সময়
এই কথা এখনো প্রতিদিন উচ্চারণ করে প্রিয় মৃত্তিকার স্মৃতিমুখ
জালালাবাদের দুর্বিনীত ঘাস, আমাদের একান্ত পিতৃভূমি চট্টগ্রাম।
এ এক আশ্চর্য দেশ, পৃথিবীর সব পাখী রাত্রির অন্ধকার মেনে
দু'চোখে যখন রোপণ করে ক্লান্তি ও হতাশার নির্বন্ধ ঘুম
তখনো দু'একটি পাখী এখানে সূর্যকে বুকে ধরে রাখে, অন্ধ সময়
ভাঙার পেরেক ঠুকে যায় রাত্রির দেহে।

কিছু কিছু সময় আছে দারুণ তেজী তুর্কী ঘোড়ার টগবগ সহোদর
তীর মেরে তীর ধরতে চায়, ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের সংসারী খাতা মেলে
যাবো কি যাবো না ভাবনার হিসাব—নিকাশের সুযোগ থাকে না।
কিছু কিছু সময় আছে খুব ক্ষ্যাপা আবেগে ভালোবাসায় একাকার
প্রচণ্ড তৃষ্ণায়ও জলের জন্য অপেক্ষা করে না
বিরুদ্ধ হাওয়ায় হাঁটতে থাকে দুরন্ত সাহসে
বুকের ভেতরে বীরশ্রেষ্ঠ হয়ে উঠে সিদ্ধান্ত।
কিছু কিছু সময় আছে অপেক্ষার চেয়ে চরম উপেক্ষা মহৎ
কিছু কিছু সময় আছে একাই বহন করতে হয় অনেকের পতাকা
একাকী জ্বলতে হয় অথবা জ্বালাতে হয় আঁধার ঘাতক মশাল
কিছু কিছু সময় আছে কেউ না এলেও না গেলেও যেতে হয় দুর্দান্ত একা।

আমি যাবো। কেউ না এলেও যাবো, কেউ না গেলেও যাবো।
মখমল সময়ের জন্য আমি কোনো প্রার্থনা জানাবো না
আমি মৌসুমী বৃষ্টির জন্য দাঁড়াবো না, সুকান্ত রৌদ্রের জন্যও না
যেতে যেতে আমার বন্ধু হবে বন্ধুর পথ সঙ্গী হবে প্রস্তুতি পর্ব
কিছু কিছু সময় আছে এমন অমোঘ, প্রস্তুত হয়ে প্রস্তুতি চলে না
কিছু কিছু সময় আছে রজনীগন্ধা আর শ্বেতচাঁপার চমৎকার
বনেদী সুনামের গল্প শোনার সাধু—সন্ত—ভক্ত অবসর মেলে না।
কিছু কিছু সময় আছে চিরস্থায়ী বিচ্ছেদের নিশ্চিত চিত্রকল্প এঁকে
সমগ্র সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয় নিশ্চিত উৎসর্গে একা
কিছু কিছু সময় আছে হিমালয়কে বলতে হয়, নত হও, নতজানু
কিছু কিছু সময় আছে অন্ধকারকে বলতে হয়, সূর্যের পথে হাঁটো
কিছু কিছু সময় আছে গড়েপিটে ধারাল করতে হয় নিজস্ব কামারশালায়
কিছু কিছু সময় আছে বলতে হয়, এই নাও সম্পূর্ণ জীবন বিনিময়ে স্বাধীনতা।

আমি জানি সময়ের মতো নামেরও মোহন মহিমা আছে
স্মৃতি আঁকে স্মৃতি জাগে ছবি লেখায়
হৃদয়ে ঝলক মেরে উঠে পৃথিবীর তাবৎ আগুন অবিনাশী হলকা;
আমি যাবো, আমাদের যেতে হবে, সেঁকে নিতে হবে শীতের শরীর
এখনো এখানে এই বাংলাদেশে সূর্যসেন—প্রীতিলতার জ্বালানো আগুন
অমর দ্রোহের হৃদয় শাপলার মতো ফুটে আছে জলে ও মানুষে।

সূর্যসেনের আত্মার তর্পণ

প্রণয় মজুমদার

বিক্রমাংশুর অপর নাম বিপ্লবতীর্থ চট্টগ্রাম সুদীপ্ত সাহসের
নাম নরোম রোদের নদী ছলাৎ ছলাৎ কর্ণফুলী অহংকারের
বীরোচিত নাম জালালাবাদের পাহাড় আকাশ ফুঁড়ে গড়ে
তোলা এক একটি রক্তের মিনার—
আদর্শিক ভালোবাসার নাম ধলঘাট—কালারপোল—গৈরলা
সরল বাতাস ও সহজিয়ার নাম পাহাড়তলী রক্ত—বুলেটে
আল্পনা আঁকে স্বপ্নের স্বাধীনতায়।

প্রজন্মের প্রহর ছুঁয়ে ছুটে আসা এক ঝলক বিপ্লব চট্টগ্রাম
স্পর্শ করে ছড়িয়ে পড়ে সারা বাংলায়, পৃথিবীতে, নিটোল নীরোগ;
আশ্চর্য ধীমান অশ্বের পৃষ্ঠে আলোকিত পৌরুষ সুবিশাল
শাবল বাহুতে ফাটানো বিদ্যুৎ চোখে মার্কসীয় দর্শনের
খোদিত বিশ্বাস স্ফুরিত ঠোঁটে জাগ্রত ভীষ্ম—
চট্টগ্রামের মানচিত্রে টেনে আনে গোটা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা,
দর্পিত দময়ন্তী গর্বিত পাণ্ডব বিপুল বিপুল বিপ্লবী বকুল।

প্রাণায়াম সাধনায় সোহং এবং সমাজতন্ত্র অভেদম সুরে
উচ্চারিত যাঁর সুষুম্না স্নায়ুতে তিনিই তো সূর্য সেন,
জাতির আত্মায় মেদ ও মজ্জায় স্থিতি তাঁর আলোক আলোক
বর্ষ—জন্ম নেয় অগণিত সূর্যসেন চট্টলার শ্যামল সময়ে
বয়ে আনে বাতাস কাঁপানো বায়ান্ন আকাশ ফাটানো উনসত্তুর
বিস্মিত ইতিহাস একাত্তুর চব্বিশে জানুয়ারী নব্বুই এর জনতরঙ্গ।

প্রমত্তা কর্ণফুলী বিদ্রোহে বিপ্লবে অতিপ্রজ জননীর শক্তিতে
দশকে দশকে ডেকে আনে শাণিত শক্তির শস্যের সন্তান
ঘৃণা ও দ্রোহে ঢেলে ঢেলে দেয় গ্যালন গ্যালন প্রাণ নির্যাস;
সূর্যসেন জন্ম নেয় প্রতিদিন চট্টলার সুপ্রাচীন আগ্নেয় শিলায়
সূর্যসেনের আত্মার তর্পণ চলে কর্ণফুলীর জলের ছায়ায়।

কয়েকজন ছাড়া
সাইয়িদ আতীকুল্লাহ

এই পৃথিবীতে আমার স্ত্রী ছাড়া
আমার একটি ছেলে আর একটি মেয়ে ছাড়া
আদিখ্যেতা নয়, অন্য কারো মনে নেই

আমার মগজে দুটি নাতিবৃহৎ জখম
হৃদপিণ্ডে প্রচণ্ড একটি
ঘাড়ে কোমরে কানের নীচে একাধিক
জখম সত্ত্বেও আমি বেঁচে আছি
এমনি আমার জেদ যেন দিনমজুরের
কাজটা আমার কিছুতে হাতছাড়া না হয়

দিনভর কষ্ট এবং অপমানের হিশেব
খুঁটিনাটি যা রেখেছি, ওই তিনজন
রাতের বেলায় আমাকে দেখেই জেনে ফেলে
বলতে হয় না আর
আমিতো জানিই

এই পৃথিবীতে মনে হয় অন্য কেউ
জানেনা কিছুই
অথবা এমন হতে পারে অল্পবিস্তর
কিছু জানে
ভান করে মানবিক কিছুই জানে না

যারা ভান করো তারা ভান করো
আশ্চর্য কারণে আর যারা কিছুই জানেনা
তারা ওভাবেই থাকো, কিছুই জানোনা
আমার জখমগুলো আমার, জানার বিষয় নয়
কোনো দিনমজুরের একান্ত জীবন
কয়েকজন ছাড়া

শিখা অনির্বাণ
সাথী দাশ

চোখ দিয়ে যখন দেখতে শিখলাম পৃথিবীকে
হৃদয় দিয়ে যখন অনুভব করতে শিখলাম
সমস্ত অস্তিত্বের শিরা– উপশিরায় কিংবদন্তীর গল্পের মতো
এক অলৌকিক ঘটনা চেতনা প্রবাহে কাঁপন জাগায়।
তিন দিনের ইতিহাস! অথচ
কি দারুণভাবে অখণ্ড ভারতের হৃৎপিণ্ডে পড়ে টান;
স্বাধীনতা–স্বাধীনতা চিৎকার হৃদয়ের গভীর গহনে
রক্তাক্ত হয় বাংলার মাটি
বিদ্রোহ আর বিপ্লবের সাহসী উচ্চারণে।
জালালাবাদ পাহাড়ের সবুজাভ ঘাসে ছোপ–ছোপ রক্ত,
লাল পতাকা হয় আরো লাল,
অতঃপর বিপ্লবী নায়কের ফাঁসীতে ঝুলানো লাশ
সাগরের জলে তলিয়ে যায়;
জেল–কালাপানি–যাবজ্জীবন কিছুতেই কিছু হয়না।
বিপ্লবের শিখা অনির্বাণ।
বিদ্রোহের লাল শিখা ছড়ায় সর্বত্র
অহিংসের নেপথ্যে ভাগাভাগি হয় দেশ–মাটি–মানুষ।
বিদ্রোহ–বিপ্লবের অনির্বাণ শিখা হাতে হাতে ঘুরে
পৃথিবীর ঘটমান ইতিহাস–চেতনা
দেশ–মাটি–মানুষের মননে আর চিন্তায় অকুংরিত হয়
ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন কৌশলে।

আমাদের পথ
আবীর হাসান

যন্ত্রণা কাতরতা আর কোন অসুখ নয় এখন
মহিমান্বিত হওয়া সবকিছু এমন কি
যা সবচেয়ে মহিমান্বিত সেই ভালবাসাও
এখন আমরা পাথর চাপা দিয়ে রাখি।

কারণ আমাদের ইতিহাসও পাথর চাপা।

আমরা আমাদের জাতীয়তার চর্চা করি সঙ্গোপনে,
অতীব নিষ্ঠুরতায় প্রেম করি অজস্র
নিতান্ত অনিচ্ছায় যাই বন্ধু সন্দর্শনে,
এমন কি একটা সংবেদনা প্রকাশেও ব্যর্থ হই
আর আমতা আমতা করে যা বলি তা
শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়ায় চাটুকারিতা।

অথচ আমাদের পথ ছিল বিদ্রোহের
সূর্যের মত বিদ্রোহী তেজের।
দুর্গম জালালাবাদ পাহাড় থেকে সেই
পথ নেমে এসেছিল ....।

এখন আমরা চিন্তা করি সে পথে যাবো
কি যাবো না!
অর্থগৃধ্নুতা আমাদের বেপথু করে আর
আমরা আত্মহত্যা করে জন্তু বনে বেঁচে থাকি।

সূর্য সেন
অরুণ মিত্র

তিনি বলেছিলেনঃ তোমরা এগিয়ে যাও, সামনের শয়তানী
অন্ধকারকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দাও। সেই সৌর কথার তেজে সারা চট্টগ্রাম
তখন অগ্নিগর্ভ। জালালাবাদ পাহাড়চূড়ায় জ্বলে উঠল আগুন। তার
আভায় আমরা দেখলাম অগ্নি-সন্তানদের প্রদীপ্ত মুখ, মুখমণ্ডল
ঘিরে জ্যোতির্বলয়। দীপ্যমান তরুণ-তরুণীদের ডান হাতে জীবন, বাঁহাতে
মরণ। তাদের সঙ্কল্পঃ মৃত্যুর বিনিময়ে তারা ছড়িয়ে দেবে জীবনের বীজ।
বাংলার মাটি দেখতে দেখতে ছেয়ে গেল তার অঙ্কুরে। শয়তানের সন্ত্রাস,
ফন্দিবাজি, বর্বরতা, জয়ের মুখোশ যতই পরুক, জয় তার হয়নি। সূর্য
সেনের আলো সে নেভাতে পারেনি, ফাঁসিতে ঝুলিয়েও না। ফাঁসির
মঞ্চ বাঙালীর হৃদয়ে হয়ে গেল স্বাধীনতার বেদী।
সৌরলোকে সেদিন পৌঁছে গিয়েছিল কলকাতা শহরেও। সেখানে
এক সদ্য-যুবক তাদের বারোমাসের এঁদোগলিতে প্রথম সূর্যোদয়
দেখেছিল প্রাণ ভ'রে। কতকাল আগের স্মৃতি এই স্বাধীন
দেশে আজও তার বুকের মধ্যে জ্বলজ্বল করে।

সূর্যনিন্দা ঃ গণতন্ত্রী জ্যোৎস্নায়
স্বপন দত্ত

বেশ নড়াচড়া করে স্বৈরতন্ত্রী ডাইনোসর ছায়া গণতন্ত্রী জ্যোৎস্নার ভেতরে,
সূর্যোদয়ের গল্প কেউ আর করেনা এখন, তাপহীন
মৃত ইতিহাস, আমাদের তাই বড়ো শীত লাগে।

শীত লাগে বুকের পরাগে, লাগে বন্ধুতায়, তারও আগে
সূর্য–নিন্দা দাঁতাল জন্তুর মতো ইতঃস্তত তছনছ করে।
দগ্ধ করে, দগ্ধ কোরে মুছে নেয় রঙ, মানুষের মনচিত্রে ভয় পায়
ঘর বেঁধে বাস–করা পাখি, মৃতপ্রায় জীবনের
গল্পহীন দৈনন্দিন অন্ধকারে হতাশায় করে ডাকাডাকি।

কষ্টের ঘানিতে জোড়া কলুষিত অন্ধকার এখনও জমাট
ফোটে নাই আলোর কুমকুম,
ভোরের প্রতীক্ষা শুধু, মোরগের ডাক
কখোন জোয়ার আনে প্রত্যাশার ধলচিতা গাঙ্গে

এখানে মানুষগুলো রপ্ত করে নিয়মিত জিরাফের ভাষা
এখানে মানুষগুলো প্রতিদিন মনুষ্যত্ব বিক্রি করে খায়
এখানে মানুষগুলো তবু জ্বালে বুকে পুষে মুক্তির পিপাসা।

এখানে মানুষ কিছু চড়ায় বাস্তুঘুঘু অন্যের ভিটায়
এখানে মানুষ কিছু ভেঙ্গে দেয় মানুষের স্বপ্ন ভালোবাসা
এখানে মানুষ কিছু বোলেচালে নিয়মিত ডুগডুগি বাজায়।

আমাদের শীত লাগে সূর্যোদয় নাই
জালালাবাদের যতো চড়াই উৎরাই।
ক্ষয় পায়, ক্রমাগত লুপ্ত হয়ে যায়, স্বাধীনতা বেড়ে ওঠে
স্বাধীনতা ঘিরে আগাছায়,
সূর্য–নিন্দা হাওয়া খায় উৎসবে উল্লাসে গণতন্ত্র কাননের স্নিগ্ধ ছায়ায়।

সে এক কাদার পুতুল
শ্যামলী মজুমদার

স্থির হয়ে থাকো, একেবারে স্থির
নতজানু হও–
অবেলার চুল্লীতে দু'এক টুকরো কাঠ
ভেজা কি শুকনো দেখে নেবে সবাই
হাওয়ার বাঁশী সুর দিয়েছে মেলে অনেক দূর অব্দি
নক্ষত্র ছোটে সূর্যের সাথে–
দিনমানে রোদ্দুর রাতে চন্দ্রহার
দেখা যায় না কি কিছুই দিন বদলের এ ভঙ্গুর দপর্ণে!

অন্ধ সেজেছে কাদার পুতুল
চুল্লীতে প্রস্তুত কাঠ
জালালাবাদের পাহাড় থেকে ফুঁ একটি ফুঁ––
কত শক্ত হতে পারে মাটি
কত তীব্র হতে পারে দহন
কত দুর্জেয় হয় প্রতিরোধ
দেখবে চতুর্দিকের ঘর গেরস্থালী,
যারা হজম করে কুকুরের লাথি
কিশোর–কিশোরীর লুণ্ঠিত সম্মান
যারা হজম করে দেশমাতৃকার বেদনার অশ্রু
শত শহীদের জ্বালা ও জ্বলার গান
তাদের ছিদ্রসন্ধিতে অগ্নিশলাকা এফোঁড় ওফোঁড়–
নিজের হাত পুড়ে গেলে কি রকমটি লাগে
বুঝে ওঠার সেই অবসর অবশ্যই দেবেন তিনি আরও বহুবার!

হয়ত আরেকবার দেখে যাবো জনপদে জনরোষে
জ্বলে ওঠার জ্বলে যাওয়ার অদম্য জ্বলোচ্ছ্বাস!

প্রার্থিত সকালের সারথি
মৃদুল গুহ

অনিন্দ্য সকালগুলো ক্রমে ক্রমে হারিয়ে যাচ্ছে
অন্ধকারের জরায়ু থেকে বেরিয়ে আসছে না কোন আলোক প্রত্যুষ
সভ্যতাকে খুন করে মানুষের মননে নাচছে রাত্রিরূপ ভয়াল জান্তব
সশব্দে চিবিয়ে খাচ্ছে রক্ত মাংস হাড্ডিসার
তারপর, একসময় ঝিমিয়ে পড়ছে নরকের নিরন্ধ্র গুহায় ।

শৈশবে কোন এক প্রহরে পুকুরের দুধেল জলে
চাঁদের বাঁকামুখ দেখেছিলাম চন্দ্রিমা প্লাবিত রাতে
নরম মাখনের মতো জ্যোস্নার অনুভবে
কোন এক অনুপম শিহরণে স্বপ্নাবিষ্ট ছিলাম আমি
তবুও আলোর আড়তদার চাঁদ চাইনি কখনো ।
কেননা
চাঁদ কখনো সকাল আনতে পারে না
চাঁদ কখনো নিজ আলোকে উদ্ভাসিত হয় না
চাঁদ কখনো দ্রোহী তেজে জ্বলে ওঠেনা

চাঁদ কখনো পোড়াতে পারে না, পোড়াতে শেখায় না ।
অথচ, আমি তো নিজ তেজে জ্বলে ওঠার জন্য চাচ্ছি
আমার দ্রোহী চেতনাগুলো বিস্তৃত করে এ জনপদকে জ্বালাতে চাচ্ছি
শোষণ পীড়নের অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে একটি আলোকোজ্জ্বল সকাল চাচ্ছি ।

আমার চাওয়ার এ বারণ-না-মানা আরাধ্য থেকে
যখনই ইতিহাসের কাছে আনত আমি
তখনই এক উদিত সূর্যের দেশ হিসেবে
উঠে এসেছে চট্টগ্রাম, বীর চট্টগ্রাম
জালালাবাদের পাহাড় চূড়ায় উড্ডীন পতাকায় স্বাধীন চট্টগ্রাম

যেখানে আমার প্রার্থিত সকালের রথে সারথি হয়ে
হাত নেড়ে সম্ভাষণ জানাচ্ছেন একজন সূর্যসেন
যিনি সব সময় নিজ তেজে জ্বলে ওঠেন, আলো দেন
স্পর্ধিত যৌবনে দ্রোহী চেতনায় নিজ বাসভূম ভালোবাসেন ।

একটি জিজ্ঞাসা প্রজন্মের
আনন্দ মোহন রক্ষিত

জালালাবাদের পাহাড়ে রক্তগন্ধী সবুজেরা
সূর্যের রঙ ছড়ায় ।
বিশ্বাসের বিশালতায় সূর্যের ছায়ায় এসে
একে একে সবাই গড়লো বসত্ জীবন ও মৃত্যুর ।
সময়ের অনাদৃত ব্যবধানে আবার সকলের প্রস্থান,
এ এক অবিশ্বাস্য সত্যের অপমৃত্যু ।

কী এক অমোঘ শক্তি টেনেছিলো তাঁদের
কী এক প্রবল নিয়তি ডেকেছিলো তাঁদের
কী এক নির্বাক শ্রুতি ডেকেছিলো তাঁদের
কী এক আগুন আগুন খেলায়
দ্বাদশ যুবক সেদিন মৃত্যুকে নিলো টানি?

এ জিজ্ঞাসা একটি শতাব্দীর
এ জিজ্ঞাসা তিনটি প্রজন্মের
এ জিজ্ঞাসা আগামী শতকের
এ জিজ্ঞাসা বাঙলা ও বাঙালির ।

তাই বলি,
একজন সূর্যসেনের আজ বড়ো প্রয়োজন
একজন প্রীতিলতার আজ বড়ো প্রয়োজন
একজন বালগঙ্গাধর, টিপু ও তীতুমীরের
আজ বড়ো প্রয়োজন । প্রয়োজন আজ
একজন দেশপ্রিয়'র, একজন সুভাষ আর বঙ্গবন্ধুর ।

যে আবার জ্বলে উঠবে প্রিয়তম বিদ্রোহে
যে আবার অগ্নিশপথে হবে বহ্নিমান
যে আবার দেশপ্রেমে হবে নিঃশঙ্ক বলি
যে আবার দুর্বার সংগ্রামে দেবে দুর্বার নেতৃত্ব
যে আবার বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করবে
স্বাধীনতা আমার প্রিয় স্বাধীনতা
যে আবার বজ্রনির্ঘোষে বলবে
'..........এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম ....
এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম .... ।'

সূর্যের সন্তান
নিতাই সেন

আমার কবিতা জননী তোমাকে নিবেদিত
আমার কবিতা সূর্যসেন সূর্যের সন্তান তোমাকে নিবেদিত
আমার কবিতা মানুষের জন্য দানবের সাথে লড়াই—এ
যুগে যুগে লোভ মোহ বলিদানে যাঁরা বিজয়ী হয়েছেন
তাঁদেরকে নিবেদিত।

আমার কবিতা আফ্রিকার কালো মানুষের জন্য
আমার কবিতা জননেতা নেলসন মেন্ডেলার জন্য
আমার কবিতা ইথোপিয়ার করুণ শিশুটির জন্য
আমার কবিতা বস্নিয়ার ছেলেহারা মায়েদের জন্য
আমার কবিতা হার্জোআভিনিয়ার বোনেদের জন্য
বরুণ্ডীর আহত—নিহত মানুষের জন্য আমার কবিতা
শব্দের কুসুম।

আমার কবিতা দুঃখের দহনে পীড়নে শোষণে
পোড়া লাল শলাকার মতো শীর্ণ মানুষের জন্য
বকুল ফুলের মতো হৃদয় ছোঁয়া গন্ধেভরা আমার কবিতা
ধুলায় ভূলুণ্ঠিত সদ্য প্রস্ফুটিত মানবতার জন্য।

সূর্যসেন সূর্যের সন্তান তোমাকে লাল সালাম
যুগে যুগে পৃথিবীতে ফিরে আসা লাখো সূর্যসেন
আমার কবিতা তোমাদেরই জন্য, লাল সালাম
আইদিদ কালোমানুষ লাল সালাম।

জীবন রদ্দুর
ইউসুফ মুহম্মদ

আচ্ছন্ন এ ঘর ছেড়ে
যারা গেছে জামার আস্তিনে
ভাঁজ এঁকে- তারা যায়, যেতে হয়।
উষ্ণীষ থাকে, হিরে তলোয়ার

ভোরের জোয়ারে-জল
গাঙ-নায় কাদার শরিল,
ডানা-অলা মেঘ ছিল মেঘের ছায়ায়
মানুষের ছায়া খোঁজে
ডালপালা-হীন মাছি;
রোদ ডাকে আয়-

আচ্ছন্ন এ ঘর ছেড়ে যারা গেছে
প্রণতি তাদের:
বয়ারে বয়ারে ঘোরে
থাকে সূর্য-সূর্যসেন,
পলায়ন-ফাঁসি, অস্ত-জীবন-রদ্দুর,
জাগে ক্রোধ, রোদের রিবন।

ভ্রমণ ও ব্যর্থ স্বীকারোক্তি
খালিদ আহসান

জালালাবাদ পাহাড় এখন
শুধুই স্থবির পাহাড়, শূন্যতা ঘেরা। এক নির্বাক বৃদ্ধ।
বৃষ্টিস্নাত হলে রাস্তার ধারে যে গাছ
তার নীচে দাঁড়িয়েছিলো পাতাকুড়োনী।

হঠাৎ হাওয়ায় উড়ছিলো ঝুড়িভর্তি ঝরা পাতা আর ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা।
পৌঁছে দিলো পাহাড়চেরা সিঁড়ির কাছে,
পাথর খসেছে কোথাও সময়ের যন্ত্রণায়। সিঁড়ির মুখে ছায়ামূর্তি।
দাঁড়িয়েছিলে তুমি?
খুলে গেল বরফের ঘর।
দেখা গেলো ঠাণ্ডা চোখ। ঠাণ্ডা দুটি হাত। শীতল কণ্ঠস্বর।
ঃ বড়ো বেশী পিছিয়ে পড়েছো তোমরা।

আমি কি উত্তর দেবো তোমায় মাষ্টারদা,
ঃ সবুজ পাটাতন ছিলো নৌকার। গেছে উল্টে,
জোয়ান নাবিক ছিল, মরা দেহ ভেসে গেছে অবিশ্বাসের স্রোতে।
অর্ধপঁচা যৌবনের প্রান্তে এখন পতঙ্গ ও ভোমরা।

মাষ্টারদার জন্মশতবার্ষিকীতে

আহমদ শরীফ

দৈনিক 'আজকের কাগজ'

স্বাধীনতা সংগ্রাম বৃটিশ-ভারতে শুরু হয়েছিল ওয়াহাবী-সিপাহিদ্রোহের ও যুদ্ধের মাধ্যমে। ১৮৫৭ সালে ওয়াহাবী সিপাহি পরাজয়ে, দিল্লীর বাদশাহর পদচ্যুতিতে তার অবসান হয়নি। বোম্বাইয়ে পাঞ্জাবে বাঙ্গালার উড়িশ্যায় বিহারে লঘু-গুরুভাবে বহু দেশ প্রেমিক স্বাধীনতা সংগ্রামীর প্রাণদানে কারাবরণে তা চালু ছিল। এ সূত্রে ব্যারিষ্টার প্রমথ নাথ মিত্রের(১৮৯৯-১৯০১) অনুশীলন ও যুগান্তর এ দুই গুপ্তদলের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। বাঙলা দেশে বলতে গেলে স্বদেশ প্রেমের ও স্বাধীনতা চেতনার ঐতিহাসিক উদ্ভবকাল হচ্ছে ১৮৬৭ সালের কোলকাতায় অনুষ্ঠিত হিন্দু মেলায়। যদিও দশ বছর আগের ওরাহাবী সিপাহী বিপ্লব কোন বাঙালী হিন্দুরই সমর্থন পায়নি। বরং বিপন্ন ব্রিটিশের প্রতি ছিল আন্তরিক সমর্থন ও সহযোগিতা।

বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। মোটামুটিভাবে আমরা বিশ শতকেরই ব্রিটিশ ও দেশী প্রশাসক হত্যার মাধ্যমেই স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু দেখতে পাই। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী প্রমুখ এক্ষেত্রে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। ভারতের বিভিন্ন স্থানে রক্তঝরা বিপ্লব মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে বহু বহু তরুণ তরুণী তৈরি হতে থাকে। এদের সেকালের ভাষায় বলা হত সন্ত্রাসবাদী স্বরাজী। অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় ধরা পড়ে জেল খাটেন। ১৯০৭ সালের পরে। আমাদের চট্টলগৌরব বাঙালি বীর সূর্যসেনের ব্যক্তিত্ব প্রভাবে ও নেতৃত্বে চট্টগ্রামেও গড়ে উঠে একটি প্রাণদানে ও গ্রহণে সদাপ্রস্তুত এক অভীক সন্ত্রাসী-বিপ্লবী দল, এ দলে যাঁরা প্রধান ছিলেন তাঁরা হলেন অম্বিকা চক্রবর্তী, লোকনাথ বল, অনন্ত সিং, কল্পনা দত্ত, প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার, গণেশ ঘোষ, অর্ধেন্দু, হেমেন্দু, তারকেশ্বর, পূর্ণেন্দু, শরদিন্দু দস্তিদার পরিবার,উপেন বিশ্বাস, বিনোদ চৌধুরী, নির্মল সেন, বিনোদ চক্রবর্তী,হরিপদ ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, অমরেন্দ্র নন্দী,সাবিত্রী দেবী, সুহাসিনী গাঙ্গুলী, ইন্দুমতী সিংহ, প্রমোদ রঞ্জন চৌধূরী, কৃষ্ণ চৌধুরী, হরেন ভট্টাচার্য , হিমাংশু চক্রবর্তী, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, আনন্দ গুপ্ত, মাখন ঘোষাল, অপূর্ব সেন, প্রভাস বল, রজত সেন, মনোরঞ্জন সেন,নরেন রায় প্রমুখ অনেকেই। কালার পুলে, ধোরলায়, ধলঘাটে, গহীরায় , গৈরলায় ফেনীতে ছোট ছোট যুদ্ধ হয়েছে অনেক। সব চেয়ে বড় এবং গৌরবজনক যুদ্ধ হয়েছিল জালালাবাদ পাহাড়ে। জয়ী হয়েছিলেন বিপ্লবীরাই- ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর নিতান্ত কাতর থাকা সত্ত্বেও ক্ষুদিরাম বাঘা যতীন-কানাই লালের অভীকতায়, বীরত্বের অঙ্গীকারে উদ্বুদ্ধও প্রবুদ্ধ মোট তেষট্টি জন জালালাবাদ যুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্যদের সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত করেন তাঁদের নাম জীতেন্দ্রলাল দাশগুপ্ত, মধুদত্ত, পুলিন ঘোষ, নরেশ রায়, ত্রিপুরা সেন, বিধু ভট্টাচার্য, হরিগোপাল বল ওরফে টেগরা, মতি কানুনগোয়, প্রভাসবল, শশাঙ্ক দত্ত, নির্মল লালা প্রমুখ। আর এ বিপ্লবে চট্টগ্রামের নানা যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন, সূর্যসেনসহ মোট ছাপান্ন জন। ব্রিটিশ সরকার চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন স্থানে জাঠ,নিজামের বাহিনী ও গোর্খা সৈন্যের ঘাঁটি বসিয়ে রেখেছিল কয়েক বছর যাবত। এমনি ভয় পেয়েছিল ও গুরুত্ব দিয়েছিল সূর্যসেনের দলের বিপ্লবীদের উল্লেখ্য যে অজ্ঞ অনক্ষর ও দরিদ্রবহুল মুসলিম সমাজে সন্ত্রাসী বিপ্লবী ছিলেন বটে; কিন্তু সর্বস্তরের মুসলিমরা মাঝি-মজুর চাষীগৃহস্থ ও সাক্ষর ও শিক্ষিত মুসলিমরা গোটা চট্টগ্রামেই এদের বিনা সত্ত্বে সাগ্রহে গোপনে সাহায্য- সহায়তা ও আশ্রয় দিয়েছিল। জালালাবাদ যুদ্ধে মৃতপ্রায় অম্বিকা চক্রবর্তী তো আমজাদ আলীর বাড়িতেই চিকিৎসায় ও শুশ্রূষায় বেঁচে ওঠেন। ফয়েজুন্নিসার কিশোর ছেলেই তো জালালাবাদ পাহাড়ে কুড়িয়ে পাওয়া রিভলভার ফয়েজুন্নিসার বাড়িতে আশ্রিত অম্বিকা চক্রবতীকে এনে দেয়। এ জন্যে কিছু অর্থ দিতে চাইলে অম্বিকা চক্রবর্তীকে বৃদ্ধা বিধবা বলেন, এইটি দিয়ে একটা সাহেব মারলে আমি বেশি খুশি হব। জালালাবাদ যুদ্ধে আহত দীর্ঘজীবী বিনোদ বিহারী চৌধুরী আজো আমাদের মধ্যে রয়েছেন, এমনকি অন্যরা অনেকে আজো বেঁচে আছেন।

এদের স্বাধীনতার স্পৃহা ও আবেগ এবং অভীকতা এতো দুর্বার হয়ে উঠেছিল যে ব্রিটিশ ভারতের পূর্বদক্ষিণ প্রান্তে এরা বিচ্ছিন্নভাবে শুরু করে দেন সংগ্রাম। যে সময়ে অস্ত্র, জনশক্তি, অর্থবল কোনটাই বলতে গেলে ছিলই না, দু'চারটি ডাকাতিতেও অর্থসংগ্রহ হয়নি প্রয়োজনানুরূপ। তবু এদের ব্রিটিশ বিদ্বেষ ও স্বাধীনতা পতাকাপ্রীতি এতোই অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে, জয়টা ক্ষণপ্রভা জেনেও, পরিণামে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী বুঝেও এরা নিরস্ত্র হননি প্রাণের ভয়ে। কারণ তাঁরা জানতেন এবং বিশ্বাস করতেন যে যথাপ্রয়োজনে যথাকালে যথাস্থানে যথাকাজে যারা মরতে প্রস্তুত, বাঁচবার স্বাধীন হবার যোগ্যতা ও অধিকার তাঁদেরই। রক্তবীজের মতো এক বীরের প্রাণদান ও দেহনিঃসৃত রক্ত দেশের লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণীকে দেশ স্বাধীন করার জন্যে ব্রিটিশ বিতাড়নের জন্যে স্বেচ্ছায় প্রাণপণ সংগ্রামে নামার প্রেরণা প্রণোদনা-প্রবর্তনা দান করবে। রক্তবীজের প্রতি বিন্দুরক্ত অসংখ্য অশেষ অবিনাশী রক্তবীজের জন্ম দেবে। ব্রিটিশ বিতাড়ন তা হলেই সম্ভব হবে। দেশবাসীকে রক্তদানে, প্রাণদানে, সংগ্রামে, বিপ্লবে অনুপ্রাণিত করার জন্যেই স্বল্প সংখ্যক সহচর-সহকর্মী নিয়ে সূর্যসেন চট্টগ্রামস্থ য়ুরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করান, একই উদ্দেশ্যে ও লক্ষে নিশ্চিত পরাজয় জেনেও জালালাবাদ পাহাড়ে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হন। তাঁরা মরে অন্যদের স্বাধীন দেশে স্বাধীন মানুষ ও জাতি হিসেবে স্বাধীন সত্তায়

বাঁচার অধিকার চেতনা দান করে গেছেন। তাঁদের কৃতিত্ব ও সংগ্রামের সার্থকতা এখানেই। গোটা ভারতের ওই প্রত্যন্ত অঞ্চল চট্টগ্রামে সেদিন সূর্য সৈনিকরা কিছুকালের জন্যে অন্তত স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করেছিলেন। এদিক দিয়ে তাঁরা ভারতে পথিকৃতের মর্যাদা ও গৌরব লাভ করেছেন ইতিহাসের পৃষ্ঠায়।

মাষ্টারদা সূর্যসেন অমর, এজন্যই তিনি এবং তাঁর দলের সহকর্মীরা শ্রদ্ধার সঙ্গে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। আমরা আজ স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক বটে, কিন্তু আমরা আজো গণমানবকে শোষণ-পীড়ন- অজ্ঞতা, অনক্ষরতা মুক্ত করে স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ করতে পারিনি। ফলে স্বদেশী-স্বজাতি-স্বভাষী সরকারেরও আমরা স্বাধিকার বঞ্চিত শাসনপাত্র মাত্র। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম তাই শেষ হয়নি। আমাদের শোষণ মুক্ত গণমানবের সমাজ গড়ার সংগ্রাম চলবেই। সূর্যসেন থেকেই আমরা এ প্রেরণা পেয়েছি বলেই আজ তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে আমাদের প্রেরণার প্রণোদনার সাহসে ও শক্তির সংকল্পের অঙ্গীকারের প্রমূর্ত উৎস হিসেবে তাঁকেই স্মরণ করছি। সূর্যসেন বাঙলার ও বাঙালির চিরন্তন গৌরবের ও গর্বের অবলম্বন। সূর্যসেনের জন্মস্থান চট্টগ্রাম। তাই ধন্য আজ গণমানব মুক্তির সংগ্রামীদের স্মরেণ্য ভূমি। চট্টলবাসীরাও তার জাতিত্ব গৌররে ধন্য।

ঐতিহাস, এ ঐতিবৃত্তান্ত আজ
আমাদের স্নায়ুতে স্নায়ুতে
বিদ্যুৎ প্রবাহ আনে, আনে চেতনার দিন।
চট্টগ্রাম, বীর চট্টগ্রাম। (সুকান্ত ভট্টাচার্য)

আজকের এ মুহূর্তেও আমাদের বাঁচার সংগ্রাম শোষণ মুক্তির সংগ্রাম স্বাধিকার স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়ার সংগ্রাম শেষ হয়নি। তাই কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ভাষায় বলি,
বিদ্রোহ আজ- বিদ্রোহ চারিদিকে
আমি যাই তার দিন পঞ্জিকা লিখে
এত বিদ্রোহ কখনো দেখেনি কেউ
(আজ) দিকে দিকে ওঠে অবাধ্যতার ঢেউ।
সূর্যসেন আমাদের সংগ্রামী বিপ্লবী প্রেরণার চিরন্তন উৎস। জয়তু সূর্যসেন।

অজয় রায় — দৈনিক 'সংবাদ'

সময়টা ছিল ১৯৪৬ সাল। মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পরিণতিতে শুরু হয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। উপমহাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে কালো অধ্যায়গুলোর অন্যতম। ব্যাপারটা লীগ নেতৃত্বের উচ্চতম পর্যায়ে পরিকল্পিত হয়েছিল কিনা বলা কঠিন, তবে লীগের সংগ্রাম যতটা না ছিল বৃটিশের বিরুদ্ধে তার চেয়ে তা সেদিন ছিল মূলত কংগ্রেসের বিরুদ্ধে, যেখানে তাদের আহবানে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পরিণতি যে হবে দাঙ্গা তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। প্রথমে কলকাতায়, পরে ঢাকা, নোয়াখালী, বিহার তারপর পাঞ্জাব।

দাঙ্গার বিবরণ অবশ্য এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। সে সময় ডিগ্রী ক্লাসের ছাত্র, পারিবারিক বিপর্যয়ে উত্তর ভারত ছেড়ে দেশে এসেছি মাস কয়েক আগে। শেষ পর্যন্ত নানা জায়গা ঘুরে ভর্তি হয়েছি মুন্সীগঞ্জের হরগঙ্গা কলেজে। যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ফেডারেশনের সাথে। তখন ঢাকায় কমিউনিষ্ট পার্টির অফিস ছিল কোর্টের পিছনে কোর্ট হাউস স্ট্রীটের একটি বাড়ির দোতলায়। দাঙ্গার মধ্যেই সেখানে ডাক পড়লো। জেল থেকে ছাড়া পাবেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বন্দীরা। ঢাকা জেলে তখন আটক ছিলেন অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, সুখেন্দু দস্তিদার, লালমোহন সেনসহ দশ-বারো জন। সন্দ্বীপের ছেলে লালমোহন সেন ছাড়া পেয়ে দেশে যাবার পরই দাঙ্গাবাজদের হাতে নিহত হন।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বন্দীদের মুক্তির দাবিতে আন্দোলন সংগঠিত করার চেষ্টা পয়ঁতাল্লিশ সাল থেকে হচ্ছিল। নির্বাচনের পর বাংলার নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী (তখন ভারতের প্রদেশগুলোর মুখ্যমন্ত্রীদের প্রধানমন্ত্রীই বলা হতো)। শহীদ সোহরায়ার্দী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও অন্যান্য মামলায় দন্ডিত রাজবন্দীদের মুক্তির। সেই মুক্তি যখন হলো তখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন সারাদেশে। তবু তার মধ্যেই মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীরা সংবর্ধিত হলেন ঢাকায়। মুন্সীগঞ্জে আমরা আয়োজন করেছিলাম একটি অনুষ্ঠানের।

ছোটবেলা থেকেই মার মুখে যাঁদের গল্প শুনেছি তাঁদের মাঝে যেমন ছিল মাস্টারদা সূর্যসেনের নাম, তেমনি ছিল অনন্ত সিং আর গণেশ ঘোষের কথা। আরও ছিল প্রীতিলতার বীরত্বের প্রসঙ্গ। তাঁদেরই কয়েকজনকে চোখে দেখে, তাঁদের সঙ্গে কথা বলে যৌবনের সূচনায় সেদিন যে শিহরণ মনে জেগেছিল তা যেন অনুভব করতে পারি আজও। সেদিন মুন্সীগঞ্জে সংবর্ধনা সভায় মুক্ত বন্দীদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রেখেছিলেন গণেশ ঘোষ আর সুখেন্দু দস্তিদার। দু'জনই অনেকক্ষণ ধরে স্মৃতিচারণ করেছিলেন মাস্টারদার। বলেছিলেন তাঁর ফাঁসির কথা।

পরে পঞ্চাশের দশকে নিজে যখন রাজবন্দী তখন আমাদের সহবন্দী ছিলেন চট্টগ্রামের এক কৃষকনেতা। স্মৃতিবিভ্রমে নামটা মনে নেই। নিজে ছিলেন কৃষক, মাস্টারদার গ্রামের কাছে বাড়ি। ছেলেবেলায় দেখেছেন মাস্টারদাকে। তরুণদের নিয়ে নাকি ব্যায়াম করতেন। যখনকার কথা তখন তিনি ছিলেন কিশোর। দূর থেকে দেখলেও সেদিনই আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাঁদের দিকে। আর সেই আকর্ষণই তাকে নিয়ে এসেছিল কমিউনিষ্ট পার্টির আঙ্গিনায়।

সশস্ত্র সংঘাতের মধ্য দিয়ে ভারত থেকে বৃটিশ শাসকের উচ্ছেদ-এই লক্ষ্যকে সামনে নিয়েই সেদিনকার বাংলায় আর বাংলা কেন, কমবেশি সমস্ত ভারতব্যাপী-হাজার হাজার তরুণ নিজেদের সম্পৃক্ত করেছিল বিপ্লবীদের সাথে। ইংরেজ সরকার এদের আখ্যায়িত করেছিল সন্ত্রাসবাদী হিসেবে। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, সরকারের সহযোগীদের তারা হত্যা করতেন ঠিকই, কিন্তু এভাবে এক একজনকে হত্যা করে দেশ স্বাধীন করতে পারবেন সেটা তাঁরা কোনদিনই বিশ্বাস করতেন না। বড়ো মাপের পরিকল্পনা তাঁদের ছিল। উড়িষ্যার উপকূলে বালাশোরে বাঘা যতীনের সঙ্গে পুলিশের সশস্ত্র সংঘাত (সেই সংঘাতে মারা যান বাঘা যতীন) ছিল সেই ধরনের একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জাহাজ ভর্তি করে অস্ত্র আমদানির চেষ্টার অংশ হিসেবেই সঙ্গীদের সাথে যতীন দাস গিয়েছিলেন উড়িষ্যার সমুদ্র উপকূলে। সেনা অভ্যুত্থানের পরিকল্পনাও ছিল তাঁদের। সমস্ত উত্তর ভারতের সেনা ছাউনীতে অভ্যুত্থান ঘটানোর চেষ্টা ছিল। কেন্দ্রীয় আইন সভায় বড়লাটের দিকে বোমা নিক্ষেপের চেষ্টাও ছিল এমনি এক বড় মাপের পরিকল্পনার অংশ। সে সময় ধরা পড়েছিলেন ভগৎ সিং। ফাঁসি হয়েছিল তাঁর।

আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা তখন আরও ঘটেছে। কলকাতায় রাইটার্স বিল্ডিংয়ের বারান্দায় বিনয়, বাদল, দীনেশের সঙ্গে পুলিশের বন্দুকযুদ্ধ সমস্ত বাংলায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল সেদিন। এরকম আরও অনেক দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করা যায়। ক্ষুদিরাম থেকে যে ঐতিহ্যের সূচনা তার ধারাবাহিকতা অটুট থেকেছে তিরিশের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত।

তবে সেদিন সমস্ত ভারতকে সবচেয়ে বেশি যা সচকিত করেছিল তা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠনের ঘটনা। সমস্ত চট্টগ্রাম শহরে তিনদিন কোন কর্তৃত্ব ছিল না বৃটিশের। ইংরেজরা আশ্রয় নিয়েছিল জাহাজে। সেদিনকার এই অভ্যুত্থান ছিল এক বড় মাপের পরিকল্পনার অংশ। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠনের ঘটনার সাথে তাল রেখে অনুরূপ মাপের কোন ঘটনা সম্ভবত ভারতের আর কোথাও ঘটেনি। কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তের ছোট মফস্বল শহর-তখন চট্টগ্রাম (এক ছোট শহরই ছিল) ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল দেশবাসীকে। এতো সুশৃংখল ও সংগঠিত উদ্যোগ ইতোপূর্বে নেয়া সম্ভব হয়নি বিপ্লববাদীদের। আর এই ঘটনার নায়ক ছিলেন মাস্টারদা সূর্যসেন। পুরো পরিকল্পনা ও তার প্রয়োজনীয় সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন তিনি। অন্যরাও ছিলেন। ছিলেন লোকনাথ বল, অম্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ আরও অনেকে। কিন্তু সবার উপরে ছিলেন মাস্টারদা সূর্যসেন। আর সে জন্যেই বৃটিশ শাসকদের আক্রোশ তার বিরুদ্ধে ছিল সবচেয়ে বেশি। ফাঁসি দেয়ার পর তাঁর মৃতদেহ জাহাজে করে নিয়ে ফেলে দেয়া হয়েছিল গভীর সমুদ্রে। ফেলে দেবার আগে আক্রোশে বারবার লাথি মেরেছিল মৃতদেহের উপর। সেদিন সুসভ্য ইংরেজদের সভ্যতার সব মুখোশ খসে পড়েছিল। মৃতের প্রতি সম্মানের কথা কোন দাগ কাটতে পারেনি তাদের মনে।

যে কথাগুলো বলছি তার কোনটিই অজানা নয়। নতুন কথা নয় একটিও। তবু বলছি তার কারণ ২১ মার্চ মাস্টারদা সূর্যসেনের জন্মদিন তাই নয়। তার আরেকটি কারণ, এই ঐতিহ্যকে জোর করে ভুলিয়ে দেয়ার সচেতন চেষ্টা চলেছে সাতচল্লিশ পরবর্তী সময়ে। এখনো সে প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। মাস্টারদারা বৃটিশবিরোধী সংগ্রামের যে ধারা সৃষ্টি করেছিলেন সে সংগ্রামকে অভিহিত করা হয়েছে ও হচ্ছে সাম্প্রদায়বিশেষের সংগ্রাম হিসেবে। বলার চেষ্টা হয়েছে এদেশের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। তা না হলে মাস্টারদাদের কথা পাঠ্যপুস্তকে স্থান পায় না কেন? কেন বৃটিশের সহযোগিতা করার জন্য নবাবী খেতাব প্রাপ্ত বংশের নবাব সলিমুল্লাহর জীবনকথা স্থান পায় প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিদের তালিকায়? কেন জানানো হয় না যে, এদের পূর্বপুরুষ সিপাহী বিদ্রোহের সময় সিপাহীদের অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা ফাঁস করে দেয়ারই এ নাম এদের জমিদারী ও নবাব উপাধি, যার স্মারক আহসান মঞ্জিল? ইতিহাসবিকৃতির এই চেষ্টা সচেতন। নতুন প্রজন্মের কাছে পুরো অতীতকে বিকৃতভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে তাদের অজ্ঞ রেখে প্রভাবিত করাই এদের উদ্দেশ্য।

আর সে কারণেই মাস্টারদা সূর্যসেনের জন্মশতবার্ষিকী পালনের উদ্যোগ শুধুমাত্র মাস্টারদার প্রতি সম্মান প্রদর্শনেরই অংশ নয়, তা আমাদের ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়ের সঙ্গে পুনঃ সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা। সে হিসেবেই তা তাৎপর্যপূর্ণ। সেদিনকার বিপ্লবীরা যে সম্প্রদায় বিশেষের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেননি সম্প্রদায়নির্বিশেষে সমস্ত দেশবাসীর জন্য সংগ্রাম করেছেন সেই সত্যটি তুলে ধরাটা সে কারণেই বিশেষভাবে জরুরী।

মাস্টারদা সূর্যসেনের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান যেন কেবল একটি অনুষ্ঠানেই শেষ না হয়ে যায়, যেন তাঁদের সঙ্গে আমাদের সংযোগ পুনঃস্থাপিত হয় সে জন্যে তাঁদের সবার স্মৃতিতে একটি যাদুঘর স্থাপনের চিন্তা কি আমরা করতে পারি না? আগ্রহী সবাইকে এ ব্যাপারটি ভেবে দেখার অনুরোধ জানাচ্ছি।

ফয়েজ আহ্‌মদ **দৈনিক 'জনকণ্ঠ'**

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম ও আন্দোলন ভারত উপমহাদেশে সশস্ত্র বিপ্লববাদের এক ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিল। সেই সংগ্রামী চেতনা ও ঐতিহ্যকে বহন করে প্রথমে যে দু'টি দেশ রাজনৈতিক ভাবে স্বাধীন হয়েছিল তাদের অতীত বিদ্রোহ-বিপ্লবের গৌরব আজও অম্লান এবং রক্ত-রঞ্জিত ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলো আমাদের আগামীদিনের অমূল্য পাথেয় বলে গণ্য হবে। ইতিহাসকে একশ্রেণীর মানুষ নিজেদের স্বার্থে যতোই বিকৃত করার চেষ্টায় উন্মত্ত হয়ে উঠুক না কেন, তাদের ধ্বংসস্তূপ থেকে সত্যের ঔজ্জ্বল্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠবেই।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যাঁরা অস্ত্রধারণ করে দেশকে মুক্ত করার জন্যে বিপ্লববাদের ভিত্তিতে অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন, তাঁদের অগ্নিচেতনা ও কৌশল ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি ধারা। তাঁদের সাথে যে সকল শ্রেণীর স্বাধীনচেতা মানুষ একাত্ম ছিলেন, তা নয়। কিন্তু তাঁদের একই লক্ষ্যে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধাবোধ। স্বাধীনতা সংগ্রামের অপর ধারার প্রবর্তকগণ অহিংস আন্দোলনের সর্মথক। এ দু'ধারায় পার্থক্য বিরাট হলেও এবং ইতিহাসের নায়কদের মতের অমিল সুস্পষ্ট হয়ে ওঠা সত্ত্বেও গুরুত্বারোপ ও মূল্যায়নের প্রশ্নে সত্যনিষ্ঠ হতে হবে। সেই সৎ দৃষ্টিতেই আজ বাংলাদেশ ও ভারতে (বর্তমান সম্পর্কের আলোকে নয়) বিপ্লববাদের অগ্নি পুরুষদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হচ্ছে। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্ররোচনা ও প্রচারে এদের 'সন্ত্রাসী' ও নৈরাজ্যবাদী' বলে আখ্যায়িত করা হতো- যা একান্তভাবেই ছিল স্বাধীনতা বিরোধী, উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা। ব্যক্তিস্বার্থ ছিল তাঁদের কাছে অন্ধকারের ভাবনা- সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে স্বদেশকে মুক্ত ও স্বাধীন করার প্রচেষ্টা ছিল তাঁদের মূল চেতনা। এই অগ্র চেতনার বিপ্লবমুখী সক্রিয় সশস্ত্র শ্রদ্ধেয় বীর সন্তানরা নির্দ্বিধায় ফাঁসির কাষ্ঠের দিকে পা বাড়িয়েছিলেন স্বাধীনতার আলোক সন্ধানে। তাঁদের একজন গণেশ ঘোষের কবিতার প্রতিজ্ঞার ভাষা 'বিদেশী দস্যুরে কহিল তরুণ/তুলি উচ্চশির মৃত্যু ভয়হীন।'

সে কারণে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবের অনন্তকালের বীর নেতা সূর্যসেন মাস্টারদার শততম জন্মবার্ষিকী ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে জ্বলন্ত গৌরবের স্থান দখল করবে, বলা যায়। বাংলাদেশের চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার দখলের নেতা মাস্টারদাকে খণ্ডিত করে দেখা যাবে না- তিনি একান্তভাবে সার্বিক দিক থেকে আমাদের ঐতিহ্য- আমাদেরই প্রয়োজনে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল ও এর পূর্বে ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি (চট্টগ্রাম শাখা) গঠন এবং যুব অভ্যুত্থানের কর্মসূচী প্রণয়ন ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের ইতিহাস আকস্মিকভাবে সৃষ্টি হয়নি।

১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় যুব-ছাত্র সমাজের একটি বিরাট অংশ বৈপ্লবিক চেতনায় প্রজ্জ্বলিত হচ্ছিল- কংগ্রেস সেই তপ্ত অবস্থাকে অহিংস পন্থায় ধারণ করতে পারছিল না। শ্রীহট্টের চা বাগান শ্রমিকদের বিদ্রোহ, আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের ধর্মঘট, ইংরেজ কোম্পানীর জাহাজ শ্রমিকদের অসহযোগ ও চাঁদপুর জাহাজঘাটে চা শ্রমিকদের হত্যাকাণ্ডের পর গান্ধীজী চট্টগ্রামে এসে সকলকে অভিনন্দন জানান। কিন্তু তিনি চৌরিচৌরায় থানা আক্রমণ অনুমোদন করতে পারেননি। তিনি জানতেন,কংগ্রেসের অভ্যন্তরস্থ বিপ্লবী চিন্তার অধিকারী যুবকদের কোথাও বন্ধ করা না গেলে অহিংস আন্দোলনের চরিত্র পাল্টে যেতে পারে। তাঁর ধারণা অমূলক ছিল না। পাশাপাশি সুভাষ বসুর রুদ্রভাব। এ অবস্থায় তিনি অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন সেবার । বিরুদ্ধবাদী যুবকরা এই অবস্থা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং তারা সশস্ত্র প্রস্তুতি অতি গোপনীয়তার সাথে চট্টগ্রামেই শুরু করে।

১৯২৩ সালে কলকাতার মানিকতলা বোমা হামলার পরবর্তীতে চব্বিশ সালে ইংরেজ সরকার বিনাবিচারে আটক রাখার আইন জারি করার পর মাস্টারদা, অম্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষসহ অনেকে বন্দী হন। আটাশ সালে মুক্তি লাভ করার পর মাস্টারদার নেতৃত্বে অম্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ, নির্মল সেন, লোকনাথ বল, অনন্ত সিং প্রমুখ 'ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির' চট্টগ্রামে শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। সেখান থেকেই কংগ্রেসের মূল অহিংস নীতির সাথে তাদের প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব এবং যুব সম্প্রদায় অভ্যুত্থানের আয়োজন শুরু। উক্ত আটাশ সালেই কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে বিভিন্ন অঞ্চলের বিপ্লবে বিশ্বাসী দলগুলো যোগাদান করে, তাতে চট্টগ্রামের

দলটিও ছিল। এই অধিবেশন থেকে ফিরে চট্টগ্রামে তার খাকি সামরিক ধরনের পোশাক সজ্জিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করেন- যার জিওসি হন গণেশ ঘোষ। এরা অস্ত্র চালনা শিক্ষা এবং রাস্তায় প্রকাশ্যে প্যারেড করতেন।

গণেশ ঘোষের বাড়িকে কেন্দ্র করে সকল প্রকার বিপ্লবী কার্যক্রম পরিচালিত হতো। মাস্টারদা ১৯২৯ সালে চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক নির্বাচিত হবার পর একটি রাজনৈতিক সম্মেলন আহবান করা হয় পূর্ব নির্ধারিত সশস্ত্র বিপ্লবের রাজনৈতিক প্রস্তুতি হিসাবে (উনত্রিশ সাল)। এই রাজনৈতিক সম্মেলনে সুভাষ চন্দ্র বসু উপস্থিত হয়েছিলেন। এর পর মাস্টারদাকে সর্বাধিনায়ক নির্বাচিত করে পাঁচজন বিপ্লবীকে নিয়ে একটি 'বিপ্লবী পরিষদ' গঠিত হয়- সদস্যগণ ছিলেন মস্টারদা সূর্যসেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, নির্মল সেন, অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষ। রাজনৈতিক সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন দেশপ্রিয় জে, এম, সেনগুপ্ত।

প্রায় একই সময়ে ১৯২৯ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে 'পূর্ণ স্বাধীনতার' লক্ষ্যে রাজনৈতিক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, অনেকে মনে করেন বিপ্লববাদীদের দীর্ঘদিনের চাপে তখন এ প্রস্তাব নেয়া হয়েছিল। পরে গান্ধীজী ১১ দফার ভিত্তিতে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন করেন। ব্রিটিশ সরকার চরম নৃশংসতার সাথে এই অহিংস সত্যাগ্রহীদের দমন করে। চট্টগ্রামের বিপ্লববাদীদের পক্ষ থেকে এই হিংস্রতার জবাবদানের প্রস্তুতি চলে, এ ছিল তাৎক্ষণিক কারণ। গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহের দু'টি প্ল্যান পরীক্ষা করে মাস্টারদা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল ও উত্থানের একটি চূড়ান্ত পরিকল্পনা স্থির করার পর গণেশ ঘোষকে 'ফিল্ডমার্শাল মনোনীত করেন। বিপ্লবী পরিষদ ৭২ জন (মতান্তরে ৬৫ জন?) তরুণ-বিপ্লবীর তালিকা প্রস্তুত হবার পর সবার কাজ নির্ধারিত হয়। অস্ত্রাগার দখলের দিন, তারিখ ও সময় নির্ধারিত করা হয় ১৮ এপ্রিল রাত দশটা (১৯৩০সাল)। তালিকাভুক্ত বিপ্লবীদের মধ্যে কল্পনা দত্ত ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার নামে নূন্যপক্ষে দু'জন নারী বিপ্লবীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল বিপ্লব সংক্রান্ত তথ্য সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক দলিলসমূহের সঠিক সন্ধান পাওয়া দুষ্কর । হয়তো ব্রিটিশ সরকারের হাতে অনেক তথ্য পড়েছে, নয়তো বিপ্লবীরা নিরাপত্তাজনিত কারণেই অনেক কিছু নষ্ট করেছিলেন। যা কিছু পরবর্তী কালে পাওয়া গেছে বা সরকারী দফতরে ছিল অথবা জীবিতদের নিকট থেকে শুনে সকল তথ্যের সংযোজনে ইতিহাস রচিত হচ্ছে। বাংলাদেশের জন্যে এই বিদ্রোহ বিপ্লবের রক্তখচিত ঘটনাবলীর ইতিহাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। সে কারণে মাস্টারদার জন্ম শততম বার্ষিকীও গভীরভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এই সশস্ত্র যুব উত্থানের, যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিল, দিনটি সম্পর্কে উদাসীন থাকার কোন যুক্তি নেই। আপন ইতিহাসকে আলিঙ্গন না করলে নিজ সংগ্রামী ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করা হয়। সর্বাধিনায়ক মাস্টারদার নেতৃত্বে নির্ধারিত সময় রাত দশটাতেই এক সাথে আক্রমণ করা হলো পুলিশ অস্ত্রাগার ও ব্যারাকে এবং অক্সিলারী ফোর্স ব্যারাকে। মার্শাল ঘোষ ও ক্যাপ্টেন অনন্ত সিং-এর নেতৃত্বে ছয় জন বিপ্লবী পুলিশের অস্ত্রাগারে প্রচণ্ডভাবে গুলিবর্ষণ করে দখল করে নেন। লোকনাথ বল ও নির্মল সেনের নেতৃত্বে আটজন বিপ্লবী অক্সিলারী ফোর্সের অস্ত্রাগার কব্জাভুক্ত করেন। ছয়জন বিপ্লবী অম্বিকা চক্রবর্তীর অধীনে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের কেন্দ্রীয় অফিস দখল করে ধ্বংস সাধন করেন। ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের জন্যে ছয় জন বিপ্লবী নিয়ে নরেশ রায় অগ্রসর হন। আটজন বিপ্লবী উপেন্দ্র ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে প্রায় পঁয়ত্রিশ মাইল দূরবর্তী 'ধুম" ও 'লাঙ্গলকোর্টের রেল লাইন উপড়ে ফেলেন। এভাবে বিপ্লবী পরিষদ চট্টগ্রামের সাথে অন্যান্য স্থানের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন। রিপাবলিকান আর্মির এই আক্রমণের সময় ছাত্র-যুবকদের বিপ্লবী সংগ্রামের যোগদানের জন্যে আহবান জানিয়ে শহর নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলে সর্বাধিনায়ক মাস্টারদার দস্তখতসহ দুই বা তিনটি 'বিদ্রোহের প্রচারপত্র' দ্রুত বিলি করা হয়েছিল। এই বিপ্লবের অন্যতম কল্পতরু সেনগুপ্ত (৭৯)পরবর্তী সময়ে লিখেছেনঃ অস্ত্রাগার গুলো দখলের পর রিপাবলিকান আর্মির সভাপতি সূর্যসেন ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলন করেন। কমাণ্ডার গণেশ ঘোষের নির্দেশে ৬৪টি বন্দুক থেকে শূন্যে পরপর তিনবার গুলি চালিয়ে সভাপতিকে অভিবাদন জানান হলো। সভাপতি সূর্যসেন বললেন,'আজ বিশেষ গৌরবের দিন। আমাদের বাহিনী চট্টগ্রামের ব্রিটিশ সরকারের ঘাঁটিগুলো অধিকার করেছে। শত্রুর রক্ষীবাহিনী পরাস্ত। অত্যাচারী বিদেশী সরকারের অস্তিত্ব লুপ্ত। জাতীয় পতাকা আজ উচ্চে উড্ডীয়মান। জীবন ও রক্তের বিনিময়ে আমাদের একে সর্বতোভাবে রক্ষা করা কর্তব্য।'

এর পর অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের সম্মানে পুনরায় কমান্ডার গণেশ ঘোষের নির্দেশে তিনবার গুলি বর্ষণ করা হয়েছিল। প্রত্যেক সৈনিককে পুলিশ অস্ত্রাগারে মিলিত হবার পর রিভলবার, বন্দুক ও প্রচুর পরিমাণে কার্তুজ মার্শাল গণেশ ঘোষ প্রদান করেন বিপ্লবের কাজের জন্যে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে নিকটের ওয়াটার ওয়ার্কস-এর ছাদ থেকে 'লুইসগান' দিয়ে ব্যাপক গুলিবর্ষণ করতে থাকে। পাল্টা গুলিবর্ষণে ব্রিটিশ সেনারা পালিয়ে যায়। এর পর সমস্ত ইংরেজ সপরিবারে জাহাজ যোগে সমুদ্রে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। জাহাজ থেকে বেতারে কলকাতায় 'স্বাধীন চট্টগ্রামে'র খবর পাঠানো হয়।

পূর্বসিদ্ধান্ত মতে পুলিশ অস্ত্রাগারে আগুন লাগাবার সময় বিপ্লবী হিমাংশু সেন অগ্নিতে গুরুতররূপে আহত হন। আহতকে বাঁচাবার জন্যে গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, আনন্দ গুপ্ত ও জীবন ঘোষাল সেনকে গুপ্ত স্থানে নিয়ে যান। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁরা ফিরতে সক্ষম হননি। এই বিলম্বের সময় শত্রু পক্ষের আগমনের আশঙ্কায় মাস্টারদা অম্বিকা চক্রবর্তীসহ সকল বিপ্লবীদের নিয়ে জালালাবাদ পাহাড়ে অবস্থান নেন। এদিকে গণেশ ঘোষ ও অন্য তিনজন পুলিশ লাইনে ফিরে এসে দেখেন যে, তাঁরা মূল বাহিনীর সাথে যোগাযোগ করতে পারেননি। ইতোমধ্যে ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেল ও সুর্মাভ্যালি লাইট হর্স বাহিনী ইংরেজরা শহরে নিয়ে আসে। তাছাড়া রেলওয়ের ব্যাটালিয়নে একটি সেকশনকে নিয়ে তারা ব্যাপক অনুসন্ধানের পর মাস্টারদার বাহিনীর অবস্থান জানতে পারেন। ইংরেজ শাসকরা আর্মড ট্রেন নিয়ে অগ্রসর হয় জালালাবাদ পাহাড়ের দিকে। বিপ্লবী বাহিনীর সাথে সেই পাহাড়ে লোকনাথ বলের নির্দেশে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় ২২ এপ্রিল। এই যুদ্ধে পাহাড়েই বিপ্লবী বাহিনীর বারোজন নিহত হন এবং আহতদের কেউ কেউ নিরাপদ স্থানে যেতে পেরেছিলেন। গুরুতর আহতদের মধ্যে ছিলেন বিনোদ বিহারী দত্ত এগারো বছর আত্মগোপন করে থাকার পর তিনি গ্রেফতার হন এবং তাঁর দীর্ঘ দিনের কারাদন্ড হয়। তিনি এখনও বেঁচে আছেন। বিচারের সময় প্রকাশ পেয়েছিল যে, জালালাবাদ যুদ্ধে সরকারী বাহিনীর আশিজন সৈন্য নিহতদের তালিকায়। বিপ্লববাদীদের ১৮ এপ্রিলের উথান চার বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

গণেশ ঘোষ অপর তিন জনকে নিয়ে বাইশ তারিখেই যোগাযোগহীন অবস্থায় ট্রেনযোগে কলকাতা যাত্রা করেন। ফেনী স্টেশনে গভীর রাতে পুলিশ সন্দেহ করে তাদের আটক করে এবং স্টেশন মাস্টারের কক্ষে নিয়ে যায়। পুলিশ দেহ তল্লাশি করতে গেলেই গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিং দু' হাতে গুলি করতে করতে পুলিশের নাগালের বাইরে পালিয়ে যান। নানা পথে তারা পরে কলকাতায় পৌঁছান। 'যুগান্তর' দলের নেতাদের সাহায্যে চন্দননগরে একটি ভাড়া করা বাড়িতে তাঁরা আশ্রয় পান। ইংরেজদের এক চর আত্মগোপনকারীদের সন্ধান কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেয়ার পর কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার টেগার ১ সেপ্টেম্বর সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে উক্ত বাড়িটি ঘেরাও করে। বিপ্লবীদের সাথে গুলি বিনিময়ের সময় বিপ্লবী মাখন ঘোষালের মৃত্যু হয়। টেগার বাহিনী অপর সকলকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। রাজবিদ্রোহের অভিযোগে গণেশ ঘোষকে চট্টগ্রামে নিয়ে যাওয়া হয় প্রথম ট্রাইব্যুনালে বিচারের জন্যে। এই কারাগারেও তিনি বন্দীদের মুক্ত করার উদ্দেশ্যে ডিনামাইট দিয়ে কারা প্রাচীর উড়িয়ে দেয়ায় এবং ল্যাণ্ডমাইন দিয়ে কোর্ট বিল্ডিং, সায়েবদের বাংলো ইত্যাদি ধ্বংস করার পরিকল্পনা করেন। আত্মগোপনকারী মাস্টারদার সাথে যোগাযোগ রেখেই তাঁর পরিকল্পনা রচিত। ল্যাণ্ডমাইনসহ একজন বিপ্লবী ধরা পড়ার ফলে তাঁর কোন পরিকল্পনা (মে-জুন) কার্যকর হতে পারেনি, এর ফলে আরও আটজন গ্রেফতার হন। ১৯৩২ সালে বিচারে গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, অনন্ত সিং সহ কয়েকজনের ২৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও দ্বীপান্তর হয়। মাস্টারদা আত্মগোপন অবস্থায় থাকার কারণে প্রতিশোধের ভয়ে এদের নিশ্চিত ফাঁসির অর্ডার হয়নি। এঁদের দণ্ডাদেশের পর কলকাতায় আলিপুর জেলে কিছুদিন রেখে আন্দামানের সেলুলার জেলে প্রেরণ করা হয়। সেলুলার জেলে প্রবেশ করার সময় জেল অফিসার তাঁদের বলেছিলেন 'এখানে সিংহদের পোষ মানানো হয়।' কিন্তু সেলুলার কারাগারেও তাঁরা নয় দফার দাবিতে বিদ্রোহ করেছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি প্রামাণ্য পুস্তকের তথ্য অনুযায়ী ১৯৩২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর ইউরোপীয়ান ক্লাব সার্থকভাবে প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার আরও ছয়জনকে নিয়ে আক্রমণ করেন। সংঘাতের পর পুলিশের হাতে ধরা না পড়ার জন্যে তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। তেত্রিশ সালের ১৯ মে গহিরা গ্রামে সরকারী বাহিনীর সঙ্গে লড়াইতে দুই বিপ্লবীর মৃত্যু হয় এবং কল্পনা দত্ত (যোশী) ও তারকেশ্বর দস্তিদার শত্রু পক্ষের হাতে বন্দী হন।

ইতোপূর্বে ১৬ ফেব্রুয়ারি গৈরলা গ্রামে গুর্খা বাহিনীর সঙ্গে এক ভয়ানক সংঘর্ষের পর মাস্টারদা সুর্যসেন গ্রেফতার হন। দ্রুতগতিতে বিচারের ব্যবস্থা করে ইংরেজ সরকার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের অধিনায়ক ও অস্ত্রাগার দখলের পর চট্টগ্রামের স্বাধীনতার ঘোষক মাস্টারদা এবং তারকেশ্বর দস্তিদারকে ফাঁসির মঞ্চে হত্যা করেছিল -১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি!

আজ বাংলাদেশ ও ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে এই সমস্ত সশস্ত্র সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ এক গৌরবময় অধ্যায় রূপে বিধৃত- যা প্রজন্মের সন্তানদের সঞ্জীবিত করবে যুগ যুগ ধরে।

কামাল লোহানী — দৈনিক 'জনকণ্ঠ'

১৯৩০ সাল।১৮এপ্রিল, রাত পৌনে দশটা।ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক মাহেন্দ্রক্ষণ। ইতিহাস সেদিন নতুন করে লেখা হবে। বিপ্লব স্পন্দিত বুকে অগ্নিগর্ভ চট্টলার কিশোর সৈনিক বাহিনী দুনিয়াকে হতচকিত করে দেবে। নাড়ীর স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে যাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের। শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের বিজয় উল্লাস

সারা বাংলাকে করে দেবে উন্মাতাল।

পরিকল্পনা নেয়া হয়েছেঃ একই সাথে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আক্রমণ পরিচালনা করতে হবে। সবকিছু নির্ধারণ করা হলো কোন্ কোন্ জায়গায় হামলা পরিচালিত হবে। এবং কে দায়িত্বে থাকবেন। আর তাঁদের সাথে কারা থাকবেন। এ সবই ঠিক করে নেয়া হল। বিপ্লবী অথচ শান্ত অমায়িক এক দৃঢ়প্রত্যয়ী পুরুষ সূর্যসেন এর নেতা। তিনি তখনও চট্টগ্রাম যুগান্তর দলের বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ এক সাহসী সংগঠক। তাঁরা আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের আড়ালে এ ধরনের আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। না হলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদল অঙ্কুরেই একে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। তাই বিপ্লবী তরুণরা ভারতীয় কংগ্রেসের ভিতর ঢুকে পড়লেন এবং ধীশক্তি ও সাহস-দক্ষতার কারণে সূর্যসেন এর চট্টগ্রাম জেলা সম্পাদক নির্বাচিত হলেন।

ফলে বিপ্লবীদের কাজ করতে বেশ সুবিধা হলো। শুরু হলো চট্টগ্রাম অস্ত্রাগারের উপর পরিকল্পিত হামলা পরিচালনার সকল প্রস্তুতি। অর্থ সংগ্রহ, অস্ত্র যোগান এবং কর্মী বাহিনী সৃষ্টি করার কাজে নেতৃস্থানীয় সবাই লেগে গেলেন।

খবর এলো-পাহাড়তলী রেলওয়ে অক্সিলিয়ারী ফোর্স- এর অস্ত্রাগার হস্তগত হয়েছে কিন্তু রজত সেনের গুলিতে সার্জেন্ট ফেবেল মারা গেছে। ফলে ভীত-সন্ত্রস্ত ইংরেজ অফিসারেরা পালিয়ে গেছে অন্যত্র। আর কিছু পরিবার পরিজন নিয়ে গিয়ে উঠেছে নদীবক্ষে অপেক্ষমান জাহাজে। শোরগোল পড়ে গেল সর্বত্র। দারুণ উত্তেজনা। ইংরেজদের অমিত তেজ কোথায়? বাংলার কিশোর মুক্তিপাগলদের কাছে একেবারে অপদস্ত।

আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করার দায়িত্বে ছিলেন অম্বিকা চক্রবর্তী। আর তাঁকে সাহায্য করতেন শশাঙ্ক চৌধুরী। কলকাতায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কের ধারেই মীর্জাপুর স্ট্রীটে গোপন আশ্রয়স্থল ছিল। বিপ্লবীদের সূর্যসেন এখানে থাকতেন এবং সবার সাথেই যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। ভিতরে কি হচ্ছে তাকে আবৃত করে রাখার জন্যে সামনে ছিল ডাইক্লিনিং লণ্ড্রী আর এটারই ম্যানেজার ছিলেন শশাঙ্ক। কলকাতার বিপ্লবী সহযোদ্ধাদের মধ্যে আব্দুর রাজ্জাক খান আর অনুকূল মুখোপাধ্যায় এই কাজে তাঁদের প্রতিনিয়ত সাহায্য করেছেন।

অর্থ সংগ্রহটা মূলত ডাকাতির মাধ্যমেই সম্পন্ন হতো। কিন্তু এ পদ্ধতিতে প্রায়ই পুলিশী হামলার সম্মুখীন হতে হতো বলে বিপ্লব প্রস্তুতির নেতা সূর্যসেন এবারে এক নতুন কৌশল আবিষ্কার করলেন এবং কাজে লাগালেন। নতুন কৌশল হল পারিবারিকভাবে অর্থ সংগ্রহ করা। পরিবারের সকল সদস্যই এতে অংশগ্রহণ করবেন, তাতে এর পরিকল্পনা ফাঁস হবার কোন আশঙ্কা থাকবে না এবং নিশ্চিত তহবিলেরও একটি নিশ্চয়তা বিধান করা যাবে। সেকালে বাঙালী পরিবারের মধ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মানসিকতা প্রচণ্ডভাবে কাজ করতো বলেই এই পদ্ধতিতে অর্থ সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে সফলতা মিলেছিল। কোন ঝামেলাও পোহাতে হয়নি এর পর। আর অর্থ সংগ্রহ থেকে বিপ্লবীরা অস্ত্রাগার দখলের সময় ব্যবহারের জন্য দুটো গাড়িও কিনেছিলেন।

চট্টগ্রামে অস্ত্রসংগ্রহের ব্যাপারেও মাস্টারদা একই পদ্ধতি কাজে লাগিয়েছিলেন। আত্মীয়-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবের পরিবারে যাঁদের নামে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার লাইসেন্স ছিল,তাঁদের ব্যক্তিগত অস্ত্র সংগ্রহ করতে শুরু করে দিলেন তিনি। এছাড়া বাইরে থেকে যেসব অস্ত্র সংগৃহীত হচ্ছিল, সেগুলো হস্তান্তরের জন্য তাঁরা নোয়াখালীর ফেনী ও চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড রেল স্টেশন ব্যবহার করছিলেন। এসব অস্ত্র ব্যবহার ও চালনা শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট কিছু চৌকুস কর্মী বাছাই করা হল এবং এদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনে সাগর সৈকত, পাহাড়ের পাদদেশ আর নির্জন নদীতট বেছে নেয়া হলো।

সব সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে রূপায়ণের জন্য বিপ্লবীদের প্রয়োজন বৃটিশ শাসক- শোষকচক্রের অনুচরদের উপর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা- অর্থাৎ গুপ্তচরের কাজ করতে হবে। ওদের গতিবিধি বুঝতে না পারলে বিদ্রোহ প্রস্তুতি ফলপ্রসূ হবে না । তাই এক দলকে দেয়া হলো গোয়েন্দাবৃত্তির দায়িত্ব এবং এরাই বৃটিশ সেনাবাহিনী ও তাদের সংরক্ষিত অস্ত্রগারেরও খবর সংগ্রহ করবেন। আর বোমা তৈরির কাজ দেয়া হলো একদল সাহসী ও নিঃশঙ্কচিত্ত কর্মীর উপর। যাঁরা সতর্কতার সাথে এ কাজটি সম্পাদন করতে পারবেন তাঁদের উপর।

মাস্টারদা সূর্যসেন বিদ্রোহের সুপরিকল্পিত ছক অনুযায়ী প্রস্তুতি পর্বের সকল কাজ সম্পন্ন হবার পর লক্ষ্যস্থলের বিভাগগুলো অনুমোদন করলেন। (ক) নিজাম পল্টনের সরকারী অস্ত্রাগার ও রেলওয়ের অক্সিলিয়ারী ফোর্সের অস্ত্র গুদাম লুট। (খ) টেলিগ্রাম ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জে আক্রমণের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার ধ্বংসসাধন। (গ) ট্রেজারী দখল করে টাকা পয়সা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণ।(ঘ) জেল আক্রমণ ও স্বদেশী কয়েদীদের মুক্তিদান এবং (ঙ) ইউরোপীয় ক্লাবের উপর হামলা।

বিদ্রোহ পরিচালনার জন্যে সার্বিক দায়িত্বে রইলেন মাস্টারদা সূর্যসেন। অস্ত্রাগার হামলার জন্য অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষ, পাহাড়তলী রেলওয়ে অক্সিলিয়ারী ফোর্সের অস্ত্র গুদাম আক্রমণ পরিচালনা করবেন লোকনাথ বল ও নির্মল সেন। তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার দায়িত্ব অম্বিকা চক্রবর্তীর। রেল যোগাযোগ বিকল করবার জন্য দায়িত্ব অর্পিত হলো উপেন ভট্টাচার্যের উপর। এমনিভাবে সবকিছু সুনির্দিষ্ট করে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের দিনক্ষণের জন্য বিপ্লবী কিশোর যুবক মুক্তিযোদ্ধারা প্রস্তুত হলেন।

স্কুল আর কলেজের সাহসী তরুণদের নিয়ে গঠিত এই বাহিনীতে সেদিন যাঁরা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন এবং দেশমাতৃকাকে বৃটিশসাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার প্রতিজ্ঞায় নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন,তাঁদের মধ্যেঃ(১) মধু দত্ত (২) বিধু ভট্টচার্য (৩) শশাঙ্ক দত্ত (৪) হিমাংশু সেন। কলেজের ছাত্র ছিলেন(১) শৈলেশ্বর চক্রবর্তী (২) মনীন্দ্র গুহ (৩) নারায়ণ সেন (৪)সুবোধ বল (৫) দেবপ্রসাদ গুপ্ত (৬)রজত সেন (৭) ফণী নন্দী (৮) শ্রীপতি চৌধুরী ((৯)দ্বিজেন দস্তিদার (১০) নিতাই ঘোষ (১১) বিধু সেন (১২) বিনোদ বিহারী চৌধুরী (১৩) মনোরঞ্জন সেন (১৪) স্বদেশ রায় (১৫) সৌরিন দত্ত চৌধুরী (১৬) সুবোধ চৌধুরী (১৭) অমর নন্দী (১৮) সুধাংশু বসু।

এ ছাড়া অধিকাংশই ছিলেন নানান স্কুলের ছাত্র যারা বয়সে ছিলেন একেবারেই কিশোর। দুরন্ত প্রত্যয় নিয়ে তাদের লড়াইয়ের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে মাতৃভুমির মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে। এরা হলেনঃ (১) অর্ধেন্দু দস্তিদার (২) মতি কানুনগো (৩) নরেশ রায় (৪) প্রভাস বল (৫) হরিগোপাল বল (টেগরা) (৬) লাল মোহন সেন (৭) নির্মল লালা (৮) ত্রিপুরা সেন (৯) জীতেন দাশগুপ্ত (১০) পুলিন ঘোষ (১১) মহেন্দ্র চৌধুরী (১৪) ক্ষীরোদ ব্যানার্জী (১৫) ভবতোষ ভট্টাচার্য্য (১৬ সীতারাম বিশ্বাস (১৭) হেমেন্দু দস্তিদার (১৮) বিনোদ দত্ত (১৯) বনবিহারী দত্ত (২০) ধীরেন দে (২১) হরিপদ মহাজন (২২)সুরেশ দেব (২৩) সরোজ গুহ (২৪) আনন্দ গুপ্ত (২৫)ফকির সেন (২৬) সুকুমার ভৌমিক (২৭) অশ্বিনী চৌধুরী (২৮) রণধীর দাস (২৯) সহায়রাম দাস (৩০) শান্তি নাগ (৩১) ননী গোপাল দেব (৩২) অনিল ঘোষ ও (৩৩) সুবোধ রায়।

প্রস্তুতি পর্বে বোমা তৈরির কাজে নিয়োজিত ছিলেন তারকেশ্বর দস্তিদার, রামকৃষ্ণ বিশ্বাস এবং অর্ধেন্দু দস্তিদার। এঁরা সবাই ছিলেন মাস্টারদার খুবই অনুগত এবং বিশ্বস্ত। কিন্তু একদিন বোমা তৈরির সময় এক দুর্ঘটনায় এরা তিনজনই গুরুতরভাবে আহত হন।তবে অর্ধেন্দু খুব শিগগিরই সুস্থ হয়ে উঠায় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করতে পেরেছিলেন কিন্তু তারকেশ্বর দস্তিদার ও রামকৃষ্ণ বিশ্বাস পারেননি। কারণ এদের ক্ষত বেশি থাকায় সুস্থ হতে সময় একটু বেশি লেগেছিল।

সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে পর, চট্টল বিপ্লবের তরুণ দুঃসাহসী, অকুতোভয় সৈনিকরা তৈরি এবার স্বদেশের মুক্তির লক্ষ্যে। কখন আসবে সেই নির্ধারিত সময়, যখন বিদ্রোহের ডঙ্কা বেজে উঠবে চট্টলায় আর ইংরেজ প্রভুদের পাততাড়ি গুটোবার সময়ের ঘন্টা বাজবে।

অবশেষে ঘড়ির কাঁটা পৌনে দশটা বাজবার সংকেত জানিয়ে দিল। কমরেড গণেশ ঘোষ এবার বেরিয়ে পড়লেন। পরনে তাঁর সামরিক পোশাক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার। একটি গাড়ি নিয়ে বেরুলেন নিজেরই বাড়ি থেকে। অনন্ত সিং চালাচ্ছেন গাড়ি আর সহযোদ্ধা তিনজন-হিমাংশু সেন হরিপদ মহাজন এবং বিনোদ দত্ত। এদের উপর রিজার্ভ পুলিশ এবং সরকারী অস্ত্র গুদামে হামলা চালিয়ে পর্যাপ্ত অস্ত্র সংগ্রহ করার একমাত্র দায়িত্ব।

বেরুলেন লোকনাথ বল ও নির্মল সেন। এদের উপর পাহাড়তলী রেলওয়ে অক্সিলিয়ারী ফোর্সের অস্ত্রাগার লুট করে অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ সংগ্রহ করার দায়িত্ব। এঁরা লোকনাথ বলের বাসা থেকে দলসহ গাড়িতে বের হলেন সেই নির্ধারিত মোক্ষম মুহূর্তে। সংগে রজত সেন,ফণী নন্দী আর সুবোধ চৌধুরী। গাড়ি চালাচ্ছেন জীবন ঘোষাল।

একই সময় কমরেড অম্বিকা চক্রবর্তী বেরিয়ে পড়লেন সহকর্মীদের নিয়ে। তিনি যাত্রা করলেন অফিস থেকে। গাড়ির চালক আনন্দ গুপ্ত। এঁরা চলেছেন বৃটিশ বেনিয়াদের সকল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেবার লক্ষ্যে আক্রমণ পরিচালনা করতে টেলিফোন এক্সচেঞ্জে।

নির্দিষ্ট সময়ে উপেন ভট্টাচার্য ছুটে চললেন তাঁর সহযোদ্ধা দলকে নিয়ে রেলওয়ে বিকল করে দেবার মানসে। এছাড়া তিরিশজন কিশোর বিপ্লবীর একটি বাহিনী এগুলো সরকারী অস্ত্রাগারের দিকে। তাঁদেরকে ওখানেই ধারে কাছে থাকতে হবে। এখানে একে একে কাজ শেষ করে সবাই একত্রে মিলিত হবেন। তারপর তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট কাজ করতে হবে। অনেকটা রিজার্ভ বাহিনীর মতন।

চট্টল বিদ্রোহের বিপ্লবী সর্বাধিনায়ক মাস্টারদা সূর্যসেন একটি দলকে নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে চলেছেন সরকারী অস্ত্রাগারে দিকে। এঁরা চললেন গাড়িতে। সহযাত্রী বিধু ভট্টাচার্য ,সরোজ গুহ এবং মহেন্দ্র চৌধুরী।

সুপরিকল্পিতভাবে নির্দিষ্ট দলগুলো লক্ষ্যবস্তুর উপর আঘাত হানবার উদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়ে নিজ নিজ আস্তানা থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

চট্টল পাহাড় আর টিলায় ঘেরা শহর। মাঝে মাঝে একটি পথ চলেছে উত্তর-দক্ষিণে এগিয়ে। এ পথেরই একপাশে একটি পাহাড়ে পুলিশের ছাউনি। উল্টো দিকেই আরেকটি পাহাড়ের বুকে বিপ্লবীদের লক্ষ্যস্থল-সরকারী অস্ত্র গুদাম। এটা দখল করা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। কারণ মুক্তি সংগ্রামের অভিযাত্রায় প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র,গোলাবারুদ প্রয়োজন হবে বিপ্লবীদের। এখানে নির্ধারিত সময় গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিং তাঁদের দলবল নিয়ে উপস্থিত। ওদিকে বিপ্লবী রক্ষীদল নিয়ে উপস্থিত সূর্যসেন। প্রথম হামলাতেই এ অস্ত্রাগার দখল করে নিলেন বিপ্লবীরা এবং এটাকেই বিপ্লবীদের সদর দফতর হিসাবে ঘোষণা করলেন।

অন্যান্য লক্ষ্যস্থলের খবর এসে তখনও পৌঁছায়নি। তবে সবাই নিশ্চিত,যাঁর যে দায়িত্ব ছিল, তা ঠিকই পালন করা হয়েছে। হলোও তাই। খবর এলো- পাহাড়তলী রেলওয়ে অক্সিলিয়ারী ফোর্স- এর অস্ত্রাগার হস্তান্তর হয়েছে। কিন্তু রজত সেনের গুলিতে সার্জেন্ট ফেরেল মারা গেছে। ফলে ভীত সন্ত্রস্ত ইংরেজ অফিসারেরা পালিয়ে গেছে অন্যত্র। আর কিছু পরিবার-পরিজন নিয়ে গিয়ে উঠেছে নদীবক্ষে অপেক্ষমান জাহাজে।

শোরগোল পড়ে গেলো সর্বত্র। দারুণ উত্তেজনা। ইংরেজদের অমিততেজ কোথায়? বাংলার কিশোর মুক্তিপাগলদের কাছে একেবারে অপদস্ত কিন্তু হতমান সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কি একে সহজে মেনে নেবে? সব ক্ষমতাই তো ওদের হাতে। তবু সরকারী অস্ত্রাগারে বিপ্লব বাহিনীর সদর দফতর স্থাপিত হলো এবংইণ্ডিয়ান রিপাবলিক আর্মির পতাকা উড়তে থাকল। সর্বাধিনায়ক বিপ্লবী বীর মাস্টারদা সূর্যসেন ঘোষণা করলেন জাতীয় সরকার গঠনের কথা।

কী প্রচণ্ড উল্লাস কিশোর বিপ্লবী প্রাণে। মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করার দৃঢ়প্রত্যয়ী শপথ আজ তাদের। আদালত প্রাঙ্গণ সচকিত হয়ে উঠল। প্রাণে প্রাণে সে কি স্পন্দন। কিন্তু মাস্টারদাকে অকস্মাৎ হোঁচট খেতে হলো অনন্ত সিংহের এক আবেগতাড়িত সিদ্ধান্তে এবং সকল কর্মকাণ্ড স্তব্ধ হয়ে গেল। আক্রমণাত্মক অভিযাত্রা রক্ষণাত্মক কৌশলের লড়াইয়ে পরিণত হলো।

পুলিশের আর্মারীর উপর হামলা চালাবার উদ্দেশ্যে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগাতে গিয়ে হিমাংশু নিজেই অগ্নিদগ্ধ হলেন। একদিকে আগুনের লেলিহান শিখা চট্টলার আকাশটাকে লাল করে দিয়েছে। আর অন্যদিকে এই আগুনে পুড়ে হিমাংশু সেন কাতরাতে কাতরাতে ছুটে এসেছেন মাস্টারদার কাছে। অনন্ত সিং,গণেশ ঘোষ অবাক। মাস্টারদা ভাবছেন এ কি কাণ্ড! আবেগে আপ্লুত অনন্ত সিং চঞ্চল হয়ে উঠলেন এবং তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিজেই নিলেন, হিমাংশুকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। গিয়ে কোলে তুলে নিলেন হিমাংশুকে এবং গাড়িতে তুললেন। গণেশ ঘোষ সঙ্গ নিলেন ওদের এবং মাখন ঘোষাল ও চললেন তাঁদের সাথে। গাড়ি চলল হাসপাতাল পানে। হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন মাস্টারদা। এখনতো সিদ্ধান্ত নেবার সময়। এই সময় অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষের অনুপস্থিতি সূর্যসেনকে অনেকটাই ভাবিত করে তুললো। কারণ দায়িত্বশীল ও যোগ্য সহকর্মী না থাকলে পরবর্তী কার্যক্রম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবেন কি করে? তাই অপেক্ষায় রইলেন। কিন্তু বেশ খানিকটা সময় কেটে গেল, ওরা ফিরলেন না। তখন আত্মগোপন করবার সিদ্ধান্ত নিলেন সূর্যসেন। এছাড়া কোন উপায় ছিল না। বিপ্লবী সেনাবাহিনী অম্বিকা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে শহরের কাছে একটি পাহাড়ে আশ্রয় নিলো। ফলে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনকে কেন্দ্র করে গণমনে মাতৃমুক্তির যে আশা সঞ্চারিত হয়েছিল, আপাতত তার অপমৃত্যু ঘটলো। বিপ্লবীদের আবেগ প্রবণ হলে যে চলে না, তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ হয়ে রইলো হিমাংশুকে নিয়ে অনন্ত সিংহের হাসপাতালে ছুটে যাওয়ার ঘটনা। সুপরিকল্পিত চট্টল বিদ্রোহের দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি ধসে পড়ল। লড়াই এক নতুন মোড় নিলো। শ্বেতাঙ্গ শোষক দল মার খেয়ে জাহাজে আশ্রয় নিলেও কিন্তু প্রতিহিংসার কুচক্রী পথ ধরে এগিয়ে চললো এবং কলকাতায় খবর পাঠাল সৈন্য বহরের জন্য।

পরদিন ভোরে সুলুকবহর পাহাড়ে আশ্রয় নিলেন মাস্টারদা। সারা রাত হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত প্রায় সবাই। তারও পরদিন ভোরবেলা বিপ্লবী কিশোর বাহিনী গিয়ে উঠলেন ফতেহাবাদ পাহাড়ে। সেখান থেকে চোখে পড়লো নতুন সৈন্যদল এসেছে চট্টগ্রামের সরকারী বাহিনীকে সহায়তা করতে। এরা হলো- ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার্স রাইফেল এবং সুরমা ভ্যালী ফোর্স।

এদিকে পথশ্রমে ক্লান্ত বিপ্লবী বাহিনী। পেটে দানা পড়েনি ক'দিন হলো। ঘুমও হয়নি। পানি পর্যন্ত মিলছে না। এমন অবস্থায় অম্বিকা চক্রবর্তী বেরুলেন কোথাও থেকে কিছু খাবার খুঁজে আনা যায় কি-না। ধারে কাছে একটি গ্রাম থেকে অবশেষে এক হাঁড়ি খিচুড়ি আর সামান্য পানির ব্যবস্থা করলেন। যদিও বা খানিকটা স্বস্তি

ফিরে পেলেন কিন্তু সংগ্রাম অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে তাঁদের শহরে যাবার যে প্রয়োজন তাতো আর সম্ভব হচ্ছে না। এদিকে নতুন সৈন্যবাহিনী এসে হাজির হয়েছে। ওরা পাহাড়ের দু'পাশ দিয়ে এগিয়ে আসছে কর্নেল ডেলাস্মিথের নেতৃত্বে। বিনা বাধায় ওরা এগিয়ে চলেছে। কিন্তু বিপ্লবী বাহিনীর কথা ভেবে গুলিও ছুড়ছে।

সর্বাধিনায়ক ওদের উপর গুলি চালাবার নির্দেশ দিলেন। লোকনাথ বল কিশোর বিপ্লবী বাহিনীকে দু'পাশে জমায়েত করলেন। দিলেন গুলির জওয়াব। বাধলো লড়াই। চললো দুঘন্টা। সে কী তুমুল লড়াই। পেটে ক্ষিধে পুষে বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে একেবারে ক্লান্ত সবাই, সাময়িক মার খাওয়া কিছুটা মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল কিশোর যুবকরা তবুও দেশপ্রেম স্বদেশের মুক্তির লক্ষ্যে উৎসর্গিত প্রাণ এই বিপ্লবীবাহিনী মরিয়া হয়ে লড়াই করলো। ইংরেজদের আমদানি করা নয়া গোরা সৈন্য প্রাণ হারায় ২৫০ জন তবে বিপ্লবীরাও ১২জন শহীদ হলেন এই স্বদেশী যুদ্ধে। কিন্তু ইংরেজ বাহিনীকে পিছু হটতে বাধ্য করে। যাঁরা দেশের মুক্তির জন্য সাম্রাজ্যবাদী শোষক- শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রাণ বিসর্জন দিলেন, তাঁরা হলেনঃ (১) নির্মল লালা (২) মতি কানুনগো, (৩) মধুসূদন দত্ত, (৪) নরেশ রায়, (৫) বিধু ভট্টাচার্য, (৬) জিতেন দাসগুপ্ত, (৭) অর্ধেন্দু দস্তিদার, (৮) প্রভাস বল, (৯) পুলিন ঘোষ, (১০) শশাঙ্ক দত্ত, (১১) টেগরা (হরি বল), (১২) ত্রিপুরা সেন।

যুদ্ধের পর সন্ধ্যা অতিক্রান্ত। যুদ্ধে জয়ী হয়েও সর্বাধিনায়ক সুর্যসেন নির্দেশ করলেনঃ পাহাড় ছেড়ে এবারে গ্রামে আশ্রয় নিতে হবে। তিনি লড়াইয়ের কৌশল পাল্টাবেন। মাস্টারদার সুযোগ্য সহচর ও সহযোদ্ধা অম্বিকা চক্রবর্তী ও অর্ধেন্দু দস্তিদার গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন, তাঁদের ফেলেই যেতে হবে। বিদায় বেলায় কিশোর বাহিনী বেদনা ভারক্রান্ত হৃদয়ে সেনাপতি লোকনাথ বলের নির্দেশে সামরিক কায়দায় শহীদ বীরদের জানালেন শেষ রক্তিম অভিবাদন।

জালালাবাদ পাহাড়ের চূড়ায় সুর্যরশ্মির উষ্ণ স্পর্শ আজও শহীদ স্মরণে দৃঢ়প্রত্যয় ঘোষণা করে মাতৃভুমির সার্বিক মুক্তির তরে। তারপর চললো সংগ্রাম নতুন পথে। বিপ্লবী বাহিনীর সবাই ধরা পড়ে গেছেন। সূর্যসেনই কেবল বাইরে। তাঁকে ধরার জন্য পুলিশের প্রাণান্ত চেষ্টা চলছে। কিন্তু কিছুতেই তাঁকে ধরা সম্ভব হচ্ছে না। সূর্যসেনের মাথার দাম ঘোষণা করা হলো দশ হাজার টাকা। ইংরেজরা পয়সা ছড়িয়ে দালাল ও বিশ্বাসঘাতক সৃষ্টি করছে বটে কিন্তু সুর্যসেন কে এবং কোথায়, তার হদিস মিলছে না। চট্টগ্রামের মানুষের উপর নেমে এলো অকথ্য নির্যাতন। আর এই পুলিশী নির্যাতনের নায়ক গোয়েন্দা পুলিশ ইন্সপেক্টর 'খান বাহাদুর' আহসান উল্লাহ। সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঢেলে মানুষের মনকে ক্ষুদ্ধ করার প্রয়াসে এই খান বাহাদুর প্রবরই সূর্যসেনকে 'হিন্দু সন্ত্রাসী বলে চিহ্নিত করে। এমনকি গুণ্ডা বাহিনীও সৃষ্টি করে এই কাজ করবার জন্য। কিন্তু তরুণ মুসলিমদের মধ্যেও দেশপ্রেম ছিল। তাই তারা বিপ্লবীদের সাহস ও মাতৃভক্তিকে শ্রদ্ধা করতেন। আহসান উল্লাহর এই ঘৃণ্য পরিকল্পনা খুব একটা কাজে লাগলনা। ফলে এমন একটি ব্যবস্থা নেয়া হলো যে, পুলিশের অনুমতি ছাড়া কোন যুবকই রাস্তায় চলাফেরা করতে পারবে না।

এর মধ্যে আত্মসর্মপন করলেন অনন্ত সিং। যুক্তি তাঁর, যেভাবে নির্যাতন চলছে জনগণের উপর, তা লাঘবের জন্যই তিনি আত্মসর্মপণ করলেন। এতে লাঘবতো হলোই না। পুলিশ বরং দুর্বলতা ভেবে অত্যাচার বাড়িয়ে দিল এবং বিপ্লবীদের গোপন খবর পাবার জন্য গুপ্তচর ও দালাল সৃষ্টি করতে শুরু করল। এমনি ভাবে গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল,আনন্দ গুপ্ত এমকি অম্বিকা চক্রবর্তীও অসুস্থাবস্থায় গ্রেফতার হলেন। শাসক বৃটিশরাজ সাজালো 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন' মামলা। এই মামলায় আসামী পক্ষ সমর্থন করলেন- (১) ব্যারিস্টার শরৎ বোস, (২) সন্তোষ বসু, (৩) বীরেন শাসমল, (৪) অখিল দত্ত, (৫) কামিনী দত্ত এবং (৬) যামিনী ঘোষাল। মামলার রায়ে ১৯ জন খালাস পেলেন কিন্তু আত্মসর্মপনকারী অনন্ত সিংসহ ১৪ জনের হলো যাবজ্জীবন কালাপানি। আন্দামান দ্বীপের বন্দী শিবিরে হলো দ্বীপান্তর। এছাড়া অম্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, সুখেন্দু দস্তিদার, ফণী নন্দী, সুবোধ চৌধুরী এরাও ছিলেন।

কিন্তু এর মাধ্যমেই কি চট্টল বিপ্লবের স্পন্দন একেবারেই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল? না, তা হয়নি এবং হয়ও না। তা কেবল সময়ের ব্যাপার। সেই বৃটিশকে খেদিয়ে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। তবে কংগ্রেস আর মুসলিম লীগের চক্রান্তে দেশটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান নাম ধারণ করেছিল। কিন্তু তাই কি? টেকেনি পাকিস্তান। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে. ভিন্ন ভাষা- সংস্কৃতি- সাহিত্যের মানুষ গুলোর নয়, অর্থগৃধ্নু শোষক পুঁজিপতিদের জন্য বিপুল রক্ত খরচ হয়েছে আমাদের তবু বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছি আমরা।

আজও চট্টগ্রাম আমাদের রাজনৈতিক জীবনের নানা ধাপে প্রগতিশীল ও জাতীয় সংস্কৃতিসমৃদ্ধ কর্মকাণ্ডের রূপায়ণ ঘটাচ্ছে এবং তা কেবল স্বদেশের মুক্তির লক্ষ্যে, স্বাধীনতাপ্রিয়তায় এবং মুক্তিযুদ্ধের সেই চিরন্তন প্রেরণাকে অনুসরণ করেই। তাই ধন্য চট্টগ্রাম। অমর রহে সূর্যসেন। বিপ্লবের প্রদীপ্ত শিখা একদিন জ্বলবেই এবং একদিন সত্যের ভোর আসবেই।

চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের নায়ক সূর্যসেন চট্টগ্রামের রাউজান থানার নোয়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। হালদা ও কর্ণফুলী নদীর দু'তীরে সূর্যসেনের শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হয়। চট্টগ্রাম সরকারী কলেজে সূর্যসেনের উচ্চশিক্ষার সূত্রপাত এবং বহরমপুর কলেজে তার সমাপ্তি। বি, এ ডিগ্রি লাভ করার অব্যবহিত পরেই তিনি চট্টগ্রাম শহরের উমাতারা স্কুলে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। তিনি ছিলেন অঙ্কশাস্ত্রের শিক্ষক। আলাপে, আচরণে সূর্যসেন ছিলেন অতি বিনয়ী। চারিত্রিকগুণে, মধুর ব্যবহারে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ছাত্রদের মন জয় করে নিতে পারতেন। এ জন্যই ছাত্ররা তাঁকে 'মাস্টার-দা' নামে সম্বোধন করতো।

মহানায়ক সূর্যসেনের প্রধান সহকর্মী ছিলেন অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল ও নির্মল সেন প্রমুখ নেতা। সূর্যসেন ও তাঁর সহকর্মীদের বীরত্বগাথা আজো চট্টগ্রামবাসীর মুখে মুখে শোনা যায়। যুব নেতৃবৃন্দ যেমন ছিলেন অসীম সাহসী তেমনি তাঁদের গায়ে ছিল অফুরন্ত শক্তি। অনন্ত সিংহ এক জায়গায় লিখেছেন, নিজের বড়াই করা কতো যে অশোভন তার সম্যক উপলব্ধি থাকা সত্ত্বেও..... এখানে তার অবতারণা করছি। .....আমি সে যুগের অনন্ত সিংহ। অসহযোগ আন্দোলনের পুরোভাগের অনন্ত সিংহ। জমিদার বাড়ি লুট, রেল কম্পানির অর্থ করায়ত্তকারী অনন্ত সিংহ। নাগরখানা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অনন্ত সিংহ।" অনন্ত সিংহ স্থানে স্থানে ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠাতে মন দিয়েছেন। দেখতে দেখতে চট্টগ্রাম শহরে বহু ক্লাব গড়ে ওঠে, তন্মধ্যে চন্দনপুরা ক্লাব ও সদরঘাট ক্লাব উল্লেখযোগ্য। ব্যায়াম শিবিরে ও বিভিন্ন ক্রীড়া প্রদর্শনীতে লোহার পাত দুমড়ানো, চলন্ত মোটর গাড়ির গতিরোধ করা, বুকের উপর দিয়ে ৮০ মণ ওজনের ভারী লোহার রোলার চালিয়ে এই অনন্ত সিংহ দর্শকবৃন্দের মনে চমক সৃষ্টি করেছেন। ... অনন্ত সিংহের কাহিনী জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহের সৃষ্টি করে চলেছে। সূর্যসেন ও তাঁর অনুগামীরা এসব কর্মকান্ডের ভেতর দিয়ে ছাত্র ও যুবকদের মাঝে উপস্থিত হয়েছিলেন তাদের প্রধান নেতারূপে। সঙ্গত কারণেই স্বাধীনতার যুপকাষ্ঠে আত্মাহুতি দেওয়ার জন্য শ' শ' ছাত্র-যুবক হয়েছিল ঘরছাড়া।

১৯৩০ সাল ১৮ এপ্রিল। যুগপৎ আক্রমণে চট্টগ্রাম শহর বিপ্লবীদের অধিকারে আসে। সূর্যসেন ও তাঁর সহযোদ্ধারা চট্টগ্রামকে তিনদিন স্বাধীন রাখেন। ২২ এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশ সামরিক অফিসার কর্নেল ডালাস স্মিথ পরিচালিত সেনাবাহিনীকে পর্যুদস্ত করে বিপ্লবের অগ্নিমশাল তুলে ধরে রাখলেন সূর্যসেন ও তাঁর অনুগামীরা। এই সম্মুখযুদ্ধে ৬৪ জন ইংরেজ সেনা নিহত এবং ১০০ জন আহত হয়। ১১ জন বিপ্লবী এই যুদ্ধে শহীদ হন, তন্মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন টেগরা বল ও অর্ধেন্দু দস্তিদার। তাঁদের দু'জনের বয়স ছিল ১৪ বছরেরও নিচে।

ফেনী ষ্টেশনের খন্ডযুদ্ধ, ফিরিঙ্গি বাজারে তরুণ বিপ্লবী অমরেন্দ্র নন্দীর আত্মদান, কালার পোলে অবিস্মরণীয় রক্তাক্ত সংগ্রাম, চন্দননগরে নিশীথের অন্ধকারে চার্লস টেগার্টের বিরুদ্ধে লড়াই, ধলঘাট ও গহিরায় সম্মুখ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মাস্টারদা ও তাঁর সঙ্গীরা অপূর্ব বিচক্ষণতা ও অসীম সাহসের পরিচয় দিয়ে দেশবাসীকে স্বাধীনতার লড়াইয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করে তুললেন। চাঁদপুরে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালীপদ চক্রবর্তীর পিস্তলের গুলিতে পুলিশ ইন্সপেক্টর তারিণী মুখার্জীর শোণিত প্রবাহ, প্যারেড গ্রাউন্ডে হরিপদ ভট্টাচার্যের অব্যর্থ গুলিতে খান বাহাদুর আসহান উল্লাহর জীবনাবসান, বরমায় তারেকেশ্বর দস্তিদার-এর গুলিতে গোয়েন্দা কর্মচারীর পঙ্গুত্ববরণ, ধলঘাটে ক্যাপ্টেন ক্যামেরুণের রক্তধারা প্রভৃতি ঘটনাবলী দেশবাসীকে ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামে প্রেরণা যোগায়।

সূর্যসেন ছিলেন একজন বিচক্ষণ সংগঠক। তিনি মনে করতেন মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ব্যতীত কোনো মুক্তি আন্দোলন সফল হতে পারে না, কেননা সমাজের অর্ধেক অংশই মহিলা। সূর্যসেনের অগ্নিমন্ত্রে স্বাধীনতার যুপকাষ্ঠে আত্মাহুতি দেওয়ার জন্য এই সময় বহু মহিলাও এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত, সুহাসিনী গাঙ্গুলী, সাবিত্রী দেবী, ক্ষীরোদা বালা বিশ্বাস, কুন্দপ্রভা সেনসহ আরো অনেকের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রথমোক্ত দু'জন মহিলার দুঃসাহস ও আত্মত্যাগ ভারত উপমহাদেশের নারী আন্দোলনে আজো প্রেরণার উৎস। কল্পনা দত্ত আনোয়ারা থানার গহিরা গ্রামে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করলেন যে, নারীরাও পুরুষের মতো সশস্ত্র সংগ্রামে অংশগ্রহণে সমানভাবে দক্ষ। আর প্রীতিলতা পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের সময় আত্মাহুতি দিয়ে উর্ধে তুলে ধরে রাখলেন বিপ্লবের রক্ত-পতাকা। এসব ঘটনাবলী নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, কি অবিচল নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগী হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন মাস্টারদা তাঁর সঙ্গীদেরকে। এসব বৈপ্লবিক কর্মকান্ডের নেতা যে সূর্যসেন এই বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের আর কোনো সন্দেহ রইলো না। গ্রামে গ্রামে বসানো হলো গুর্খা পুলিশের ছাউনি, যুবকদের ওপর চললো প্রচন্ড নির্যাতন। সরকারি বিজ্ঞপ্তি ঘোষিত হলো, সূর্যসেনকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় ধরে দিতে পারলেই দশ হাজার টাকা পুরষ্কার। গ্রামে-গ্রামে, হাটে-বাজারে ঢোল পিটিয়ে এই পুরষ্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। সূর্যসেনের ছবিসহ সরকারি বিজ্ঞপ্তি গ্রাম-

বাজার, রাস্তা-ঘাট, অফিস-আদালত, রেলস্টেশন ছেয়ে গেলো। পরিচয়পত্র ছাড়া পথেঘাটে চলাফেরা একরকম দুষ্কর হয়ে উঠলো। গ্রামে-গ্রামে, পাড়ায়-পাড়ায় চললো খানাতল্লাশি। এসব নির্যাতন-অত্যাচার উপেক্ষা করেও আঘাতের পর আঘাত হেনে ব্রিটিশ শক্তিকে সন্ত্রস্ত করে রাখলেন তরুণ বিপ্লবীরা এবং সূর্যসেন ছিলেন এসব কর্মকান্ডের মূল নায়ক।

১৯৩৩ সাল, ১৭ ফেব্রুয়ারী। সূর্যসেন কতিপয় সঙ্গী নিয়ে পটিয়া থানার গৈরলা গ্রামে ক্ষীরোদা বালা বিশ্বাসের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। মণিদত্ত, শান্তি চক্রবর্তী, ব্রজেন সেন, সুনীল দাশগুপ্ত ও কল্পনা দত্ত প্রমুখ বিপ্লবী এই সময়ে ছিলেন মাস্টারদার সঙ্গী। গুপ্তচর নেত্র রঞ্জন সেনের মুখে সংবাদ পেয়ে ক্যাপ্টেন ওয়েসলী ৩৬ জন গুর্খা সৈন্য, ৩ জন এ, এস, আই ও ৩ জন কনস্টেবল নিয়ে বাড়িটি ঘেরাও করে। উভয়পক্ষে প্রচন্ড গুলিবিনিময় হয়। পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করে মণিদত্ত, সুনীল দাশগুপ্ত, শান্তি চক্রবর্তী ও কল্পনা দত্ত পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। কিন্তু পালিয়ে যাওয়ার সময় মন বাহাদুর ক্ষেত্রী নামক জনৈক গুর্খা সিপাই মাস্টারদা ও ব্রজেন সেনকে গ্রেপ্তার করে। মন বাহাদুর ক্ষেত্রী শনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়ে জনৈক গোয়েন্দা অফিসারের কাছে তাঁদেরকে উপস্থিত করে। রাতের অন্ধকারে টর্চ জ্বলে উঠতেই গোয়েন্দা অফিসারটি লাফ দিয়ে বলে উঠলেন, "সূর্যসেন-সূর্যসেন"।

সূর্যসেনের বিচারের জন্য বসলো ট্রাইবুন্যাল।

বিচারে সূর্যসেনের ফাঁসির হুমুক হয়। ফাঁসির কাষ্ঠ থেকে সাক্ষীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন, 'আমার স্বপ্ন, স্বাধীনতার স্বপ্ন। আমার সাধনা তোমরা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিও। বিপ্লবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। আমার জীবন স্বাধীনতার পূজারীদের প্রেরণার অনন্ত উৎস হোক। বন্ধুগণ, এগিয়ে চলো। জয় আমাদের সুনিশ্চিত। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক, বন্ধুগণ বিদায়। চির বিদায়।" ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারী, ১২ টা ৪০ মিনিটে বিপ্লবের এই অগ্নিবীণার ঝংকার চিরদিনের মতো থেমে গেলো, রয়ে গেলো তাঁর স্বপ্ন ও সাধনা। সৃষ্টি হলো এক নতুন ইতিহাস। মাস্টারদার সেই ঐতিহ্যের উত্তর সাধকরা ১৯৭১ সালে বোমা-পিস্তল-রিভলবার হাতে ঘুমন্ত দেশটাকে জাগিয়ে তুলেছিল।

সূর্যসেনের জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁর অবদানকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য কিছু জরুরী পদক্ষেপ মনে হয় নেওয়া দরকার। যেমন-একঃ যুব বিদ্রোহের মহানায়ক সূর্যসেনের নামে একটি পার্কের নামকরণ করা এবং মাস্টারদার পৈতৃক বাস্তুভিটা রাহুর কবল থেকে উদ্ধার করা। দুইঃ মাস্টারদার সঙ্গীদের সংবর্ধনা দেওয়া। তিনঃ লালদীঘির পাড়ে সব বিদ্রোহের স্মারকস্তম্ভ নির্মাণ করা (যেহেতু জালালাবাদ পাহাড় এখন সেনা ছাউনির মধ্যে অবস্থিত যেখানে সাধারণ মানুষের প্রবেশ নিষেধ) চারঃ চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে সূর্যসেনের একটি আবক্ষ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা, কেননা সূর্যসেন এই কলেজের ছাত্র ছিলেন। উল্লেখ্য যে, পশ্চিমবঙ্গের বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ প্রাঙ্গণে সূর্যসেনের একটি মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে বহু বছর আগে, মাস্টারদা উক্ত কলেজ থেকে বি, এ পাস করেছেন। পাঁচঃ চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলে অনন্ত সিংহ পাঠাগার' স্থাপন করা। অনন্ত সিংহ ১৯২২ সালে উক্ত স্কুল ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন এবং পরবর্তীকালে মাস্টারদার সহযোদ্ধা হিসেবে পরিচিত। ছয়ঃ প্রতি বছর চট্টগ্রাম শহরে ও নোয়াপাড়ায় মাস্টারদা সূর্যসেন মেলার আয়োজন করা। সাতঃ ধলঘাট, গৈরলা, গহিরা, পাহাড়তলী ও কালার পোলে যেসব বীর সেনানীরা আত্মাহুতি দিয়েছেন এবং লড়াই করেছেন তাঁদের পরিচিতিসহ সেসব স্থানে স্মারকস্তম্ভ নির্মাণ করা। উল্লেখ্য যে, কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে সূর্যসেনের একটি আবক্ষমূর্তি রয়েছে এবং সূর্যসেন স্ট্রীট নামে একটি সড়কও আছে। উক্ত সড়কের ২৮ নং বাড়িতে সূর্যসেন কিছুদিন বাস করেছেন। দুঃখজনক হলেও সত্যি, স্বদেশে ও নিজ জন্মভূমিতে মাস্টারদা ও তাঁর সঙ্গীরা পরবাসী। শহীদ প্রীতিলতা, বীরাঙ্গনা (কল্পনা যোশী) ও বীনা দাস-এর নামে কোনো প্রতিষ্ঠানের তো দূরের কথা এমনকি কোনো ছাত্রীনিবাসেরও নামকরণ করা হয়নি আজো। এটা এক ধরনের হীনমন্যতা ছাড়া আর কিছু নয়। কলকাতার 'বিপ্লব-তীর্থ চট্টগ্রাম' আজ অবধি চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের স্মৃতি ধরে রেখেছে। মাস্টারদা ও তাঁর সঙ্গীরা ছিলেন সংকীর্ণতার উর্ধে। দেশ স্বাধীন করা ছিল তাঁদের অভিপ্রায়। নিঃসংকোচে এ কথা বলা যায়, উপরোক্ত পদক্ষেপগুলোর ভেতর লুকিয়ে রয়েছে আমাদের অনাগত দিনের সুন্দর রাজনৈতিক জীবন।

মুনতাসীর মামুন — দৈনিক 'জনকণ্ঠ'

উপমহাদেশে, বিশেষভাবে বাংলা এ শতকের শুরু থেকে তৃতীয় দশক পর্যন্ত সন্ত্রাস ব্যবহৃত হয়েছিল ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তির লক্ষ্যে এই সন্ত্রাসের প্রকৃতি নিয়ে মতভেদ আছে ঐতিহাসিকদের মধ্যে। অনেকে একে মহিমান্বিত করেছেন, অনেকে আবার একে সামগ্রিক ইতিহাসে ফুটনোটের বেশি মর্যাদা দিতে চাননি।

বৃটিশ সরকারের মতে, এ সন্ত্রাস পরিচালিত হয়েছিল একটি লক্ষ্যে এবং তা ছিল শক্তির মাধ্যমে বৃটিশ শাসনকে উৎখাত করা। ঔপনিবেশিক সরকার

স্বাভাবিকভাবেই সবসময় এ সব প্রচেষ্টাকে হত্যা, ডাকাতি বা নিছক সন্ত্রাস বলে উল্লেখ করেছে।

পরবর্তীকালে, সন্ত্রাসবাদীরা আবার বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের আন্দোলনের প্রকৃতি আলোচনা করতে গিয়ে। হেমচন্দ্র কানুনগো তাঁর আত্মজীবনীতে সন্ত্রাস প্রচেষ্টাকে হাস্যকর বলে চিহ্নিত করে সমালোচনা করেছেন এর নেতৃত্বের। বারীন্দ্রও তাঁর জীবনীতে এমনভাবে সে যুগের কাহিনী বর্ণনা করেছেন যেন পুরো ব্যাপারটা ছিল ছেলেমানুষী। কিন্তু অধিকাংশ বিপ্লবী বা যাঁরা পরে সন্ত্রাসের পথ ত্যাগ করে মার্কর্সবাদে দীক্ষা নিয়েছিলেন তাঁরা, এমনকি ঐতিহাসিকরাও বাংলার সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে এর সীমাবদ্ধতার কথাও উল্লেখ করেছেন।

প্রখ্যাত বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ ও ত্রৈলোক্যনাথ সন্ত্রাসের উপযোগিতার যে কথা বলেছেন, তার সঙ্গে মিল আছে খানিকটা ফাননের তত্ত্বের। অর্থাৎ সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ঔপনিবেশিকরাই এবং তার উত্তরও দিতে হয় সন্ত্রাসের মাধ্যমে । লিখেছেন উপেন্দ্রনাথ, যে সন্ত্রাসবাদীদের অনেকেই 'এনারকিষ্ট' বলেন কিন্তু তা ঠিক নয়। বাঙ্গালীদের আত্মসম্মান বোধ ক্ষুণ্ন হচ্ছিল দেখেই তা প্রতিরোধের চেষ্টা করা হয়েছিল।

একই মত প্রকাশ করেছেন, এক সময়ের স্বদেশী দলের সভ্য ও পরে মার্কসবাদী গোপাল হালদার, আন্দোলনের কথা বলতে হলে বলা উচিত- জাতীয় বিপ্লববাদ" 'মিলিটান্ট ন্যাশনালিজম" বিপ্লবী গুপ্ত আন্দোলন- এরূপ কিছু বলাই সমীচীন- টেররিজম নয়' ।

ত্রৈলোক্যনাথ লিখেছিলেন,'ভারতবর্ষে প্রথম কে সন্ত্রাসবাদ প্রবর্তন করিয়াছে? বৃটিশ গভর্নমেন্ট শঠতা-কপটতা- বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা, অন্যায়ভাবে বল প্রয়োগ দ্বারা ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া সন্ত্রাসবাদ দ্বারা ভারতবর্ষ শাসন ও শোষণ করিতেছে নাকি?....... একটা শান্তিপ্রিয় জাতিকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখা সন্ত্রাসবাদ নয়কি? হত্যা করা সন্ত্রাসবাদ নয়কি?

আসলে রাজনীতির নেতৃত্ব যাদের হাতে ছিল, সেই রাজস্বভোগী বা মধ্যশ্রেণীর শহুরে এলিট তারা শান্তিপুর্ণভাবে আবেদন নিবেদন করে চাচ্ছিলেন কিছু সুবিধা আদায় করতে। কিন্তু স্বদেশের লাঞ্ছনা সৃষ্টি করেছিল জাতীয়তাবাদী চেতনার। অন্য দিকে 'বাঙলার বুদ্ধিজীবীদের একটি প্রধান অংশ যখন আবেদন নিবেদনের অবমাননাকর পদলেহী নীতি গ্রহণ করেছেল তখনই বিক্ষুদ্ধ 'বাঙ্গালী করণ' এর জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রকাশের তাৎক্ষণিক মাধ্যম ছিল সন্ত্রাস। একই কথা লিখেছেন ত্রৈলোক্যনাথ-গভর্ণমেন্টের টেররিজমের ফলে যখন দেশবাসীর মধ্যে ডিমরেলিজেসন আসিয়াছিল তখন আমরা বিপ্লবীরা কাউন্টার টেররিজম চালাইয়াছি। আমরা টেররিজম চালাইয়াছি দেশবাসীকে এই আশ্বাস দেয়ার জন্য অত্যাচারির শাস্তি বিধানের লোক এদেশেই আছে। আমরা টেররিজম চালাইয়াছি গভর্ণমেন্টকে জানানোর জন্য-অত্যাচারের প্রতিশোধ লওয়া হইবে। এক তরফা কিছুই চলিবে না। আমরা সফল মনোরথ হইয়াছি,আস্তে আস্তে ভারতবাসীর আত্মবিশ্বাস জাগিয়াছে।'

ব্যাপক হারে বৃটিশ দমন নীতির শিকার হয়ে জেলে যাবার আগে সন্ত্রাসবাদীরা রাজনৈতিক মুক্তির কথা চিন্তা করেছিলেন শুধু অর্থনৈতিক মুক্তির নয় । জেলে যাবার পর তাঁদের অনেকেই মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচিত হন, নতুনভাবে পড়াশোনা শুরু করেন, যা তাদের পক্ষে আগে সম্ভব ছিল না। ফলে অনেকেই দীক্ষিত হন মার্কসবাদে, অথবা পরবর্তীকালে নিজেদের যুক্ত করেন গণসংগঠনের সঙ্গে। কারণ, তাঁদের পরিচালিত সন্ত্রাসবাদের অসারতা তাঁদের কাছে ততদিনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ,আরেক অংশ 'তখন জীবনের আরাম-আয়েসের মধ্যে নিজেদের এলিয়ে দেন এবং নিজের জীবনে দেশের মুক্তির জন্য আত্মদানের যে আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন,সেই আদর্শ ক্রমে হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে থাকে এবং ক্রমে তারা অরাজনৈতিক সাধারণ মানুষে পরিণত হন।

বাংলার সন্ত্রাসবাদের কোন তাত্ত্বিক ভিত্তি ছিলনা ঠিকই তবে, ত্রৈলোক্যনাথ, উপন্দ্রেনাথ প্রমুখ বিপ্লবী নেতাদের লেখা পড়ে বোঝা যায় কেন তাঁরা উজ্জীবিত হয়েছিলেন সন্ত্রাসে। শোষণটা তাদের কাছে তেমন স্পষ্ট ছিল না যতটা স্পষ্ট ছিল দেশীয়দের প্রতি শাসকদের অপমান, বর্ণগত বিদ্বেষ। এ থেকে মুক্তি বা স্বাধীনতা লাভের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে তাঁরা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন সন্ত্রাসে।

মুক্তির মাধ্যম হিসাবে হয়তো তা ঠিক, কিন্তু তাৎক্ষণিকতার পরের পর্যায়গুলোর কথা তাঁরা তেমন ভাবেননি। অর্থাৎ গেরিলা যুদ্ধ, জনগণের মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রচার ইত্যাদি। এর একটি কারণ,জীবন জগৎ সম্পর্কে তাঁদের সীমিত ধারণা। বই পত্র পড়া বা বাইরের জগৎ সম্পর্কে তাঁদের ধারণা ছিল স্বল্প। ঔপনিবেশিক সমাজ গঠন বাংলায় এক সাম্প্রদায়িক সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। সন্ত্রাসবাদীদের গুপ্ত সংস্থা তার রিচ্যুয়াল সেটিকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছিল। এ সমস্যার সমাধান সম্ভব ছিল, যদি অর্থনৈতিক মুক্তিও গুরুত্ব পেত। কিন্তু মধ্যবিত্ত পটভূমি, সম্প্রদায়গত সমস্যা ইত্যাদির কারণে তা গুরুত্ব পায়নি। অনেক পরে, বিপ্লবীদের অনেকে যখন মার্কসবাদের দীক্ষা নিয়েছিলেন তখন তাঁরা এ সমস্যার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন এবং নিজেদের সে আলোকে সংশোধন করেছিলেন।

সন্ত্রাসের চেয়ে বড় যে মাধ্যম অস্ত্র সে সর্ম্পকেও বাংলার সন্ত্রাসবাদীরা খুব সজাগ ছিলেন এমন কথাটি বলা যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের অস্ত্র ছিল পুরনো রিভলবার। এটা ঠিক যে, পরবর্তীকালে বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানির ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে তা সফল হয়নি।

সবচেয়ে বড় কথা সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকের কথা তাঁরা কখনও বলেননি। কারণ,অর্থনৈতিক শোষণের কথা তাঁরা তেমনভাবে ভাবেননি। বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ী তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন, যখন সন্ত্রাসবাদ চলছে লাহিড়ী তখনও ছাত্র,রাজনীতির সংস্পর্শে আসেননি। তখন তাঁর এক সোশালিস্ট মনোভাবাপন্ন দাদা বলেছিলেন, সন্ত্রাসবাদ'শুধু ব্যক্তির বীরত্বের ওপরই নির্ভরশীল, গণআন্দোলনের ওপর তাদের ভরসা নেই। সে জন্যই ঐ আন্দোলন সফল হবে না।"

এই ব্যক্তিগত বীরত্ব দেখাতে গিয়ে, অর্থ সংগ্রহের জন্য সন্ত্রাসবাদীদের ডাকাতি করতে হয়েছিল। ডাকাতি করেও যে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করা গিয়েছিল তা নয়। বরং এতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। অন্যদিকে সিনফিন আন্দোলনের সময় বিপ্লবীরা জনগণের ওপর ভরসা করেছিলেন, আইরিশরা তাঁদের সমর্থন দিয়েছিল। সিনফিনরা সেনাবাহিনীও গড়ে তুলেছিলেন। রুশ নিহিলিস্টরা সেনাবাহিনী তৈরি করতে পারেনি, কিন্তু জনসমর্থন তারা পেয়েছিলেন খানিকটা।

জনসমর্থনের কথা ভেবেই ফানন কৃষকদের গুরুত্ব দিয়েছিলেন কারণ, তৃতীয় বিশ্বে তারা একটি বড় ফ্যাক্টর।

শ্রেণী ও দ্বন্দ্বের কথা না বলেও সংখ্যাগরিষ্ট অংশকে গুরুত্ব দিয়ে ফানন সমস্যাটির সমাধান করেছিলেন। ১৯৭১ সালে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ও শ্রেণীদ্বন্দ্বের কথা আসেনি,এসেছিল একদিকে ঔপনিবেশিক শাসন অন্যদিকে বাঙালির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক মুক্তির প্রশ্ন এবং মধ্যবিত্ত নেতারাও ব্যাপারটিকে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন সবার মধ্যে। যদি ঐ সময় এ ধরনের ব্যাপার হতো তা হলে সন্ত্রাসবাদ অন্য রূপ নিতো। এখানে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠনের একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যায়। অস্ত্রাগার লুন্ঠনের পর পুলিশ যখন কয়েকজন বিপ্লবীকে তাড়া করছিল তখন বিপ্লবীদের সাহায্য করেছিল কৃষকরা। বিপ্লবীরা ছিলেন হিন্দু। কৃষকরা মুসলমান। বিপ্লবীদের দেশপ্রেম বা সম্প্রদায় তাদের মনে প্রশ্ন সৃষ্টি করেনি। বিপ্লবীদের তাঁরা বিপ্লবী হিসাবেই দেখেছিল।

এ সমস্ত বিচার করে বলা যায়,সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বাংলার সন্ত্রাসবাদ পরিণত হয়েছিল একটি বিশেষ শ্রেণীর, বিশেষ সম্প্রদায়ের কিছু তরুণের সন্ত্রাসে। যার ফলে, ঔপনিবেশিক শক্তির একে দমন করতে বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু সন্ত্রাস বা বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ একেবারে মূল্যহীন ছিলনা। হেমচন্দ্র কানুনগো সন্ত্রাসীদের নানা সমালোচনা করা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছিলেন- এই বিপ্লব অনুষ্ঠানের একটি ক্ষুদ্র অংশ বা দিক আছে যা বাংলার মতো দেশের পক্ষে একটু গৌরবজনক'। মার্কসবাদীরাও তা স্বীকার করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে,সন্ত্রাসবাদ ছেড়ে যারা মার্কসবাদ দীক্ষা নিয়েছিলেন তাঁরা শ্রেণী সংগ্রামের পথ দিয়ে বাঙলায় সেক্যুলার রাজনীতি তৈরি করেছিলেন।

বাংলার সন্ত্রাসবাদ ব্যর্থ হলেও তা আঘাত হেনেছিল বৃটিশ শাসনের মূলে। বৃটিশ শাসনে যে অমোঘ নয় এই বোধ জাগ্রত করেছিল দেশবাসীর মধ্যে। এবং কংগ্রেসের আপোসকামী শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের যারা সমর্থক তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল এবং তারা যে পূর্ণ স্বাধীনতার কথা পরবর্তীকালে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন তার পিছে যে,এ চাপ কাজ করেছিল এ কথা বোধ হয় অস্বীকার করা যাবে না।

মফিদুল হক — দৈনিক 'ভোরের কাগজ'

বয়সের তুলনায় তাঁকে দেখায় অনেক প্রবীণ, মাথার চুল হয়ে এসেছে বিরল, শক্ত চোয়াল কৃশ গড়নকে আরো কৃশদর্শন করে তুলেছে, উচ্চতায় গড়পড়তা বাঙালির ভিড়ে তিনি হারিয়ে যাবেন অনায়াসেই, যে স্কুল-মাস্টারির সুবাদে 'মাস্টারদা' নামকরণ সেটা তাঁর চেহারার সঙ্গে সম্পূর্ণ মানানসই বটে। আর যাই হোক তাঁকে কেউ বিপ্লবী যোদ্ধাদলের তিনিই যে প্রধান সেনাপতি সেটা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। এমন কি যখন চট্টগ্রামে বিপ্লবী দলের বিভিন্ন সাহসিক কর্মকান্ডের পরিচয় মিলছিল নানাভাবে তখনও সাধারণ মানুষ একে ধরে নিয়েছিলেন অনন্ত সিংয়ের দলের কারসাজি। অস্ত্রাগারে হামলা চালাবার জন্য সামরিক পোশাকে দল যখন প্রস্তুত, দীর্ঘদেহী বলিষ্ঠগড়ন গণেশ ঘোষকেই বুঝি মনে হচ্ছিল প্রধান সেনানায়ক। বিদ্রোহের দিন ধুম-এ রেললাইন উপড়ে ফেলার পর দলছুট লালমোহন সেন যখন ঘোড়ার গাড়ি করে সদরঘাটে মুসলমান হোটেলওয়ালার কাছে হাজির হলেন তখন ব্যস্তসমস্ত হোটেল মালিক জানালেন, "এক্ষুনি পালান বাবু, সিং-এর বাচ্চারা একটা কিছু করে ফেলেছে আজ রাতে। গুলি-গোলা শোনা যাচ্ছে নাকি ওদিকে।" বিপ্লবী দলের সদস্যরা তখনও পরিচিত অনন্ত সিংয়ের ছেলে হিসেবে। কালীপদ চক্রবর্তী

লিখেছেন মাস্টারদার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের কথা। নয়া পাড়ায় মাস্টারদার গ্রামের বাড়িতে পৌছে চেয়ারে বসা পাতলা গোছের ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন ইনিই মাস্টারদা। তিনি তখন পাঁচ বৎসর কারাবাস শেষে নিজ গ্রামে অন্তরীণ, অথচ ওর আগেই বন্দী অবস্থাতে একান্ত সহকর্মীদের সঙ্গে মিলে চূড়ান্ত করে ফেলেছেন অভ্যুত্থানের সিদ্ধান্ত।

অথচ নেতা যে তিনিই এ-নিয়ে তাঁর ঘনিষ্ঠজনের মধ্যে সন্দেহ বা দ্বিধার কোনো অবকাশ ছিল না। প্রথম সাক্ষাতের পর কল্পনা দত্ত লিখেছিলেন, কেউ ভাবতে পারবে না এই শান্তশিষ্ট মানুষটিই হচ্ছেন দুঃসাহাসী "চট্টগ্রাম-রাজাধিরাজ"। তাঁর চেহারায় অসাধারণ কোনো কিছুই নেই এটা ভাবার পরক্ষণেই কল্পনা দত্তের মনে হয়েছিল, তাঁরই ভাষায়, "মাস্টারদার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে আমি অভিভূত হয়েছিলাম, আমি অনুভব করেছিলাম এক ধরনের আনন্দ, গভীর শ্রদ্ধা, বিস্ময় এবং ছিল ভয়েরও ছোঁয়া -মনে হচ্ছিল তিনি আমাকে দিয়ে যাই করাতে চান না কেন এক মুহূর্তের নোটিশে আমি তা করে দিতে পারবো।"

এই অনুপ্রেরণাই মাস্টারদা যোগাতেন, কোনো অগ্নিউদ্গারক ভাষণ দিয়ে নয়, আপন ব্যক্তিত্বের যাদুকরী খেলায় নয়, কোনো অলীক স্বপ্নে সকলকে বিভোর করে নয়-গভীর দেশপ্রেম ও একাগ্র সাধনা তাঁর ভেতরে যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সৃষ্টি করেছিল সেই হৃদয় উত্তাপ মাস্টারদা সঞ্চার করতে পারতেন পরিচিতজনের মধ্যে। তাই দশজনের মধ্যে থেকেও তিনি হতে পেরেছিলেন দশজনের থেকে আলাদা, এতোই আলাদা যে নয়াপাড়ার এই সাধারণ স্কুল মাস্টার যুবক বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের সবচেয়ে মহত্তম অভ্যুত্থানের জনক ও কান্ডারী হয়ে উঠেছিলেন। তবে মানুষ হিসেবে মাস্টারদাকে যেমন সহজেই বুঝে উঠা যায়নি তেমনি চট্টগ্রামের স্বাধীনতা অভ্যুত্থানকেও তাত্ত্বিকরা সম্পূর্ণ বুঝে উঠতে পারেন নি।

সাজা নিয়ে অনন্ত সিংহ আর গণেশ ঘোষদের সঙ্গে লালমোহন জেলে গিয়েছিলেন।" কমিউনিষ্ট পার্টির দৈনিক 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় ১৯৪৬ সালের ৩০ অক্টোবরের সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল, "মৃত্যুকে লালমোহন কোনদিনই ভয় করেন নাই। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের প্রাণ দেওয়া আর প্রাণ নেওয়ার সংগ্রামে পনেরো বছরের কিশোর লালমোহন একদিন হাসিমুখে ছুটিয়া গিয়াছিলেন,। "উল্লেখ্য ১৬ বৎসর জেল ও দীপান্তরবাসের পর মুক্ত লালমোহন সেন নিজ গ্রাম সন্দ্বীপে সাম্প্রদায়িক বিবাদ থামাতে গিয়ে নিহত হন নির্মমভাবে।

১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল মাস্টারদা সূর্য সেন-এর নেতৃত্বে ৬৭ জনের বিপ্লবী দল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুট করার অভিযান ঘটান নাই, কিংবা তারা কোনো সন্ত্রাসবাদী অভিযানের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যও ঝাঁপ দেন নি। সূর্যসেন ও তাঁর সতীর্থরা অত্যন্ত সচেতন ও সুপরিকল্পিতভাবে স্বাধীনতার সপক্ষে একটি অভ্যুত্থান সংঘটিত করতে চেয়েছিলেন এবং নানা বাধা বিপত্তি অভাবিত বিপর্যয় সত্ত্বেও তাঁরা সেটা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সূর্যসেনের এই বিপ্লবী সাফল্য ইংরেজদের উপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গীজাত মুল্যায়ন কিংবা আদর্শগত বিতর্কের ধুম্রজাল দিয়ে যে ঢেকে রাখা সম্ভব নয় পরবর্তীকালে দেশবাসীর প্রতিক্রিয়া দ্বারা সেটা ভালোভাবেই প্রমাণিত হয়েছে। চট্টগ্রামের ছেলেদের বা আরো সুনির্দিষ্টভাবে বললে ছেলেমেয়েদের জন্য সেই তখন থেকে শুরু করে আজ সূর্য সেনের জন্মশতবার্ষিকী অবধি দেশবাসীর অন্তরে জেগে ছিল শুধুই ভালোবাসা, অপার ভালোবাসা। সেলিনা হোসেন তাঁর উপন্যাসের নাম রেখেছিলেন 'ভালোবাসা প্রীতিলতা' মাহমুদুল হক তাঁর এক উপন্যাসে একাত্তরের অসহযোগের ভাষারূপ বোঝাতে লেখেন, 'বাংলাদেশ তুমি শুয়ে আছো অর্ধেন্দু দস্তিদার হয়ে, থেকে থেকে কাতরাচ্ছো, বোমা বিস্ফোরণে নিদারুণ ক্ষতবিক্ষত তোমার মুখ, বাংলাদেশ তুমি মরে গেছ প্রীতিলতার মতো বিষপান করে।'

প্রায় এক নিঃশ্বাসেই আবার বলেন 'চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের' কথা। এইসব দ্বিধা সংশয়ের কারণেই আমরা সূর্যসেন-এর স্বপ্নময় উথানকে কোনো একক স্বীকৃত শিরোনামে চিহ্নিত করতে পারিনি। বস্তুত চট্টগ্রামে বিপ্লবীরা যেমন ছিলেন কংগ্রেসে আবার সংগ্রেসের বাইরেও, সূর্যসেন তো ছিলেন জেলা কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী, যেমন তাঁরা ছিলেন যুগান্তর দলের বাইরেও বটে, তেমনি তাঁরা তৎকালীন বা তৎপরবর্তী প্রধান রাজনৈতিক স্রোতোধারার বাইরের মানুষই ছিলেন এবং এমন এক স্বাপ্নিক অভ্যুত্থান তাঁরা সমাজভাবনার মাপকাঠিতে যার পরিমাপ গ্রহণ সম্ভব ছিল না। তাই সূর্য সেন ও তাঁর কর্মকান্ড সঠিক মুল্যায়ন এই রাজনীতি বা সমাজ ভাবনার বলয়ে লাভ করেনি।

কোনো সন্ত্রাসবাদী অভিযান পরিচালনা সূর্য সেনের অভিপ্রায় ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল না অস্ত্রাগার লুট করা। তাঁদের প্রয়াস যে ভারতকে স্বাধীন করে তুলবে, নিদেনপক্ষে ভারতের বুকে কোনো স্বাধীন ভূখন্ড প্রতিষ্ঠা করবে এমন দুরাশাও তাঁদের ছিল না। বস্তুতঃ তাঁরা ছিলেন স্বপ্নতাড়িত মানুষ এবং দেশবাসীর মনে সেই স্বপ্নের বীজই তারা রোপণ করতে চেয়েছিলেন দুঃসাহিক অভিযান দ্বারা। মাস্টারদার অত্যন্ত প্রিয় ছিল আইরিশ বিপ্লবী লারোর-এর এই উক্তিঃ 'যদি কেউ আপনাকে

বলে সশস্ত্র প্রতিরোধের কোনো কার্যক্রম, তা যদি কেবলমাত্র প্রস্তরখন্ড হাতে মানুষের দ্বারাও তা পরিচালিত হয়, এমনি একটি বা প্রতিটি কাজই হচ্ছে অসময়োপযোগী, অবিবেচনাপ্রসূত অথবা বিপজ্জনক তবে এই মন্তব্যের জন্য তাকে তৎক্ষণাৎ প্রতিহত করা উচিত। এটা মনে রাখতে হবে কোথাও না কোথাও, কোনো না কোনোভাবে, কাউকে না কাউকে একটি সূচনা তো ঘটাতেই হবে এবং প্রতিরোধের প্রথম কাজটি সবসময়েই হবে অসময়োপযোগী, অবিবেচনাপ্রসূত অবিজ্ঞ ও বিপজ্জনক।'

চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের ললাটে শুরু থেকেই একটি দুর্লক্ষণ খচিত হয়েছিল। ইংরেজদের কাছে এই অভ্যুত্থান ছিল সন্ত্রাসবাদীদের বে-আইনী কার্যকলাপের সর্বোচ্চ প্রকাশ। বিদ্রোহ বা অভ্যুত্থান নয়, এ ছিল নিছকই লুণ্ঠনের মামলা। ইংরেজদের এই প্রতিক্রিয়ার কারণ বোঝা কষ্টকর নয়। কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের ধারাতেও সূর্যসেনের অভ্যুত্থান সম্পর্কে বিভ্রান্তি কম ছড়ানো হয় নি। দুর্ভাগ্যজনক দিক হচ্ছে বামপন্থীরা কিংবা চট্টগ্রাম যুব অভ্যুত্থান তথা স্বাধীনতার উত্থান প্রয়াসে যুক্ত ব্যক্তিরা পরবর্তীকালে যখন সাম্যবাদী আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হলেন তখন তাঁরাও একে 'সন্ত্রাসবাদী' প্রয়াস অথবা অস্ত্রাগার হামলা হিসেবে অভিহিত করতে থাকেন। সদ্য কমিউনিষ্ট হয়ে ওঠা কল্পনা দত্ত ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত তাঁর স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থের নাম রেখেছিলেন, 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণকারীদের স্মৃতি কথা।' গ্রন্থে তিনি মাস্টারদার সম্পর্কিত অধ্যায়ে সরাসরি লেখেন, '১৯২৯ সালে আমি সন্ত্রাসবাদী দলের সংস্পর্শে আসি।" চট্টগ্রামের অপর বিপ্লবী লালমোহন সেন সম্পর্কে স্মৃতিচারণকালে ১৯৪৭ সালে কমরেড মুজাফ্ফর আহমদ, সাম্যবাদী আন্দোলনের কিংবদন্তী পুরুষ, অননুকরণীয় ভাষায় লিখেছিলেন, চট্টগ্রাম হাতিয়ারখানা লুটের মামলায় জনম-কয়েদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সৃষ্ট ফাঁকটি কল্পনা দত্তও বুঝতে পেরেছিলেন পরে। তাঁর গ্রন্থের দ্বিতীয় মুদ্রণ যখন প্রকাশিত হয় ১৯৭৯ সালে, নতুন এক ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন, 'প্রথম সংস্করণ বের হওয়ার পর আমার বন্ধুরা এটা আমার কাছে তুলে ধরেছিলেন যে বইয়ের নাম হিসেবে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণকারীদের স্মৃতিকথা" সঠিক হয়নি। যে তরুণেরা অংশ নিয়েছিল 'যুব বিদ্রোহ' বা 'চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানে' তাঁরা হামলাকারী ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন বিপ্লবী। হামলা ছিল গোটা পরিকল্পনার একটি অংশমাত্র। আমি তাঁদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। বইয়ের নাম "চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের স্মৃতিচারণ" রাখতে আমি চাইবো, তবে যেহেতু সামান্য কিছু পরিবর্তন ছাড়া এটা পুরনো সংস্করণের হুবহু পুনর্মুদ্রণ তাই এই পর্যায়ে নাম পরিবর্তন আর সম্ভব হলো না।"

যে সংশয়ের অকপট স্বীকৃতি রেখেছেন কল্পনা দত্ত সেই দ্বিধা মূল ধারার ঐতিহাসিকদের মধ্যেও ছিল। অমলেশ ত্রিপাঠি তাঁর পরিশ্রমী কাজ 'স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস' গ্রন্থে ১৯৩০-এ বাংলায় সংঘটিত ৫৬টি সন্ত্রাসবাদী ঘটনার তালিকায় সর্বাগ্রে স্থান দেন 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' এবং এমনি এক অভ্যুত্থানই মাস্টারদা চেয়েছিলেন, করো অথবা মারো এই শ্লোগানের বদলে তিনি বলেছিলেন করো এবং মরো সর্বোচ্চ ত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ দ্বিধাহীন বিপ্লবীদের দ্বারা সংঘটিত হবে যে স্বাপ্নিক জাগরণ! নিজেদের নামকরণ করেছিলেন তাঁরা ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মী চট্টগ্রাম শাখা। সশস্ত্র অভ্যুত্থান দ্বারা চট্টগ্রামকে মুক্ত করে স্বাধীনতা ঘোষণা করাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। এই স্বাধীনতা যে সাতদিনের বেশি অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হবে না সেটাও তারা নিশ্চিত বুঝেছিলেন এবং স্বাধীনতার এমনি ক্ষণস্থায়ী উত্থান অবসানের সঙ্গে সঙ্গে যে তাঁদের জীবনাবসানও ঘটবে সেটা বুঝতেও কারো অসুবিধা ছিল না। অস্ত্রাগার লুণ্ঠন নয়, স্বাধীনতার লক্ষ্যেই গৃহীত হয়েছিল পরিকল্পনা। ক্ষণস্থায়ী হবে স্বাধীনতা কিন্তু চিরস্থায়ী হবে এর প্রভাব।

অগ্নিযুগের বিপ্লবী দলের সদস্য পূর্ণেন্দু দস্তিদার বিস্তারিতভাবে মূল পরিকল্পনার কথা লিখেছিলেন।

"বিপ্লবীদলের কার্যসুচি স্থির হয়ঃ

১. টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ অফিস আক্রমণ করতে হবে সবার আগে। কারণ সংবাদ সরবরাহ ব্যবস্থা সর্বপ্রথম ধ্বংস না করলে চলবে না। তার পরবর্তী কাজগুলির কোন খবর কোথাও যখন শত্রুরা দিতে পারবে না, তখন সহজেই তাদের কাবু করা যাবে।

২ তারপর পাহাড়তলী অস্ত্রাগার দখল। এখানে সরকারি ও রেলওয়ের রিভলভার, পিস্তল, রাইফেল, মেশিনগান, লুইসগান ও সমস্ত অস্ত্রের উপযোগী বহু গুলি জমা ছিল।

৩. ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ। এখানে তখন শুধু ইউরোপীয় নরনারীরাই যেতে পারত এই ক্লাব আক্রমণ দ্বারা অনেক ইংরেজকে এক সঙ্গে হত্যা করা সম্ভব হবে বলে এটা আক্রমণের সিদ্ধান্ত করা হয়।

৪. উপরোক্ত কাজগুলি সফলভাবে করার পর সংগৃহীত অস্ত্র ও পূর্বে সংগৃহীত অস্ত্রের সাহায্যে জেলার রিজার্ভ পুলিশ ঘাঁটি আক্রমণ-প্রয়োজন হলে সম্মুখ সমর, এবং ওদের পরাজিত করে সেখানকার ছোট অস্ত্রাগার থেকে রাইফেল, রিভলভার ইত্যাদি সংগ্রহ।

৫. এই কাজ সফলভাবে করতে পারলে পরে চট্টগ্রাম শহরকে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করা এবং প্রধান নেতা সূর্য সেনকে এই প্রজাতন্ত্রের সভাপতি পদে বরণ করা।

৬. চট্টগ্রাম থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে রেললাইন তুলে দেওয়া-যাতে সামরিক বাহিনী সহজে এসে না পৌঁছতে পারে।

৭. এই কাজগুলি সফল হলে, এই সাফল্যকে স্মরণীয় ও জনপ্রিয় করার জন্য চট্টগ্রাম জেলের সব কয়েদীকে মুক্তি দেওয়া, শহরের বন্দুকের দোকানগুলি লুট করা, সরকারি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক লুট করা এবং ঐ অর্থ বিপ্লবের কাজে ব্যবহার করা।

৮. চট্টগ্রাম শহর দখল করে, কাছারী পাহাড়ে বিপ্লবীদের (ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি-চট্টগ্রাম শাখা) পতাকা উত্তোলন করা ও জেলায় প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা, এবং ইংরেজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য বড় সরকারি কর্মচারীদের গ্রেপ্তার করে সভাপতি সূর্য সেনের কাছে কোর্ট পাহাড়ে প্রকাশ্য বিচার করা।"

উপরোক্ত লক্ষ্যমাত্রার শেষের দুটি ব্যতীত প্রতিটি লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য ১৮ এপ্রিলের অভ্যুত্থানে প্রয়াস নেওয়া হয়েছে এবং আংশিক বা পুরোপুরিভাবে এর কতকগুলো বাস্তবায়িতও হয়েছিল। কিন্তু সামরিক অভিযানের সকল দিকের পরিপূর্ণ সমন্বয়ের অভাব ও আরো কতক বাস্তব কারণে চট্টগ্রামকে স্বাধীন ভূখন্ড হিসেবে পরিচালনার সুযোগ তাঁরা পাননি বটে তবে এই চট্টগ্রাম তখন ইংরেজের দখলেও ছিল না। ক্ষুদ্রভাবে হলেও স্বাধীনতার স্বপ্নকে অঙ্কুরিত হতে দেখেছে মাস্টারদার দল। কালীপদ চক্রবর্তী লিখেছেন ঃ

"পুলিশ অস্ত্রাগারে আমাদের উৎসবের আমেজ তখনো কাটে নি। এই সময় উৎসব মুখরিত লাগামহীন অপ্রয়োজনীয় গুলি চালাবার প্রবণতার রাশ টেনে ধরলেন মাস্টারদা। তার নির্দেশে অস্ত্রগারের ভেতর থেকে ব্রিটিশ পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক খুঁজে এনে পুড়িয়ে ফেলা হল। তারপর ঐ ক্ষুদে মাঠে অবস্থিত পতাকা-দন্ডে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হল। মাথার উপরে উড়তে লাগলো জাতীয় পতাকা-সে পতাকা সংগ্রাম ও মুক্তির পতাকা। মাস্টারদা সেই পতাকার নিচে এসে দাঁড়ালেন। গণেশদা সকলকে সারিবদ্ধ করলেন। গার্ড অব অনার দেওয়া হল। আমরা সবাই মাথা নত করে হাত তুলে ঐ পতাকাকে জানালাম সামরিক অভিবাদন। তারপর কিছুক্ষণ চললো সামরিক ড্রিল।...

মাস্টারদা'র নির্দেশে অস্ত্রাগারে সম্মুখবর্তী ক্ষুদ্র ময়দানে আমরা সবাই আবার সমবেত হলাম। উনি আমাদের লক্ষ্য করে দেশের জনসাধারণের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করলেন যে, ভারত উপমহাদেশের একটি অংশ হলেও এই চট্টগ্রামে ভারতের প্রজাতন্ত্রী বাহিনী (ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি) চট্টগ্রাম শাখা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য খতম করে তাঁরই নেতৃত্বে এক স্বাধীন বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। তিনি এই স্বাধীন সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবার জন্য দেশবাসীর কাছে আবেদন জানান। অধিনায়ক মাস্টারদা'র এ ঘোষণার পর বিউগল বাজানো হল এবং তিন তিনবার গুলি বর্ষণ করা হল"

মাস্টারদা সফল বিপ্লবী, তিনি যা করতে চেয়েছিলেন তা পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করেছেন, পরাধীন জীবনের বিষপাত্র উপচে পান করেছেন আকন্ঠ এবং পরবর্তী সকল প্রজন্মের জন্য রেখে গেছেন অমৃতরস, মানবের ঈশ্বরদর্পী জাগরণের স্বপ্নকাহিনী।

পাঠক-শ্রীকরকমলেষু—

চরম অধঃপতনের পরিণতি—
বাঙলা বাঙালি ইংরেজের অধীন।
আইন-আদালতও শোষক শাসকের,
শিক্ষা-দীক্ষার চাবিকাঠিও।

বাঙলার চাষী কারিগর খোঁড়া
বিধ্বস্ত স্বদেশ—সমাজ।
নবাব ইংরেজের হাতের পুতুল,
বাঙালির চোখে অঘোর ঘুম।

লপ্‌সি, বেত, ফাঁসির আশীর্বাদে
ওঠে সিংহ-হুঙ্কার 'জাগো বাঙালি !'
ঘোর তন্দ্রায় আঁত্‌কে ওঠে জাতি
আন্দোলন—সংগ্রাম—বিপ্লব—যুদ্ধ।

কবি সুকান্তের ভাষায়
'ওরা বীর, ওরা আকাশে জাগাতো ঝড়
ওদের কাহিনী বিদেশীর খুনে
গুলি, বন্দুক, বোমার আগুনে
আজো রোমাঞ্চকর।'